অচিনপুরের কথকতা

সমরেশ বসু

সাহিত্য প্রকাশ
৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০০৯

ACHINPURER KATHAKATA

by

Samaresh Basu

প্রথম সাহিত্য প্রকাশ মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৬৫
প্রকাশক : প্রবীর মিত্র : ৫/১, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট : কলিকাতা-৯
প্রচ্ছদ : মানবেন্দ্র পাল (বাচ্চু)
মুদ্রাকর : ভোলানাথ পাল : তনুশ্রী প্রিন্টার্স
৪/১ই, বিডন রো : কলিকাতা-৬

রমাপদ চৌধুরী

বন্ধুবরেষু—

॥ এক ॥

জন্মক্ষণে কেমন শঙ্খ বেজেছিল, বিভাস জানে না। জীবনের বিশেষ বিশেষ লগ্নগুলিই পরম। তা সুন্দর কিংবা নির্মম, তার বিচার আলাদা। জীবনের সেই লগ্ন অদৃশ্য স্তব্ধ পথের বাঁকে। তারা আবিষ্কৃত হয়।

মানুষ হিসেবে তার জন্ম কোনো আবিষ্কার নয়। বিভাসের বিশ্বাস, কোনো মানুষেরই নয়। জন্ম-ই একমাত্র প্রকাশ্য। মানুষের স্বভাব থেকে নিয়ত উদ্ভূত।

আর জীবনের লগ্নগুলি আবিষ্কার। ভবিষ্যৎ যেখানে উদ্ভাসিত। নতুন দিগন্ত যেখানে গুঞ্জরিত। একটি মানুষের জীবনকালের নিয়ন্ত্রণ যেখানে নির্দেশিত। দুর্দশা কিংবা সু-দশা, দুঃখ কিংবা আনন্দ, যে দিকেই প্রবাহ চলুক। এই লগ্নকালের মধ্যে মানুষের কৃতকর্ম পরিচালকের ছদ্মবেশে বসে আছে। লোকে বুঝি তাকে ভাগ্য বলে।

আর এই লগ্নগুলি চিরদিন জন্মকে অস্বীকার করেছে। কঠিন শক্তিকে ধূলিসাৎ করেছে। ধূলি-স্তম্ভ দিয়ে শক্তির বনিয়াদ খাড়া করেছে। রাজ্যেশ্বরকে অনাথ আর অনাথকে রাজ্যেশ্বর করেছে।

বিভাসের জীবনে আজ সেই পরম লগ্ন উপস্থিত। সে দেখল, অত্যন্ত আকস্মিক ভাবে, মৃত্যু শকুনের মতো দুই পাখা বিস্তার করে, আধমরা শরীরকে ঘিরে ধরেছে।

এখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের রথ রক্তের ওপর দিয়ে ঘরে ফিরে চলেছে। ভারতবর্ষের বেকারেরা ফিরে এল ঘরে। সাম্রাজ্যশাহীরা ক্লান্ত। ভিতরের ক্ষয়িষ্ণুতা প্রকাশমান। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ উপনিবেশ হিন্দুস্থান থেকে ওরা পালাল দাতার ছদ্মবেশে। ঘোষিত হয়েছে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা। এমন কি, স্বাধীন ভারতের প্রথম সাধারণ নির্বাচনও শেষ হয়েছে। আভ্যন্তরীন রাজনৈতিক জটিলতা ক্রমবর্ধমান।

কিন্তু যুদ্ধান্তের বেকারদের ভিড় এখনো বেড়ে চলেছে। সময় নিরবধি। তাই নতুন নতুন বেকারের সৃষ্টি হয়ে চলেছে। স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দিতে হয়েছে বাংলার বিস্তৃত পূর্বাঞ্চলকে, পূর্বাঞ্চলের সমগ্র হিন্দু জনসমাজকে, পশ্চিম বাংলার ছোট খোলের মধ্যে ঢুকিয়ে। জায়গা ও জীবনধারণ, কোথাও কুলিয়ে উঠছে না। সরকারি পরিকল্পনাগুলিও এই স্ফীতির তুলনায় প্রায় নগন্য। তাই ব্যর্থতাই ধরা পড়ছে বেশি।

তবু সংশয় মানুষের! বিদ্রোহ করতে তারা সংশয়াম্বিত। মানুষ অপরাজেয়। অন্যায়ের কাছে নতি-স্বীকার সে কখনো করেনি। প্রাগৈতিহাসিক কালে, কুরুক্ষেত্রের ভ্রাতৃবিরোধের সময় থেকেই সে ন্যায়ের জয় ঘোষণা করে এসেছে। আর এখন সেই মানুষ তার নতুন স্বাধীনতাকে বুঝতে চাইছে। স্বাদ অনুভব করতে চাইছে। তাই সে সংশয়াম্বিত। মানুষ আঘাতকে নিচ্ছে তার পিঠ পেতে। কারণ বিদ্রোহ করাটা তার স্বভাব নয়। বিদ্রোহ সে করে। বাধ্য হয়ে করে। মরণ পণ করে। তার কর্তব্য জেনে করে।

তবু বিদ্রোহ ধুমায়িত হচ্ছে ভিতরে ভিতরে। কারণ পাপকে সে প্রত্যক্ষ করছে। আর তাই ধুমায়িত বিদ্রোহ চোরা পথে ঠেলে চলেছে তার সংশয় নিয়ে। আত্মনাশের পথে চলেছে। কোথাও বিবেকহীন মূঢ় ভয়ংকর সেই আত্মনাশের রূপ। কোথাও দুর্বল আর নির্জীবতার মধ্যে। আর পাপীরা তাতে ইন্ধন জুগিয়ে চলেছে।

এই হল সময়। এই অবস্থা। আর এই সময় এবং অবস্থার শিকার বিভাস। যখন বিষণ্ণতার কুয়াশায় যুবক-মন আচ্ছন্ন। মুক্তিকে যাঁরা খুঁজছে নানান ধরনের বাঁধানো দার্শনিকতার মধ্যে। আর একটা সরল স্বাভাবিক ব্যাপারকে তারা দার্শনিকের মুখোস পরে নতুন ভাবে যেন বলতে চাইছে, 'পায়ে পায়ে মৃত্যুর দিকে যাওয়ার নাম-ই জীবন।' আসলে এসবই সেই নিষ্ক্রিয় বিদ্রোহের চোরাপথের বাণী। 'জীবন অমূল্য রতন', এই চির নতুন কথাটা তারা পুরনো বলে, তাদের সকল অক্ষমতা হীনমন্যতাকে চাপা দিতে চাইছে।

ভয় এর সংশয়ের করাল ছায়া সর্বত্র। দমিত বাসনার বিচিত্র রীতি আর ছন্দ প্রকাশিত দিকে দিকে। নিরাশা ব্যপ্ত। আশা ক্ষীণ।

এই ভারতবর্ষকে, এই বাংলাকে মা বলা হয়েছে। এই যুগে বলা হোক, এ দেশ বেকারের মা। শহরের বেকার আর ভূমিহীন কৃষকের মা। স্বাধীনতার মুকুট যাঁর মাথায়। দেহ রক্ত আর স্তন দুধ শূন্য। এবার বলা হোক, অন্ধকার আর শূন্যতাবাদীদের মা।

কারণ এই, এই যে মৃত্যু হানা দিয়েছে বিভাসের বুকে। তাকে বেষ্টিত মৃত্যুর শকুনের মতো দুই পাখা, অস্থির হয়ে উঠেছে। কাঁপছে থর থর করে। স্পন্দন স্তব্ধ হয়ে আসছে। অথচ কয়েক দিন আগেই সে বাঁচার কথাই ভাবছিল। কারণ—।

কলকাতায় এসে প্রথম যে বন্ধুর সঙ্গে বিভাসের দেখা হয়েছিল, সে তাকে চিনতে পারেনি। কারণ দক্ষিণাঞ্চলের শেষ ডাউন লোকাল ট্রেনে সে ফিরেছিল। তখন তার জামা ছেঁড়া। ভ্রূর কাছে ফোলা। তাতে চোখ ঢেকে গিয়েছিল। নীল দাগ পড়েছিল। ঠোঁটের কষে রক্ত জমেছিল। তার দৃষ্টি ছিল উদভ্রান্ত। বন্ধুর বাড়ি ছিল শিয়ালদহের কাছে। তাই রাত্রি সাড়ে এগারোটার মধ্যেই

পৌঁছতে পেরেছিল বিভাস। দরজা খুলে তার বন্ধু অবাক হয়েছিল। প্রায় প্রতিদিনের দেখা শোনা। তবু জিজ্ঞেস করেছিল, কে!

—আমি

—আমি কে?

দরজার কাছে আলো আঁধারিতেই বোধহয় আরো অসুবিধা হয়েছিল। বিভাসের বিকৃত মুখটা দেখে সে চিনতে পারেনি। বিভাস বলেছিল, আমি বিভাস।

—ও! আরে, এস। এত রাত্রে যে?

বিভাস প্রথমে কোনো জবাব দিতে পারেনি। বন্ধুর বাপ-মা-ভাই-বোনের বাড়ি। তবু চিলেকোঠাটা তার একলার এক্তিয়ারে ছিল। সেটাই রক্ষে। বিভাসকে নিয়ে বন্ধু সোজাসুজি নিজের ঘরে গিয়েছিল। বিভাস লক্ষ্য করেছিল, বন্ধু তার দিকে কেমন একটা সন্দেহজনক বিরক্তিতে তাকিয়ে আছে। এবং আরো লক্ষ্য করেছিল, বন্ধু তার নিঃশ্বাসের গন্ধ নেবার চেষ্টা করছে। কেন? তা হলে সেও সন্দেহ করেছিল, বিভাস মদ-টদ খেয়ে এসেছে? আর মাতাল হয়ে মারধোর খেয়ে এসেছে?

কিন্তু বিভাস ছেলেমানুষের মতো কেঁদে উঠেছিল। কাঁদতে কাঁদতেই বন্ধুকে তার দুর্দশার কথা বলেছিল।

তখন তার বন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিয়েছিল। আশ্রয় দিয়েছিল।

কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই টের পেয়েছিল বন্ধু তাকে নিয়ে বিব্রতবোধ করছে। এবং বিরক্ত। যদিও আগে সে বলেছিল, চাকরিবাকরি না পাওয়া পর্যন্ত বিভাসকে সে থাকতে দেবে। কিন্তু তিনদিনের মধ্যেই টের পাওয়া গিয়েছিল, সেটা একটা অবান্তর কথা।

তখন বিভাস গিয়ে উঠেছিল এক ছাত্রাবাসে, যেখানে তার অনেক বন্ধুরা ছিল। বিভাসের দুঃখের কথা শুনে, তারা সকলেই একটি বন্ধুর প্রাণরক্ষার সংকল্পে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছিল। এবং বিভাসকে একটা চাকরি যোগাড় করে দেবে, অন্ততঃ চেষ্টা করবে, বলেছিল।

তখন বিভাস ভেবেছিল, সংসারে প্রীতি এবং ভালবাসা এখনো আছে। হতাশ হবার কিছু নেই।

কিন্তু পনরদিন যেতেই একদিন সে শুনতে পেয়েছিল, তারা পরস্পরকে দোষারোপ করছে বিভাসের খাওয়া থাকার ব্যাপার নিয়ে। তারা পরামর্শ করছে, কেমন করে ওকে তাড়ানো যায়।

বিভাস যেন বিশ্বাস করতে পারেনি। সত্যি না তার স্বপ্ন ভেঙেছিল যেন নিজেও টের পায়নি। তার জিভ শুকিয়ে গিয়েছিল। কাঁপছিল ভয়ে।

সে মনে করেছিল, ছুটে গিয়ে বন্ধুদের পায়ে পড়বে। কিন্তু তাও সে পারেনি। অথচ জীবনকে কী ভাবে গ্রহণ করতে হবে সে বুঝতে পারছিল

না।

পরদিনই একটা নিঃশব্দ সঙ্গ-বর্জন শুরু হয়েছিল। খাবার ঘরের ঠাকুরও যোগ দিয়েছিল তাতে।

তার পরদিন মফস্বলের একটা কারখানায় বিভাসের ইনটারভিউ ছিল কেরাণীর কাজে। আর সেখান থেকে সে ফেরেনি। কলকাতায় আর তার সংবাদ কেউ জানে না।

বিভাসের মনে হয়, এইবার সে মারা যাবে। যদিও চোখ চেয়ে আছে সে, কানে শুনতে পাচ্ছে পুরোপুরি। শুধু তাই নয়, সে শুয়ে নেই, বসেই আছে। আর বসে আছে একটি গাছতলায়। মফস্বল শহরের এক জনাকীর্ণ বড় রাস্তায়।

অন্যদিন হলে গাছতলায় বসবার উপায় ছিল না। কাঠের যে ছোট মাচাটি বাঁধা আছে গাছের গোড়ায় ওখানে প্রতিদিন ফলের দোকান বসে। ফলওয়ালার রোগ হোক কিংবা আর কিছু, কয়েক দিন সে আসছে না। সকালে বিভাস না বসে থাকলে মাচাটি আর কেউ দখল করত। কোন ভিখিরি বাউণ্ডুলে, নয় তো বারোমেসে রাস্তার পাগল কিংবা কুকুর।

বেলা তখন প্রায় দশটা। অগ্রহায়ণের আকাশ ভরে রোদের ঝিকিমিকি। গাছে গাছে পুরনো পাতায় ইতিমধ্যেই শুকু শুকু ভাব লেগেছে। খসতেও আরম্ভ করেছে কিছু কিছু। ডালে পাতায় ঢাকা কাকের বাসা এর মধ্যেই চোখে পড়তে আরম্ভ করেছে। রাস্তায় দেখা দিয়েছে ধুলো।

পথে অনেক লোকের আনাগোনা। সামনেই বাজার, তার পরে রেল স্টেশন। জংশন স্টেশন। লোকের যাওয়া আসার কামাই নেই। বিভাস বসে আছে গাছে হেলান দিয়ে। সে বুঝতে পারে, ইচ্ছে করলেই সে হাঁটতে পারবে না। দরকার হলেও নাড়তে পারবে না হাত। চোখের পাতা দুটি কেন খোলা রয়েছে, কেমন করে রয়েছে, সে জানে না। আর তার কেবলি মনে হয়, এইবার সে মরবে। কিভাবে মরবে? ধুপ্ করে পড়ে যাবে নাকি? কিছুই ঠিক আন্দাজ করতে পারে না বিভাস।

গাছের পাখি বিষ্ঠা ত্যাগ করেছে তার গায়ে। জামা ও মাথায় পড়েছে। সরে বসতে সে পারেনি। তাড়া দিতেও পারেনি পাখিগুলোকে। কেউ কেউ তার দিকে তাকিয়ে গেছে, কোনো কথা বলেনি। কেননা কেউ তাকে চেনে না। সে-এখানকার লোক নয়। এরকম অনেক লোক এই শহরের বুকে, সদরে ও খিড়কির রাস্তায় বসে থাকে। আসে চলে যায়, মরেও নিশ্চয়। সেটা বিভাস জানে। দেখেছেও অনেক। তার জন্যে কারুর কিছু আসে-যায় না।

সে মরছে। আস্তে আস্তে মরবে, এই একটি কথা তার অনুভূতির মধ্যে পাক খাচ্ছে বারে বারে। কখনো মনে হচ্ছে শরীরটা হালকা ফঙফঙে, কখনো ভার। ভীষণ ভার, বোঝার মতো। টাল খেয়ে পড়ে যেতে পারে যে কোনো

সময়। আর সবচেয়ে বড় কথা, সমস্ত বোধ দুর্বোধ্য জড় মনে হচ্ছে। মরার কথা ছাড়া বাকি অনুভূতি পর্যন্ত মরে গেছে।

এভাবে বসে থাকলে পড়ে যেতে পারে ভেবে শুয়ে পড়ল বিভাস। কি করে শুল নিজেই জানে না। কতক্ষণ শুয়ে ছিল, সে খেয়ালও নেই আবার ধড়মড়িয়ে উঠে বসল এক সময়। বসল কি করে, সে কথা ভাববার অবস্থা-ই নেই। কিন্তু চোখেমুখে একটি নিদারুণ ভয় উঠেছে ফুটে। একটা ভীষণ লজ্জায় শিউরে উঠছে সে।

মনে পড়ছে একটি পুরনো ছবি। একটি লোক মরে যাচ্ছিল রাস্তার ধারে। অনেকের সঙ্গে বিভাস দাঁড়িয়ে দেখছিল। লোকটা নাকি না খেতে পেয়ে মরছিল। আহা উহু করছিল সবাই। কিন্তু বিভাস দেখছিল, সকলেই ভীষণ আতঙ্কে ও ভয়ে ওরকম করছিল সমবেদনার ছল করে। আর লোকটা নিস্পন্দ, চোখদুটি মাছের মতো নিষ্পলক। কিন্তু বুকের কাছে, চামড়ার তলায় যেন একটা নেংটি ইঁদুর লাফালাফি করছিল। ঠিক বিভাসের নিজের যে রকম করছে।

বিভাস মরবে। কিন্তু নিদারুণ লজ্জায় সে শিউরে উঠছে। এত লোকের মাঝখানে সে মরবে কেমন করে। ঘটনা অবশ্য প্রায় একই রকম। সে-ও খায়নি প্রায় দিন পাঁচেক এবং পড়ে আছে রাস্তার ধারেই। কিন্তু দুটি ব্যাপারে যে কত তফাত, বিভাস বোঝাবে কেমন করে। এখুনি হয়তো লোক জড়ো হতে আরম্ভ করবে। আহা-উহু করবে, বলবে, 'কে?'…'চিনি নে।'… 'এখানকার নয়।' তারপর…

ভাবা মাত্র বিভাস উঠে দাঁড়াল। লোকের সামনে মরবার লজ্জায় একটা বিস্ময়কর শক্তি ফিরে পেল সে। অবলীলাক্রমে হেঁটে চলে এল স্টেশনে!

মনে হয়েছিল, সামান্য সময় সে কাঠের মাচায় শুয়ে ছিল। কিন্তু সে সামান্যটাই ম্যাজিকের মতো কখন বেলা দশটার বুকে এনেছে বিকেল ডেকে। হেমন্তের উদার নীল আকাশে লেগেছে রক্তাভা পথে লোকের ভিড় আরো বেড়েছে। ছুটি হয়েছে কলকারখানাগুলিতে। ঘরে-ফেরা মানুষেরা সন্ধ্যাবেলার কাকের মতো কা-কা করছে যেন।

আরও উত্তরে যাবে বিভাস। উত্তরের নির্জন কোনো গ্রামে, নিরালায় গিয়ে মরবে সে। অন্তত যতক্ষণ তার বুকে ওই ইঁদুরটা লাফাবে আর মাছের মতো অপলক চোখ দিয়ে সবই দেখতে পাবে। তারপরে যখন মরে যাবে, তখন সে কিছুই দেখতে পাবে না, জানতে পারবে না।

লোকালয়ে মরার লজ্জায় সে ঠিক বসল এসে আপ প্লাটফরমের বেঞ্চে। কিন্তু ভাবনাগুলি তার চোখে জল আনছে। এ-ই বা কেমন। লোকে মৃতের জন্যই কাঁদে। নিজের মরার কথা ভেবে কে কবে কেঁদেছে। আর এত লোক আশেপাশে ঘোরাফেরা করছে। চোখে জল দেখলেই ভিড় করবে। এমনিতেই

তার চেহারা দেখে অনেকে সন্দেহজনকভাবে তাকাচ্ছে তার দিকে।

গাড়ি এসে গেল। চেপে বসল বিভাস। ঘণ্টাখানেক কিংবা তারো অনেক বেশী সময় চলার পর, গাড়িটা এসে দাঁড়াল একটি স্টেশনে। আলোর কোনো বালাই নেই। দূরে একটা কেরোসিন তেলের ল্যাম্পপোস্ট। সেটাও টিমটিম করছে। দু'একজন যাত্রী উঠল কি নামল টেরও পাওয়া যায় না। কাছেই, সম্ভবত প্ল্যাটফরমেরই আর একপাশ থেকে, শেয়াল ডেকে উঠল একপাল।

বিভাস নেমে পড়ল। গাড়িটা চলে যাওয়ার পর তার লক্ষ্য পড়ল, অস্পষ্ট চাঁদের আলো দেখা যায়। আকাশের তারাগুলি ঝাপসা। একটু যেন শীত শীত লাগে। আশেপাশে অস্পষ্ট গাছপালার ছায়া। স্টেশন-ঘরটা আরো দূরে। সেখানে কোনো সাড়া শব্দ নেই। না থাকবারই কথা। লোকজন নেই, সিগন্যাল ডাউন আর আপ করা। একবার সবুজ, আর একবার লালের ইঙ্গিত।

এখন কেউ বিভাসকে এই চারদিক ফাঁকা প্ল্যাটফরমের উপর দেখলে ভয় পেত। উসকো-খুসকো চুল, মোটা ধুতিটা প্রায় মাটিতে লুটোচ্ছে। লম্বায় সাড়ে পাঁচ ফুটের কম না। চোখদুটি তার বড়-ই। কিন্তু এখন লাল দেখাচ্ছে। ময়লা শার্টের রঙ বোঝবার উপায় নেই।

সামনেই একটি বেঞ্চি পেয়ে শুয়ে পড়ল বিভাস। সঙ্গে সঙ্গে তার হাত-পা আবার নিস্তেজ হয়ে এল।

শুধু রাস্তার লোকের চোখের উপরে, রাস্তায় মরার ঘৃণায় এতখানি চলে এসেছে সে। বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করা যায়, গলা দেওয়া যায় ট্রেনের লাইনে। কিন্তু সেটা বড় বীভৎস মনে হয়।

আর-একভাবে মরা যায়। যেভাবে সবাই মরে। অসুখ হয়, ডাক্তার আসে, কান্নার রোল পড়ে। কিন্তু তেমন মরণ বিভাসের কপালে নেই। মরতে হবে তাকে, এ-ভাবেই। কিন্তু তার অপমানটা চোখে দেখতে রাজি নয় সে।

বুঝি এই জন্যেই মরার মতো এতবড় একটা বিষাদগম্ভীর বিষয়কে বাঙালী বলে, মরার বাড়া গাল নেই।

কোথায় একটি গোরুর গাড়ির চাকার ক্যাঁকানি আসে ভেসে। গাড়োয়ানের বলদ-তাড়ানো কয়েকটি অস্পষ্ট শব্দ।

শীত লাগে বিভাসের। আর সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত চেতনা তলিয়ে যেতে থাকে কোন অতলে। ঝিঁঝিঁ পোকাটার অদৃশ্যে বেঁচে থাকার পাঁচালিটাই বাজতে থাকে তার কানে। শিশির পড়ে। আকাশের তারাগুলি দূরে চলে যায় আরো।

শেষবারের জন্যে বোধহয় বিভাসের চোখের সামনে তার বাবার মূর্তিটা ভেসে ওঠে একবার। তিন মাস আগে ভীষণ ঝড়-জলের মধ্যে, বিভাসের বাবা মাঠে

বাঁধা গোরু দুটিকে খুলে আনতে গিয়েছিলেন। বাড়ি থেকে বেরিয়ে পাঁচ মিনিটের রাস্তাও নয়। বাজ পড়ে মারা যান সেখানেই। গোরু দুটিও মরে যায়।

সময়টা ছিল বেলা তিনটের মতো। বাড়িতে ছিল বিভাসের তিন দাদার তিন বউ। বিভাস আটকে পড়েছিল গ্রামের স্টেশনে কলকাতা থেকে ফিরতি পথে। তিন দাদাই চাকুরিজীবী। ছিল নিশ্চয় চাকরির জায়গাতেই। বউদিরা চিরকালই ও সময়টা ঘুমোয়। যিনি জেগে থাকতে পারতেন কিংবা গোরু দুটিকে খুলেও আনতে যেতেন নিশ্চয়ই, তিনি মা। মারা গেছেন অনেক আগে। কিংবা মা থাকলে বউদিরা ঘুমোত না, তারাই গোরু খুলে নিয়ে আসত।

বাইশ বছরের বিভাস আই. এ. পাশ করে তখন চার বছরের বেকার। কলকাতায় গিয়ে সে চাকরির চেষ্টা করে, এটা তিন দাদার কেউ-ই বিশ্বাস করত না। বাবা বিশ্বাস করতেন কিনা বোঝা যেত না সেটা। খালি বলতেন তোর কপালে দেখছি অনেক দুঃখ আছে।

দাদারা কথা বলত না। বড় আর মেজবউদির এত ছেলেমেয়ে, কথা বলার অবসরই ছিল না তাদের। ছোটবউদির পাঁচ বছর বিয়ে হওয়া সত্ত্বেও ছেলেপুলে হয়নি। সে খালি পান খেত জরদা দিয়ে। বিভাসের সঙ্গে কথাও বলত। কিন্তু ছোটবউদির সমস্ত কথার একটি-ই বিষয় ছিল। মেয়ে আর পুরুষ। সে-সব কথা একটা বিশেষ বিষয়ে কেন্দ্রীভূত ছিল। বিভাস হাসতে গিয়ে উল্লুকের মতো তাকিয়ে থাকত ছোটবউদির মুখের দিকে। তখন ছোটবউদি তাকে একটি পান সেজে খেতে দিয়ে বলত, এটি চিবুতে চিবুতে যাও, বলেছি তার একটু কুলকিনারা পাবে হয়তো।

জরদা দেওয়া পানের পিক ফেলতে ফেলতে, কোনদিনই সেসব কথার কুলকিনারা পায়নি বিভাস।

তাদের বাড়িটা ছিল, সেকেলে বড় বাড়ির মতো। সংলগ্ন কিছু জমি। ঠাকুরদার আমলে নাকি আরো অনেক কিছু ছিল। সেকালে অনেক কিছু ছিল, একালে থাকে না। এ-নিয়ে ভাববার কিছু নেই।

বাবা যেদিন মারা গেলেন, স্টেশনে দাঁড়িয়ে সেই ভীষণ বাজ-পড়াটা দেখেছিল বিভাস। স্টেশনের সকলের সঙ্গে সে-ও চমকে উঠেছিল। কে একজন বলে উঠেছিল, খুব কাছেই পড়েছে।

বাজ অনেক পড়েছে, মানুষ মরার সংবাদও শোনা গেছে অনেক। কিন্তু বাবার মাথায় বাজ পড়তে পারে, এটা কোনদিন বিভাস ভাবতেই পারেনি। ছেলেবেলা থেকে সে শুনে এসেছে, একমাত্র মহাপাপীরাই বজ্রাঘাতে মরে। কিন্তু তার জ্ঞানী সহিষ্ণু বাবার কোনো পাপ থাকতে পারে বলে সে বিশ্বাস করে না।

তার তিন দাদা এবং দুই বউদি শুধু বজ্রের ভয়ংকরতা, সৎকারের আগে অপঘাত-মৃত্যুর নানান হিন্দু ক্রিয়াকলাপ ইত্যাদিতেই ব্যস্ত ছিল।

বিভাস ভীষণ কাঁদছিল সেটা কেউ চেয়েই দেখেনি। দেখাবার জন্যে সে কাঁদেনি। কিন্তু বিভাস ছাড়া জল দেখা গেল না কারো চোখে। শুধু এক সময়ে তার ছোটবউদি বলেছিল, শিগগির শ্মশানযাত্রীদের সঙ্গে কাঁধ দাও গে। তবু গাঁয়ের লোকের মনে থাকবে অমুকের একজন ছোট ছেলে আছে।

শ্রাদ্ধের আগেই দেখা যেত, চিন্নিবাস অর্থাৎ শ্রীনিবাস, প্রভাস, বিকাশ, তিন দাদা সকালে বিকালে বসে বসে গুরুগম্ভীর আলোচনায় ব্যস্ত।

ছোটবউদির তখন ভীষণ হাই উঠত। একটি কথাও পুরো বলতে পারত না, হাই উঠে যেত। হবিষ্য চলছিল। পান জরদা একদম বন্ধ।

হাই তুলতে তুলতে এসে বলেছিল, দাদাদের কথাগুলো একবার শুনতে চেষ্টা করো।

কেন?

শুনলে ভালো করতে। ওঁরা যে ভুলতে বসেছেন, ওঁরা চার ভাই।

মানে!

ছোটবউদি হাসতে গিয়ে হাই তুলে বলেছিল, কিছু না। ভগবান করুন, তোমার বউ যেন আমার মতো একটি মেয়ে হয়।

এমন দুঃখের দিনেও যে ছোটবউদি এসব কথা বলতে পারে, ধারণা ছিল না বিভাসের। তবে ছোটবউদি বলেই মনে করার কিছু ছিল না।

এগারো দিনের দিন শ্রাদ্ধ হয়ে গেল। তার পরদিন তিন দাদা ভীষণ ঝগড়া করল। বড়দাকে মারতে গেল মেজদা আর ছোড়দা।

ছোটবউদি এসে তাড়াতাড়ি বলল, তুমি যে-কোনো এক পক্ষ নিয়ে গিয়ে দাঁড়াও শিগগির।

বিভাস বলল, কেন? দোতলার দক্ষিণ অংশটা তো বড়দারই পাওনা। ও বিষয় নিয়ে ঝগড়া হচ্ছে, তাই তো বুঝছি না।

আর তোমার?

মা যে-ঘরটায় মারা গেছল?

ছোটবউদি একদৃষ্টে তাকিয়ে থেকে বলল, পান খাবে একটা?

বিভাস অবাক হয়ে বলল, দাও।

বড়দা যেন মন্ত্র দিয়ে মেজদা আর ছোড়দাকে শান্ত করে দিল।

দিন দশেক পরে বিভাসের কলকাতা থেকে ফিরতে একটু দেরি হল। এসে দেখল সবাই ঘুমিয়ে অচেতন। কোনো ঘরের দরজা-ই খোলা নেই। অনেক ডাকাডাকির পর, ছোটবউদি দরজা খুলে দিল। দিয়ে বলল, শুয়ে পড়ো গে।

খাব না?

বড়দি আজকে তোমার চাল নিতে ভুলে গেছে খাবার কিছু নেই।

ও! বলে করুণ চোখে ছোটবউদির দিকে তাকিয়ে রইল বিভাস। আশ্বিনের আকাশে পরিষ্কার জ্যোৎস্না। ছোটবউদির গালে তখনো পান, ঠোঁটদুটি অসম্ভব লাল। চোখদুটি নতুন আরশোলার পাখনার মতো চকচকে। শাড়ি ছাড়া গায়ে আর কিছু না থাকায় শরীরটা কেমন বেআব্রু মনে হল। আর বিভাস যেন শিরশিরিয়ে উঠল লজ্জায়।

খাবার কথার পরই ছোটবউদি বলল, তোমার চার ভায়ের মধ্যে তুমিই দেখছি সবচেয়ে সুন্দর। যৌবনে নিশ্চয় শ্বশুরমশাই তোমার মতোই ছিলেন দেখতে।

কিন্তু বিভাস তখন বড় ক্ষুধার্ত। তার চোখেমুখে কষ্ট ও রাগ দেখা দিল। রাগ সে বড় একটা করে না। সে বোকা নয়, কিন্তু অবিশ্বাস করা কিংবা সন্দেহ করাটাও তার চরিত্র নয়। ছোটবউদির কথা গায়ে না মেখে সে বলল, আশ্চর্য! বড়বউদি আমার চাল নিতে ভুলে গেল?

ছোটবউদি বলল, না, চাল নিতে কেন ভুল হবে। আসলে তোমাকেই ভুলে গেছে। তোমাকে মনে থাকলে চাল তো নিত-ই।

তবু সংসারে রোজ রান্না হয়, তার একটা মাপামাপি আছে…।

মাপামাপির মাত্রা মানুষের চিরকাল সমান থাকে না।

ছোটবউদির গলার স্বরে অবাক হয়ে তাকাল বিভাস। কথাটা কিভাবে বলল ছোটবউদি, আন্দাজ করতে পারল না। খালি দেখল, ছোটবউদি নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে আছে তার দিকে।

বিভাস চোখ নামিয়ে বলল, ঠিক আছে। তাহলে শুয়ে পড়ি গে।

ছোটবউদি বলল, আমার বাপের বাড়ি থেকে আমসত্ব পাঠিয়েছে, খাবে?

দাও।

ঘরে গেল বিভাস। ছোটবউদি আমসত্ব এনে দিল। বিভাস চিবিয়ে চিবিয়ে খেল।

ছোটবউদি বলল, যেন কালো মানুষের চামড়া ছাড়িয়ে খাচ্ছ।

ছোটবউদি কালো নয়, ফরসাও নয়। বিভাসের বিঘ্নিও লাগল না। যা-হোক কিছু খেতে পেয়ে তার ভালো লাগছিল। বলল, তুমি শোওগে ছোট-বউদি।

ছোটবউদি একটি পান বের করে বলল, জল খাও, পানটা দিয়ে যাই।

পানটা হাতে দেওয়ার সময়ে ছোটবউদি বলল, মেয়েমানুষের হাতে করে ব্যাটাছেলেকে পান দিতে নেই।

কারণটা জানে বিভাস। তার চোখে মুখে রক্ত ছুটে এল লজ্জায়। চোখ তুলে ছোটবউদির দিকে তাকাতে গেল। কিন্তু নামিয়ে নিতে হল দৃষ্টি। মনে মনে বলল, ছোটবউদির একটুও খেয়াল নেই, বুকের আঁচলটা কতখানি

সরে গিয়েছে। একটু টেনে দেওয়া উচিৎ। কিন্তু বলতে সাহস হল না। ছোটবউদি হয়তো আরো অবাধ্য হয়ে উঠবে। কটা-কটা মুখখানি অন্য দিকে ফিরিয়ে বলল, পানটা রেখে দাও না তক্তপোশের ওপরে।

ছোটবউদি খোঁচাতে ভালোবাসে। বলল, কিন্তু কেন দিতে নেই, জানো তো?

বিভাস ঘাড় কাত করে বলল, জানি।

তবে? এতদিন যখন দিয়েছি, আজ আর তক্তপোশে রেখে কি হবে?

তবে কি করবে বিভাস ভেবে পায় না। প্রবাদ আছে, স্বামী ভিন্ন কাউকে হাতে পান দিতে নেই। সেটা যে হাতে হাত ঠেকে যাওয়ার আশঙ্কায়, তা নয়। তার চেয়েও ভীষণ খারাপ। একটা প্রতীক চিহ্নের মতো। ছোট-বউদি বলেই এ রকম করে বলতে পারে রাতদুপুরে এসে।

বিভাস অদ্ভুতভাবে অন্য প্রসঙ্গ এনে, করুণভাবে বলল, জানো ছোট-বউদি, একটা চাকরিবাকরির ব্যবস্থা করতে না পারলে, আমার কি রকম ভয় হচ্ছে। আর কিছুই ভালো লাগছে না।

ছোটবউদি খানিকক্ষণ অবাক হয়ে তাকিয়ে থেকে, হঠাৎ একটি নিশ্বাস ফেলে বলল, হ্যাঁ, এতক্ষণে একটা কথা বলেছ বটে। এবার আমাকে শুতে যেতেই হয়।

পানটি রেখে যাওয়ার আগে বলে গেল, সেটা দু-একদিনের মধ্যেই চেষ্টা করো নইলে বিপদ আছে। পান সেজে না হয় আর না-ই দেব।

এ ঘটনার দিন বারো পরে, রাত্রি প্রায় আটটার সময় বিভাস বাড়ি ফিরল কলকাতা থেকে। একটু পরেই শুনতে পেল, চিনিবাস অর্থাৎ বড়দা চিৎকার করছে, কার খায় সে? কার বাড়িতে শুতে আসে?

বড়বউদির গলা শোনা গেল, সেটা তাকে গিয়ে জিজ্ঞেস করো।

বড়দা গেল মেজদার কাছে।—প্রভাস এসব আর কতদিন চলবে?

চিনিবাস আর প্রভাস গেল বিকাশের কাছে—বিকাশ তুই যদি ওটার ভার নিস তো নে, না হয় যা করার তুই কর।

সেই মুহূর্তে ছোটবউদির চাপা গলা শোনা গেল পেছনের জানালা দিয়ে ঠাকুরপো, কেটে পড়ো শিগগির।

কেটে পড়বে? কেন! ভাবতে না ভাবতে তিন দাদা এসে দাঁড়াল বিভাসের ঘরে। যেন তিনজন পুলিশ অফিসার, সার্চ করতে এসেছে। এদিক দেখে ওদিক দেখে তারপর মেজদা বলল, আর এভাবে কদ্দিন চালাবি ভেবেছিস।

চাকরির তো চেষ্টা করছি···

বিকাশ বলে উঠল, আই-এ, বি-এ পাশ করিনি, কিন্তু চাকরি কি পাইনি? ওসব ফেরেববাজী চেপে যা, আসল কথা বল।

মানে ?

কাদের সঙ্গে কথা বলছে বিভাস ভেবেই পেল না।

চিনিবাস চিৎকার করে বলল, ওসব আমরা জানি। চাকরিবাকরির চেষ্টা আসলে বাজার গরম করে রাখা। ঘাপটি মেরে আছিস, কখন জমি আর বাড়ি ভাগাভাগি হয়। হলেই নিজের অংশটি বেচে দিয়ে কেটে পড়ার তাল, না ? আর আমরা তোকে বসিয়ে খাওয়াব, অ্যাঁ ?

প্রভাস একটি থাপ্পড় কষাল বিভাসের গালে, উল্লুকের মতো তাকিয়ে আছিস কি, অ্যাঁ ? জবাব দে না।

বিভাস, এসব ভেবে ওঠবার আগেই, ভীষণ রাগে তার দু-চোখে জল এসে পড়ল। বলল, এসবের মানে কি।

দুই পুরুষ আগের শ্রীনারায়ণ তর্কশাস্ত্রীর বংশধর বিকাশ গর্জে উঠে বলল চোপ বানচোত, বেরিয়ে যা এখুনি।

বলে বিভাসকে ধাক্কা দিল। বিভাস হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে দরজার কাছে। সে চিৎকার করে বলল, খবরদার বলছি, এরকম কোরো না।

তখন স্বয়ং চিনিবাস বিভাসের চুলের মুঠি ধরে মারতে মারতে বলল, শোরটাকে দেখলে আমার গা জ্বলতে থাকে। বেরো, বেরো বাড়ি থেকে।

বিভাস বাধা দেওয়ার চেষ্টা করে বলতে লাগল, আমি জানতুম তোমরা নীচ, কিন্তু এতখানি—

বিকাশের বুদ্ধির তেমন বোধহয় বিকাশ হয়নি। সে বলল, যে আশায় আছিস, তোর সে আশায় ছাই পড়ে গেছে, মনে রাখিস। তোর বাপ তোর জন্যে কিছুই লিখে রেখে যাওয়ার সময় পায়নি। ওসব লেখাপড়া যা করার তা হয়ে গেছে, বুঝেছ চাঁদ ! এবার কাটো। ওসব ঘাপটি মেরে বসে আর পজেশান রাখতে হবে না। কোর্টঘর করগে আগে।

এমন সময় এক কাণ্ড ঘটল। বড়বউ আর মেজবউ ব্যাপারটা দেখছিল। রান্নাঘরে কেউ নেই, ছোটবউ ছাড়া ! খা-খা করে জ্বলছিল উনুন। পেল্লায় ভাতের হাঁড়ি চাপানো ছিল তার উপরে। ডাল-তরকারি আগেই হয়ে ছিল।

বড়বউ হঠাৎ দেখল, ভাতের হাঁড়িটা উলটে ফেলে দিল ছোটবউ। এক-বালতি জল ঢেলে দিলে উনুনে। বাজি পোড়াবার মতো শব্দ করে সারা ঘর ভরে গেল ছাইয়ে ও ধোঁয়ায়।

বড়বউ চিৎকার করে উঠল, ও ছোটবউ, ও কি করছিস। ওগো তোমরা শিগগির এস গো, ছোটবউএর মাথা খারাপ হয়ে গেছে।

ছোটবউ তখন ডাল-তরকারিগুলি নর্দমার মুখে ঢেলে দিয়ে স্বাভাবিক শান্ত গলায় বলল, তা কি করব বাপু। ওই উল্লুকটাকে আমারও মারতে ইচ্ছে করছে। কাছেই যেতে পারলুম না, এগুলোকে দিয়েই সামলে নিলুম।

ব্যাপার দেখে তর্কশাস্ত্রীর বংশধরেরা থেমে গেছে। বিভাস বেরিয়ে গেছে

কাপড় ঠিক করতে করতে।

চিনিবাস তখন ছোটবউয়ের চরিত্র সম্পর্কে অকথা-কুকথা শুরু করল চিৎকার করে। বিকাশ বলল, খবরদার দাদা।

প্রভাস বলল, কেন খবরদার? হাজারবার বোলেগা।

রক্ত গরম হয়েই ছিল। তার গতিবিধিটা আন্দাজ করা যায়নি। কেননা সেটা দেখা যায় না। আবার একটা কুরুক্ষেত্র শুরু হল।

ছোটবউ বলে উঠল উঠোনের একপাশ থেকে, কার দোষে এসব হচ্ছে শুনি। মেজঠাকুর সেদিন বড়দিদির সম্পর্কে যেসব খারাপ কথা বলছিল……।

চিনিবাস বিকাশকে ছেড়ে প্রভাসকে নিয়ে পড়ল।

মারামারি থামল। সেই রাতটা গোটা পরিবার উপোস। পরদিন তিন ভাইয়ের তিন হাঁড়িতে রান্না চাপল।

সেই শেষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে এসেছে বিভাস। বাড়ি থেকে কলকাতায়।

তারপর…তারপর এই। বন্ধুদের কাছ থেকে বিতাড়িত হয়ে বাড়ি যাওয়ার কথা তার মনে হয়েছিল। তার চেয়েও মরাটা সহজ মনে হয়েছিল তার কাছে। সেটাই তার শেষ এবং একমাত্র জায়গা। কেবল মনে হচ্ছিল, তার জীবনটা এত সহজে শেষ হচ্ছে। অথচ মানুষের জীবনে নাকি কতই ঘটে। আবার ছোটবউদির আমসত্ত্ব খাওয়াবার কথাটা মনে পড়ল একবার।

তারপর কখন একসময় তার সমস্ত মনে পড়াপড়িও অস্পষ্ট হতে হতে, এক সুগভীর কালো শূন্যের মধ্যে গেল হারিয়ে। বোধহয়, বাঁচার সাধ ছিল, তাই আবার জল আসছিল চোখে। এল কিনা টের পাওয়ার আগেই শেষ হয়ে গেল চেতনা। মারা গেল বিভাস। বোধহয় মরার প্রহরে শেয়াল ডেকে গেল আর একবার।

কিন্তু বিভাস বেঁচে উঠল আবার। দেখল কয়েকজন গ্রাম্য লোক এদিকে ওদিকে দাঁড়িয়ে রয়েছে আপন মনে। কিছু সবজি তরকারির ঝাঁকা-চুপড়ি আশেপাশে।

কি রকম হল? বিভাস মরেনি, উপরন্তু খিদেটা তার ভীষণ পেয়েছে। কাঁচা তরকারিগুলিই যেন সে খেতে পারে, এমনিভাবে তাকাল সেদিকে। মরার পরে আর-এক নতুন জন্ম হল তার। লোকের কাছে চেয়ে খেতে ইচ্ছে করছে এখন। না দিলে ভিক্ষে চাইতে কোনো বাধা নেই তার এ-জন্মে।

উঠতে পারবে কি? হ্যাঁ পারছে। দশজনের সামনে মরার যেমন শক্তি পেয়েছিল, তেমন শক্তি পেল যেমন করে হোক কিছু খেতে পাবার তাড়নায়।

স্টেশনটা যেন স্টেশন নয়। একটা হল্ট মাত্র। মাঠের মাঝখানে দুটি প্লাটফর্ম। মাথায় কোনো শেড নেই।

রেল লাইনের পূবে, মাইল খানেক দূরে গ্রাম দেখা যায়। পশ্চিমে,

স্টেশন থেকে নেমেই, ছোট একটা মাঠ পেরিয়ে চওড়া রাস্তা গিয়ে মিশেছে অনেকগুলি চালাঘরের জটলার মধ্যে। ছোটখাটো দু-একটা পাকা ঘরও দেখা যায় সেখানে।

বিভাস নেমে গেল স্টেশন থেকে। ধীরে ধীরে হেঁটে গেল চালাঘরগুলোর দিকে। রোদ উঠেছে, বিভাসের ছায়াটা পড়েছে একটা লম্বা খোঁচা খোঁচা বাঁশের মতো। অগ্রহায়ণের এই রোদটা আরাম দিচ্ছে বেশ।

সামনেই কয়েকটা গোরুর গাড়ি ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে। বলদগুলি আছে হয়তো অন্যত্র কোথাও। মুড়কির গন্ধ লাগছে নাকে। আর অগ্রহায়ণের মাঠের গন্ধেও একটা আশ্চর্য ক্ষুধার আভাস।

চালাঘরগুলো একে একে খুলছে। সামনে একটি পাকা ঘর। সেদিকেও বিভাস তাকাল একবার। বেশ বড় ঘর। বেঞ্চিতে কয়েকজন মেয়েপুরুষ বসে আছে। দেখলেই বোঝা যায়, তাদের কারুর ক্ষুধা নেই। সকলেই অসুস্থ। আলমারিগুলি দেখে বুঝল বিভাস, ঘরটা একটা ডাক্তারখানা। সারা অঞ্চলে বোধহয় একটিই সাইনবোর্ড আছে। সেটি এই ডাক্তারখানার। নাম 'অচিন ফার্মেসী'। ডাঃ তারকেশ্বর রায়, এল. এম. এফ। গ্রাম—আঁচনা, পোঃ—আঁচনা, জেলা…ইত্যাদি।

বিভাস মুড়কির গন্ধটা আর একবার শুঁকল। কোন দিক থেকে গন্ধটা আসছে আন্দাজ নেবার জন্যে। তারপর পশ্চিমে পা বাড়াল।

একজন ডাকল পেছন থেকে, অই গো অ-বাবু, এদিকে শোনেন। বিভাস ফিরল। একটা চাষী মানুষ দাঁড়িয়ে আছে পাকা ঘরের বারান্দায়। বিভাস ফিরে বলল, আমাকে বলছ?

আজ্ঞে।

কি বলছ?

ডাক্তারবাবু ডাকছেন।

ডাক্তার বোধহয় বিভাসকে অসুস্থ ভেবেছে। বিভাস এগিয়ে গেল পায়ে পায়ে। ঘরের রুগীরা সবাই ফিরে তাকাল তার দিকে।

চেয়ারে বসেছিলেন তারকেশ্বর। নামের সঙ্গে চেহারার অনেকখানি মিল আছে। ফরসা রঙ, দোহারা গঠন, মাথায় বিভাসের চেয়ে দু-এক ইঞ্চি লম্বাই হবেন। কালো স্ট্রাইপ দেওয়া বুক খোলা শার্টের সঙ্গে গোঁফজোড়ার কোথায় যেন অদৃশ্য মিল রয়েছে। চোখ দুটি ছোট, পিঙ্গলের আভাস। চুল ছোট করে ছাঁটা, কিন্তু দেখলেই বোঝা যায়, গোড়া রীতিমত শক্ত। বয়স পঞ্চাশের মধ্যে, কিন্তু চুল কালো।

একটা সেকেলে সোনা বাঁধানো মোটা ফাউণ্টেনপেন দিয়ে কি যেন লিখেছিলেন। বিভাসকে দেখে বললেন, কোত্থেকে আসা হচ্ছে? এ অঞ্চলে কখনো দেখেছি বলে মনে হচ্ছে না তো।

বোঝা গেল ডাক্তারের সন্দেহ হয়েছে। বিভাস বলল, না এদিকে থাকি নে। এসেছি অনেক দূর থেকেই।

তারকেশ্বরের চোখে চোখ রাখা কঠিন। বললেন, কোনো কাজে নাকি?

বিভাস শুধু মাথা নাড়ল।

তবে?

এতক্ষণে বিভাস সামনের বোর্ডটা পড়ে দেখে বুঝতে পারল, সে আঁচনা ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে কথা বলছে। লেখা আছে ডাঃ তারকেশ্বর রায়। প্রেসিডেণ্ট, আঁচনা ইউনিয়ন বোর্ড।

কিন্তু কি বলা যায়? খেতে পাওয়া দরকার। যা হোক কিছু খেতে না পেলে চলবে না। মুখটাকে কাঁদো কাঁদো করে যা-তা কিছু বললে কেমন হয়। আজ্ঞে, বাবু ইত্যাদি।

সে বলল, আজ্ঞে নানান কারণে নিরুপায় হয়ে··· ।

তারকেশ্বর তার পিঙ্গল ছোট চোখে তাকিয়েছিলেন অপলক। বললেন, শহর থেকে গ্রামে শেষটায়? অবিশ্যি সেটাও আজকাল অনেকে ভাবছে।

তারকেশ্বরের শক্ত বলিষ্ঠ হাতে কেমন একটা নিষ্ঠুরতা যেন ফুটেই আছে। কেন এরকম মনে হল বিভাসের কে জানে। তারকেশ্বর বললেন, কোথায় যাওয়া হবে?

'তুমি' করে না বলার যদিও কোনো কারণ নেই, তবুও তারকেশ্বরের সম্বোধন তুমির চেয়ে ভালো নয়।

বিভাস বলল, বুঝতে পারছি নে। দেখি··· ।

দেখবার মধ্যে আছে এই আঁচনা গ্রাম। পুব-আঁচনা আর পশ্চিম আঁচনা। এই হচ্ছে হাট। নেদো, পয়ারপুর, ছোট কেষ্টপুর, আম্‌দা গাঁ আছে এর আশে পাশে। এই রকমই গ্রাম সব। কেউটে-বিষপুরে···

তারকেশ্বর থামলেন। চোখদুটো কুঁচকে উঠল এবার বিভাসের দিকে তাকিয়ে। বললেন, লেখাপড়া কদ্দুর?

আই-এ পাশ করেছি চার বছর আগে।

তারকেশ্বরের পিঙ্গল চোখে বিস্ময়ের ঝিলিক দেখা গেল, জিজ্ঞাসা করলেন, নাম?

শ্রীবিভাসরঞ্জন শাস্ত্রী।

শাস্ত্রী? আদি বংশ—?

মুখোপাধ্যায়।

তারকেশ্বরের চোখে একটা তীক্ষ্ম সন্দেহ ঝিলিক দিয়ে উঠল হঠাৎ। বললেন, কৃষক খ্যাপানো-ট্যাপানোর জন্যে শহর থেকে কোনো দল পাঠায়নি তো?

কৃষক খ্যাপানো? ও, রাজনীতির কথা বলছেন তারকেশ্বর, কিন্তু

খ্যাপা এবং খ্যাপানো, কোনোটাই বিভাসের পক্ষে সম্ভব নয়। বলল, আজ্ঞে, ওসব কিছুই কখনো করিনি।

তারকেশ্বরের ভ্রূ জোড়া সহজ হল। বোঝা গেল তিনি বিশ্বাস করছেন বিভাসকে। তার অভিজ্ঞ চোখ অনেক গভীরে দেখতে পায়।

হুঁ। দেখে মনে হচ্ছে খাওয়া হয়নি কয়েকদিন!

আজ্ঞে হ্যাঁ।

তারকেশ্বর বললেন, কিছু খাবে?

বিভাস নীরবে মাথা নাড়ল। তারকেশ্বর ডাকলেন, রাসু।

আজ্ঞে!

ভিতরে আর একটি ঘর ছিল। একটি লোক বেরিয়ে এল সেখান থেকে। খোঁচা চুল। কালো লম্বা মানুষ। হলদে চোখ দুটি একটু বেশি পিটপিট করে।

রাসু, গদাইয়ের দোকান এতক্ষণে খুলেছে। কিছু মিষ্টি আর মুড়ি-মুড়কি চাট্টি এনে দে। বোসো, বোসো এইখানে। এই বেঞ্চিটায়।

কাছের বেঞ্চিটা দেখিয়ে দিলেন তারকেশ্বর। তারপর একজনের দিকে ফিরে বললেন, পয়ারপুর যেতে হবে বলছিলে না?

আজ্ঞে ডাক্তারবাবু তিন কোশ পথ, কাল রাত থেকে এইসে বইসে আছি।

বোসো।

প্রেস্‌ক্রিপশন লিখলেন তারকেশ্বর। একটি বড় টেবিলের উপরে কম করে খান পঞ্চাশ বোতল, একজোড়া খল, মলম তৈরি করার একটা সাদা পাথর আর রুটি-কাটা ছুরি—সবই আছে। সেই টেবিলে গেলেন তারকেশ্বর ওষুধ তৈরি করতে।

রাসু এল খাবার নিয়ে। তারকেশ্বর ওষুধ তৈরি করতে করতেই বললেন, খাও। রাসু জল দে হাতমুখ ধোবার। খাবার জল দে। মধু, তোর কি হয়েছে রে?

আজ্ঞে ডাক্তারবাবু পেটে একটা ব্যথা···।

লিভারটা পচিয়েছিস, তার ওপর তাড়ি গিললে ব্যথার দোষ কি?

মধু মাথা নত করল।

বিভাস খেতে খেতে লক্ষ্য করল তারকেশ্বর দেখছেন তাকে মাঝে মাঝে। বোধহয় ভিখিরি ভেবেছেন তাকে। ভাবতে পারেন। কিন্তু খাবারটা কোনো রকমেই আর হাত-ছাড়া করতে পারবে না বিভাস। দশজনের সামনে মরার পরে, আর একবার বাঁচবার জন্য ঠিক মরার মতোই অচেতন মনে হচ্ছে এখন নিজেকে। আরো তাড়াতাড়ি চেটেপুটে খেতে ইচ্ছে করছে তার। কিন্তু রুগীগুলিও তাকিয়ে আছে তার দিকে।

খাওয়ার পর বসে রইল বিভাস। ঘরের চারদিকে তাকাল। ওষুধের

দোকানের ক্যালেণ্ডার খান চারেক। ডি, বি, বি, এল, আর এস, বি, বি, এল,—নানারকমের বন্দুকের ছবি কেন, ভেবে পেল না বিভাস। কিন্তু এবার তার কি করা উচিত। তারকেশ্বরবাবুকে একটা ধন্যবাদ কিংবা আর কিছু কি বলা যায় ?

তারকেশ্বর একে একে অনেককে বিদায় করলেন। মধুকে ওষুধ দিয়ে বললেন, খড় অনেক জমে আছে, হাটে আনতে হবে।

কালকেই নিয়ে আসব।

গড় করে চলে গেল মধু। তারকেশ্বর একটি কাগজ বাড়িয়ে দিলেন বিভাসের হাতে। বললেন, পড়তে পার ?

বিভাস পড়ল, ম্যাগ্‌সালফ, লিকুইড কুইনাইন…

থাক, বুঝেছি। তোমার বাড়ি কোথায় বলছিলে ?

তারকেশ্বরের চোখের ভাঁজে দৃষ্টিটা আরো তীক্ষ্ন দেখায়। বিভাস জবাব দিল।

কে কে আছে বাড়িতে ? এভাবে আসার কারণটা কি বলো তো শুনি।

বিভাস অবাক হল তার আত্মসম্মান বোধ দেখে। সে কারণটা বলতে পারল না সব লোকের সামনে। বিব্রতভাবে তাকাল সে সকলের দিকে।

তারকেশ্বর বললেন, ও! এস, পাশের ঘরে এস।

পাশের ঘরে গিয়ে রাসুকে বাইরে পাঠিয়ে দিলেন তারকেশ্বর।

বিভাস বলল, যতটা বলা যায়।

আই-এ পাশ করেছ, কলকাতায় যাতায়াত করেছ, শহরের টান তোমার বরাবরই থাকবে। নইলে একটা কাজ তোমাকে আমি দিতাম।

কাজ ? শেষটায় এখানে ? ও, বুঝেছে বিভাস, কম্পাউণ্ডারের কাজ দিতে চান তারকেশ্বর। তারকেশ্বর তাকিয়েছিলেন তার দিকে। বিভাস বলল, বেঁচেবর্তে থাকতে পারলে…।

বাঁচার চেয়ে কিছু বেশিই পাবে। আমার বাড়িতে থাওয়া থাকা পাবে, আর সামান্য কিছু হাতখরচা, এই ধরো গোটা কুড়ি টাকা। নেহাতই পান বিড়ির জন্যে—

পান বিড়ি খাই নে।

অ। তা না খাও, না খাও। কুড়ি টাকা আমি তোমাকে দেব। অবিশ্যি জামা-কাপড়টাও পাবে। তোমাদের শহরে এর চেয়ে বেশি দেয় কি ?

কম্পাউণ্ডারের মাইনের খোঁজ কোনদিন রাখেনি বিভাস। ভাবেনি এমন চাকরির কথাও। আজ তার গাঁয়ের কিনু কম্পাউণ্ডারের কথা মনে পড়ছে। আরো অনেক চেনা—অচেনা চোখে-দেখা কম্পাউণ্ডারদের মুখ ভাসছে চোখের সামনে। প্রেস্‌ক্রিপশন দেখে তারা ওষুধ তৈরি করে, মোড়ক মোড়ে, অনাসক্ত ভাবে তাকায় রুগীর দিকে। সেই অনাসক্তি থেকে রুগীদের

অনুমান হয়, ওষুধের ফল কী হবে, একমাত্র সে-ই জানে। কিন্তু তারা কেমন মাইনে পায়, সেটা জানার আবশ্যক কোনো কালেই হয়নি। বিভাস বলল, ঠিক জানি নে শহরে কত করে দেয়।

তারকেশ্বর ভাবলেন, আরো বেশি চায় ছেলেটা। বললেন, আমি এই দিতে পারি, কাজ করা না-করা তোমার ইচ্ছে।

বিভাস অনেক দিন ঘুরেছে, অনেক চাকরির দরখাস্ত করেছে, কিন্তু কোথাও কোনো দরজা খোলা পায়নি। তার চোখের সামনে যারা চাকরি পেয়েছে, তাদের দেখে বিস্ময়ে তার চোখের পলক পড়ত না। কেবলি মনে হত, এরা বিশেষ কিছু একটা জানে, যেটা বিভাসের অনায়ত্ত। তবে, খাওয়া পরা সহ কুড়ি টাকা বেতন সেখানে জুটত কিনা, ভেবে দেখেনি। বেঁচে বর্তে থাকাটা এতে অবশ্য কঠিন নয়। তাছাড়া পূর্বজন্মের জীবনটাকে নিয়ে লজ্জা ও ঘৃণার শেষ নেই বিভাসের। শহর, শহরের বন্ধু, নিজের দাদারা সবাই যখন মরণের দিকেই ঠেলে দিয়েছে, মরার পরে আবার তাদের কাছে ফিরে গিয়ে বারে বারে মরার চেয়ে এই অপরিচিত জায়গায় ও মানুষের মধ্যে থেকে যাওয়াই বিভাসের ভালো। এখানে আর যাই হোক দাদাদের মতো কেউ নেই, যারা দিন রাত্রি ভাববে, বিভাস তাদের সম্পত্তির ভাগ বসাতে চায়। খাওয়ার অধিকার নেই বলে তার ভাত ফুটোতে কেউ ভুলে যাবে না। দরখাস্তের ভিড়ের কেউ তাকে প্রতিদ্বন্দী বলে ভাববে না আর।

ছোটবউদির আমসত্ব আর কারুর খাবার লোভ ছিল না, সুতরাং সেদিক থেকে বিভাস কাউকে ঠকায়নি। সেইজন্যে ছোটবউদির কথা মনে রাখলে কেউ তাকে মারতে আসবে না। আর ছোটবউদির আবোল-তাবোল কথার মধ্যে কি যেন বিশেষ কিছু ছিল, মরার পরে সেটা অনুভব করেছে সে।

সে যে মনে করেছিল, মেয়ে এবং পুরুষের একটি সম্পর্কই ছোটবউদি বোঝে, তা নয়। ছোটবউদি আরো অনেক কিছু বোঝে।

তারকেশ্বর যেন উড়ে-এসে-পড়া একটা ডানা-ভাঙা পাখিকে নিরীক্ষণ করছিলেন। বললেন, তাহলে তুমি রাজি নও?

বিভাস তাড়াতাড়ি ঘাড় কাত করে বলল, আজ্ঞে আমি রাজি আছি। আমি আর কোথাও যেতে চাই নে।

তারকেশ্বর বললেন, বেশ, এই কথাটা মনে রেখো! তুমি চলে গেলে হাত-পা বেঁধে রাখার উপায় নেই আমার। কিন্তু কাজ ফেলে দিয়ে হট করে একদিন আমাকে অসুবিধেয় ফেলে চলে যেও না যেন। তোমরা শহর-ঘাটা তো, মন ফস্‌ফস্‌ করবে।

আবার ডাক্তারখানায় এল দুজনে। বিভাস বসে রইল। তারপর একে একে অনেক লোক এল ডাক্তারখানায়। কেউ এল ডাক্তারের কাছে, কেউ ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের কাছে। কিছু লোক এল শুধু দশটা কথা

বলতে। গাঁয়ের ও দেশের হালচাল। হাটবাজারের দর, কলকাতার খবর, মন্ত্রীদের কার্যকলাপ ইত্যাদি থেকে শুরু করে সব নানান কাহিনী। আর একটি জিনিস অনুমান করছিল বিভাস, রাসু নামে লোকটি পাশের ঘরে কি একটা বিশেষ কাজে ব্যস্ত আছে। বাইরের দরজা দিয়ে সেখানে লোক যাতায়াত ও কথাবার্তার শব্দ শোনা যায়। টাকা-পয়সা বাজে ঝনঝন করে। আর থেকে থেকে, রাসু সকলের দিকে তাকিয়ে কি যেন বিড়বিড় করে বলে যায় তারকেশ্বরকে। একটা চাপা গোঙানির মতো শোনায়। কিন্তু কথা বোঝা যায় না। তারকেশ্বরের মুখ কখনো রাগে, কখনো খুশিতে লাল হতে দেখা যায়। কিন্তু সেটা ডাক্তারখানার ব্যাপার নয়। কেননা ওষুধপত্রের দাম তারকেশ্বরকেই দিয়ে যাচ্ছিল সবাই এবং দাম দিতে না পারায় তিনজনকে ওষুধও দেননি তিনি।

তারপর তারকেশ্বরবাবু বেরুবার সময়ে বলেন বিভাসকে, তুমি বসো, ঘুরে এসে একসঙ্গে বাড়ি যাব।

বলে তারকেশ্বর টুপি মাথায় দেন, সিল্কের একটি গলাবন্ধ-কোট পরেন। যদিও সাইকেল রয়েছে, তবু যেখানে যাবেন, সেখানকার রাস্তা খারাপ বলে রুগীর বাড়ি থেকে একটি ঘোড়া নিয়ে এসেছে একজন। মাঝারি ঘোড়া। বড় বড় কেশর, হলদে ঘোড়াটিকে দেখেই বোঝা যায় খুব নিরীহ। রেকাব নেই, তাই বারান্দার কাছে ঘোড়াটাকে এনে চাপতে হয় তারকেশ্বরকে। ডাক্তারের ব্যাগ নিয়ে, গলার দড়ি ধরে ঘোড়াটাকে ধরে নিয়ে চলে রুগীর লোক। মনে হয়, রুগী মুসলমান।

তারকেশ্বর ফিরে না আসা পর্যন্ত বাইরের ঘরটায় ততক্ষণে রাসুর কাজ শেষ হয়েছে। বাইরে এসে সে যেন বিভাসকে দেখছে না, এমনি ভাব করে চোখ পিটপিট করে দেখতে থাকে বিভাসকে। তারপর হঠাৎ কাছে এসে কথা বলে। স্বাভাবিক গলার স্বরটা এতক্ষণে শোনা গেল রাসুর। মেয়েদের চেয়েও সরু গলা। বলল আই-এ পাশ করেছেন আপনি, না ?

বিভাস বলল, হ্যাঁ।

চিঠি আছে ?

কিসের চিঠি ?

পাশের চিঠি, এই সার্টিফিকেট না কি বলে।

বিভাস দেখে, রাসুর হলদে চোখ ভীষণ পিটপিট করছে ? বলল, আছে। কেন ?

একটা গোড়ালি দিয়ে আর একটি পায়ের পাতা ঘষে বলল রাসু, না, এমনি জিজ্ঞেসা করলাম।

তারপর রাসু কোথায় চলে গেল বারান্দা থেকে নেমে। হাটের দিন না হলেও কিছু তরিতরকারি এসেছে। সামান্য কিছু চুনোচানা খান কয়েক

চারা পোনা মাছ এসেছে অনেকক্ষণ। কখন বিকোবে, কোনো ঠিক নেই।

বেলা হয়েছে মন্দ নয়। রোদে একটু তাত ফুটছে। বিভাসের খিদের কষ্টটা ছাড়া ভালোই লাগে। মরার পর বোধহয় মানুষের এমনই ভালো লাগে।

কেবল একটি কথা খচ্‌খচ্‌ করতে থাকে। রাসু যেখানেই যাক, ঠিক তার দিকেই তাকিয়ে আছে যেন।

॥ দুই ॥

পুরনো ভাঙা বাড়ির চৌহদ্দির মধ্য দিয়ে, বাগান পুকুর পার হয়ে, একটি সেকেলে দোতলা বাড়ি। তার গায়ে প্রায় একেলে ধরনের নতুন বাড়িতে এসে উঠল বিভাস তারকেশ্বরের সঙ্গে। বেলা তখন প্রায় দেড়টা-দুটো। একালের বাড়ি, কিন্তু উঠোনটা মস্ত বড় এবং বাঁধানো। সারা উঠোনটা ভর্তি-প্রায় ধান শুকোতে দেওয়া হয়েছে। ছড়ানো ধানের মাঝখান দিয়ে, সরু রাস্তা করে রেখেছে, ঘরে যাবার জন্যে।

তারকেশ্বর বললেন, এস।

রোদে ছড়ানো ধানগুলি দেখে, ছোটবউদির গলার সোনার হারটার কথা মনে পড়ে যায়। যেন রঙটা প্রায় এক। আর পায়রা না থাকায় মনে হয় ধান-গুলি একা-একা, মন-খারাপ ভাব।

এ ধান নিশ্চয় গত বছরের। নতুন ধান এখনো ওঠেনি। এখনো মাঠে আছে।

বাইরের ঘরটা প্রকাণ্ড, প্রায় সেকেলে বাড়ির হলঘরের মতো। ঘরের সাজ-সজ্জা নজর করবার আগেই প্রথমে যেটা চোখে পড়ে বিভাসের সেটা কাচের আলমারিবন্দী একটি মানুষের কঙ্কাল। পাশে ঝুলে রয়েছে আর একটি কঙ্কাল, সেটি একটি মস্ত বড় সাপের। তার মাথায় কাচের জারের মধ্যে দুটি বড় মরা সাপ। একটি কালী গোখরো, আর একটি নিশ্চয়ই কেউটে। ঠিক তার পিছনের দেয়ালে তিনটি বন্দুক। কড়ার সঙ্গে বেল্ট দিয়ে ঝোলানো। তার সঙ্গে কার্টিজের কেস। মুণ্ডসুদ্ধ চিতাবাঘের ছাল রয়েছে একটা দেয়ালের একপাশে।

একপাশে একটি টেবিল। তিনটি আলমারির দুটিতে বই। যদিও ঠাসাঠাসি নয়, তবু কম নেই। আর-একটি আলমারিতে নানারকম শিশি-বোতল। টেবিলের ওপরেও খানকয়েক বই, কয়েকটি শিশি কিছু কাগজ-পত্র। একটা পেতলের রেকাবির ওপর একটি স্ক্রু-ড্রাইভার, গোটাকয়েক মরা বুলেট,

অর্থাৎ ব্যবহৃত টোটা। দুটি ব্যারেল-ক্লিনারও রয়েছে টেবিলের ওপর। চেয়ার আছে খানকয়েক। এককোণে তক্তপোশ।

সমস্তটা দেখে এখানে একজনেরই অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। একটি মানুষ, যে-ভিন্ন আর কারুর হাত পড়ে না এখানে। সে মানুষ তারকেশ্বর, বিভাস বোঝে। শুধু বোঝে না, অনুভব করে, সমস্ত জিনিসগুলির মধ্যে মুখে-কয়েকটি-তীক্ষ্ম-ভাঁজ, পিঙ্গল-চোখ তারকেশ্বর ফুটে আছেন।

পরমুহূর্তেই নিজের মূর্তিটা চোখে পড়ে তার বড় একটি আয়নায়। নিজেকে চিনতে কষ্ট হয় না। ছোটবউদি দেখলে আবার সিদ্ধির নেশা করে এসেছে ভেবে নিশ্চয় একবালতি ঠান্ডা জল ঢেলে দিত গায়ে। কিন্তু বিভাসের চুলও কি পেকে গেল কয়েকদিনের মধ্যে। বয়সটা কি তার বাইশ বছর, না, বেড়ে গেল এ কয়দিনে ?

হঠাৎ অনেকগুলি কুকুরের ডাক শুনতে পেল বিভাস। খুব কাছেই, ঘরের পিছনে কোথাও। তারকেশ্বর উত্তরদিকের একটি দরজা খুলতেই এক পাল দেশী কুকুর ঢুকে পড়ল ঘরে। অচেনা মানুষ হলেই কুকুর কি রকম হেনস্থা করে বিভাস জানে। ভয়ও আছে। কেননা কুকুরগুলি প্রায় সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। একটু-আধটু গরগর যে না করছে তা নয়।

তারকেশ্বর হাত বাড়াতেই সবাই তাকে ঘিরে ধরল। বিভাস গুণে দেখল, এগারটি কানখাড়া দেশী কুকুর। খুব বড় নয়, খুব ছোটও নয়। রঙ বেশির ভাগ কালো, গোটা কয়েক লাল। কেউ চিত হয়ে শুয়ে পড়ল তারকেশ্বরের পায়ের কাছে, কেউ বসল সামনের পা মুড়ে, আবার কেউ এমন ভাবে কাত হয়ে মাটিতে শুয়ে পড়ল যেন অনেকক্ষণ এমনি শুয়েই আছে।

তারকেশ্বর বললেন, তোদের খেতে দেয়নি বুঝি এখনো বুনোটা ?

এগারটা ল্যাজ, বাইশটা কান নড়ে উঠল প্রায় একসঙ্গে। তারকেশ্বরকে এই প্রথম হাসতে দেখল বিভাস। দেখলেই বোঝা যায়, তারকেশ্বরের সব কটি দাঁতই এখনো যথেষ্ট শক্ত। বিভাস যেন দিব্যচোখে দেখতে পায়, তারকেশ্বর মস্ত বড় একটি মাংসের টুকরো খাচ্ছেন চিবিয়ে চিবিয়ে।…কেন যে এরকম মনে হয়!

তারকেশ্বর চিৎকার করে ডাকলেন, বুনো!

একটু পরেই একটি লোক এল ছুটে। নাম যে কালেভদ্রে সার্থক হয় সেটা বুনোকে দেখে বোঝা যায়। কালো কুকুরগুলির সঙ্গে তার কোথায় একটি সাদৃশ্য আছে। যদিও বুনোর মানুষেরই দেহ।

তারকেশ্বর বললেন, এদের খেতে দিসনি ?

বুনো বলল, আজ্ঞা হাঁ, খেয়েছে, আদর কাড়ছে আপনাকে দেখে।

তারকেশ্বর কুকুরগুলিকে হাত দেখিয়ে বললেন, যা বাইরে যা।

বেরিয়ে গেল কুকুরগুলো। তারপর বুনোকে বললেন, উত্তরদিকের

বাগানের ঘরটা এই বাবুকে দেখিয়ে দে। বিছানাপত্র কি লাগবে না লাগবে, ব্যবস্থা করে দিস। তেল-গামছা নিয়ে যা, বাইরে পুকুর ঘাটটা চিনিয়ে দে। রাত্রে একটা হ্যারিকেন জ্বালিয়ে দিয়ে আসবি। আর শোন, তাপসের ধুতি পরতে দে একে একখানা।

প্রায় সব ব্যবস্থার কথাই বললেন তারকেশ্বর। জানিয়ে দিলেন, বুনো যেন সব তত্ত্বতল্লাস করে। বিভাসও যেন কোনো কিছু চাইতে না ভুলে যায়। সঙ্কোচের কথা বলেননি তারকেশ্বর। ভুলের চেয়ে ওইটিই বেশি হওয়ার কথা বিভাসের।

তারকেশ্বরবাবু চলে গেলেন। বুনো তার খোঁচা খোঁচা চুল, কালো মুখ আর শিকারি কুকুরের মতো দুটি চোখ নিয়ে কয়েক মুহূর্ত লুকিয়ে নিরীক্ষণ করল বিভাসকে। যদিও রাসুর মতো ততটা লুকোতে শেখেনি বুনো।

বিভাস জিজ্ঞেস করেই ফেলে, তোমার নাম-ই বুনো।

বুনো ল্যাজ-নাড়া উচিত কি অনুচিত, বুঝতে না পেরে, মধ্যপন্থা নিল। অর্থাৎ ঠিক কোন শ্রেণীর জীব এসে উঠেছে, সেটা বুনোর অনুমান হয়নি। বলে, আজ্ঞা। জাতেও বুনো ছিলাম। চলেন, ওই উত্তরের দরজা দিয়ে চলেন।

যেন, সে জাতে বুনো ছিল, এখন আর নেই। বিভাস বলল, কুকুরগুলোও তো ওদিকেই গেল।

আজ্ঞা। কুত্তাগুলান বার হয়ে গেছে, ওরা মানুষ কামড়ায় না।

তাই নাকি ?

আজ্ঞা। বিলে-বাদাড়ে কত্তা যখন শিকার করতে যান, তখন কুত্তাগুলান যায়। বাড়িতে চোর সেঁদোবার সময়তে যদিন্ বুনো শোর বইলে না ঠাওর হয়, তবে শালারা ডাকেও না।

বলে বুনো একটা মারাত্মক ধরনের হাসি হেসে ওঠে। বিভাস ভাবে, তবে কুকুরগুলি তাকে দেখে অমন গরগর করছিল কেন ?

বুনোর সঙ্গে সঙ্গে গেল সে। আম জাম নারকেল গাছ রয়েছে অনেকগুলি। প্রায় বিশ পঁচিশ বিঘা জমি। সামনে দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে দূর মাঠে। বাগানের মাঝখানেই একটু ফাঁকা জায়গায় বারান্দাওয়ালা পাকা ঘর। চওড়া ভিতরে পুরনো ঘর। সেখানে তক্তপোশ আর ভীষণ ময়লা তেলচিটে বিছানা পাতা রয়েছে। পাশে একটি ছোট অন্ধকার কুঠরি দেখা যায়।

এতক্ষণে বুনো জিজ্ঞাসা করল, ওষুধ বানাতে আসছেন আপনি ?

ওষুধ বানানো ? ও, কম্পাউন্ডারের কথা বলছে বুনো। বিভাস বলে, হ্যাঁ, কি করে জানলে ?

আর অ্যাট্টা বুড়াবাবু ছিলেন কিনা এইখানে, তাই জিজ্ঞেস করলাম। চইলে গেছেন।

কেন ?

শুনেছি নাকি সেটা বলে যান নাই। বলে বুনো যেন কেমন একরকম স্থির চোখে তাকায় একবার।

বুনো কী দেখে এমন করে তাকিয়ে? বিভাস আবার জিজ্ঞেস করে, কেন ?

ময়লা বিছানাটা তুলে ফেলে বুনো বলে, কেউ জানে না।

বিভাসের কি রকম অস্বস্তি হয়। এইটুকুনের মধ্যে সবই কেমন যেন বোঝা না-বোঝার মাঝামাঝি অস্পষ্ট লাগে। লোকটা কাজ করত। শুনে মনে হচ্ছে বুড়ো মানুষ। কিন্তু কেন চলে গেছে কেউ জানে না। এ কেমন কথা।

আর কিছু জিজ্ঞেস করবার আগেই বুনো পুবদিকে একটা বড় জাম গাছ দেখিয়ে বলে, ওইখানটাতেই পুকুর আছে। তেল-গামছা দিয়ে যাচ্ছি, চান কইরে আসেন। এট্টু হাততালি মেইরে যাবেন, জাম গাছে অ্যাট্টা তক্ষ আছে, বড় ফ্যাঁসফ্যাঁস করে গর্জায়। বুড়া হইয়ে গেছে। কুন' ভয় নাই।

বলে বেরিয়ে গেল।

তক্ষ! মানে, যাকে বলে ল্যাজক্ষয়া তক্ষক? কি বিপদ! ওরকম জায়গায় লোকে চান করতে যায় কেমন করে। জেনেশুনে একটা বিষাক্ত সাপের আস্তানার কাছে যায় কখনো।

হঠাৎ তার চোখে পড়ে, ছোট একটুকরো কাগজ পড়ে আছে বিছানা-তোলা তক্তপোশটার ওপরে। বিভাস নিয়ে পড়তে আরম্ভ করে। বড় বড় কাঁচা হাতের লেখা ঃ শ্রীশ্রীহরি সহায়, ছোটকেষ্টপুর, শ্রীচরণেষু বাবা, শতকোটি প্রণাম জানাইয়া নিবেদন করিতেছি আঁচনায় গিয়া তোমার কাছে থাকা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ছোট মাসিমা আসিয়াছে, আমাকে কোথাও যাইতে বারণ করে। বলে, তুই বড় হইছিস, বাপের সঙ্গে ড্যাং ড্যাং করিয়া ঘুরিলে হইবে না। পাঁচটা টাকা পাঠাইও, পয়ারপুরের রাধাগোবিন্দের মেলায় কয়েকটা বস্তু কিনিব। করালী আমাদের খড় দেয় না। ইতি সেবিকা, সুবাসিনী। ইত্যাদি।

বিভাস ভাবে, বোধহয় কম্পাউণ্ডারেরই মেয়ের চিঠি। তাহলে, কম্পাউণ্ডার তার মেয়েকে এখানে আসতে বলেছিল, সে আসেনি। কম্পাউণ্ডার তাই চলে গেছে। কিন্তু না বলে—

বুনো এল তেল-গামছা কাপড় নিয়ে।

বিভাস তাড়াতাড়ি বলল, তুমি যে বললে ওখানে একটা সাপ আছে, তবে কি করে যাব ?

বুনো হেসে বলল, কামড়ায় না। আপনি ডরাবেন, তাই আগে মানে বইলে রাখলাম। ব্যাটা বড় আয়েসী, বুড়া হইয়েছে তো। তা অগান মাস পড়তে না পড়তেই শানের ওপর চিত হইয়ে রোদ পয়ায়। হাততালি মারবেন,

পলায়া যাবে।

বলে বুনো চলে যায়। যেতে যেতে বলে, তাড়াতাড়ি যান।

বিভাস সত্যি সত্যি হাততালি দেবে কিনা বুঝতে পারে না। কিন্তু জাম গাছটার কাছে আসবার আগেই গলার স্বর কানে আসে তার। সাপের নয় নিশ্চয়ই, কথার স্বর মনে হয়। শুধু গামছা পরে এসেছে সে। সামান্য বাতাসেই সেটা উড়ে যায়। হাত দিয়ে গামছা চেপে ধরে তবু আর এক হাতে উরুতে ঠাস্ ঠাস্ করে কয়েকটি চাপড় মারল সে। তক্ষক নজরে পড়ল না। ফ্যাসফ্যাসে গর্জনও কানে এল না। কিন্তু গণ্ডগোল হল অন্য জায়গায়।

ঘাটের সিঁড়িতে সবে পা দিয়েছে নিচের সিঁড়ি থেকে একটি মেয়ে বলে উঠল, এই মুখপোড়া, এদিকে কোথায় আসছিস রে?

বিভাস ভাবল, কথাটা অন্য কারুর উদ্দেশ্যে বলা হয়েছে। সে পিছন ফিরে দেখল। কিন্তু কেউ নেই সে ছাড়া।

সে ফিরে তাকাল আবার। একজন নয়, দুজন। একজনের ঘোমটা আছে, আর একজনের নেই। যার নেই, তার মুখে একটি চেনা ছাপ আছে যেন। খোলা চুল একপিঠ ছড়ানো, সুঠাম স্বাস্থ্যপুষ্ট শরীরে গাছকোমর করে বাঁধা লাল শাড়ির আঁচল। ঘোমটা যার মাথায়, তার কালো চোখদুটি সপ্রশ্ন কৌতুকে ভরা। বোধহয় সমবয়সী।

বউটি বলল, কাকে কি বলছ, কে না কে। দেখে নাও আগে।

মেয়েটি বলল, কোত্থেকে আসছিস্?

আচ্ছা, এ সম্বোধন কি বিভাসকে করছে মেয়েটি! তখনো যেন সন্দেহ থাকায় বলল, আমাকে বলছেন আপনি।

বিভাসের কথা শুনে দুজনেই চোখাচোখি করল। মানুষের গলার স্বর ও কথার ভঙ্গি তার পরিচয়ের একটা বড় দিক। দুজনেই একটু সংশয়ান্বিতা।

মেয়েটি বলল, হ্যাঁ।

বিভাস বলল, আমি তারকেশ্বরবাবুর বাড়ি এসেছি। আমার নাম বিভাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়।

বিভাস ইচ্ছে করেই নামটা পুরোপুরি উচ্চারণ করল। আত্মরক্ষার্থে, প্রায় মরীয়া হয়ে।

বউটি তাড়াতাড়ি একটু ঘোমটা টেনে ফিস্ ফিস্ করে কি যেন বলল। মেয়েটি বোধহয় খুব কষ্টে হাসি চেপে আঁচল গুঁজে দিল মুখে। কোনরকমে বলল, ও, আমি একটা অন্য ছেলে ভেবেছিলাম।

দুজনেই তরতর করে সিঁড়ি ভেঙে চলে গেল। বিভাস ভাবল, মরে যদি বাঁচলাম, তার স্বাদ বুঝি বা এখন থেকে এরকমই হবে। চেহারাটা কি তার সত্যি বদলে গেছে? ভদ্রলোক বলে চেনাই যায় না?

জলে ডুব দিয়ে উঠে বিভাসের মনে হল, আবার মরার আগের মতো

শরীরটা তার ঝিম্‌ঝিম্‌ করছে। অবশ হয়ে আসছে হাত-পা। আসলে ভীষণ খিদে পেয়েছে তার। কয়েকদিন উপোসের পর কিছু মুড়ি-মুড়কি আর মিষ্টি খেয়ে সে যে এত বেলা অবধি কাটাতে পেরেছে, তার কারণ আর কিছু নয়। আবার জীবন-ধারণের আশা।

স্নান করে এসে, ফরসা ধুতি পরে মনটা অনেকখানি ভালো লাগে বিভাসের। ধুতির এক অংশ গায়ে জড়িয়ে বুনোর সঙ্গে খেতে গেল সে।

ভিতর-বাড়িটাও মস্ত বড়। পুরোনো বাড়িটাকেই নতুন করে মেরামত করা হয়েছে বলে মনে হয়। সেখানেও মস্ত বড় উঠোনটা ভরে ধান শুকোচ্ছে। দেখে মনে হয় এগুলি নতুন ধান। কয়েকটা কুকুর একপাশে শুয়ে আছে প্রায় গায়ে গায়ে। লোকজন দেখা যায় না। একপাশের লাল মেঝের বারান্দায় তারকেশ্বর আগেই বসেছেন খেতে। পাশেই ঠাঁই হয়েছে বিভাসের।

ভাত বেড়ে দিল যে, তার মুখের দিকে তাকিয়ে বিভাস বিভ্রান্ত হয়ে পড়ল। মনে হল, এই ঘোমটা-ঢাকা মুখটিই বোধহয় সে ঘাটে দেখে এসেছিল। তার-পরেই তার নজর পড়ে উঠোনের অপর প্রান্তে। বারান্দার রকে হেঁটে যাচ্ছে যেন সেই মেয়েটি, যে তাকে তুই-তোকারি করেছিল। এতক্ষণে মনে পড়ল তার। মেয়েটির মুখে কেন একটি চেনা ছাপ দেখেছিল সে। ছাপটা সুস্পষ্ট তারকেশ্বরবাবুর। কেবল চোখে তার যদিও পিঙ্গলের আভাস, কিন্তু যেন প্রায় আকর্ণবিস্তৃত।

তারকেশ্বর বললেন, যা লাগবে, চেয়ে নিও।

চেয়ে নিতে হয়নি। এত বেশি খেল যে, বাগানের ঘরে ফিরে যেতেও কষ্ট হল তার। রাত্রে আর খেতে পারেনি।

॥ তিন ॥

এক বছর পার হয়ে গেছে।

ইতিমধ্যে পুব ও পশ্চিম আঁচনা গ্রামে সকলের কাছে পরিচিত হয়ে গেছে বিভাস। একটু বেশি করে, বিশেষভাবেই পরিচিত হয়েছে। এ অঞ্চলের সবচেয়ে বড় ডাক্তার, ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের লোক সে। শুধু তাই নয়, বিভাসও অনুভব করে, তাকে না হলে কোনো কাজেই তারকেশ্বরের আর চলে না। ইউনিয়ন বোর্ডের চিঠিপত্র লেখা, জগত ও জীবন সম্পর্কে তাঁর বক্তৃতা শোনা। বক্তৃতা নয়, তারকেশ্বরের সেগুলি বিশ্বাস।

তারকেশ্বর একটি বিস্ময়। তাঁকে ঘিরে আছে এই বিস্ময়কর আঁচনা গ্রাম। একে একে তার এক-একটি বিস্ময়কর দরজা আপনা-আপনি খুলেছে।

একদিন যে তার মনে হয়েছিল, সবই যেন কেমন একটি অস্পষ্ট কুহকে ঢাকা পড়ে আছে, সেটা মিথ্যে নয়। সেই কুহকের কুয়াশা খুব ধীরে ধীরে বিভাসের চোখের সামনে নতুন দিগন্ত দিয়েছে খুলে।

এই চেহারা হয়তো বাঙলাদেশের অনেক গ্রামে আছে। কলকাতা থেকে দক্ষিণে মাইল বিশেকের মধ্যে বিভাসদের গ্রামেও হয়তো আছে। কিন্তু কোনদিন চেয়ে দেখেনি। আজ এই আঁচনার সঙ্গে তার জীবনের যোগাযোগ অনেক বেশি। বুঝি এত যোগাযোগ নিজের ঘরের সঙ্গেও ছিল না। এতখানি চেনাশোনাই হয়েছে।

তারকেশ্বরের যে বাগানটায় বিভাসের বাস, সেখানে থেকে গাছের ফাঁকে পুবে আঁচনার দিগন্ত দেখা যায়। একটা সুদীর্ঘ রাস্তা, খানিকটা উত্তরে বাঁক নিয়ে চলে গেছে দূর পুবে।

সেই পথ দিয়ে একদিন বিভাসের প্রথম বন্ধু ঈশান এসেছিল তার একতারাটা হাতে নিয়ে। চলে যাচ্ছিল তারকেশ্বরের বাড়ির চৌহদ্দী ঘেঁষে। বিভাসকে দেখে এক নজর তাকিয়ে বলেছিল, আপনাকে তো চিনতে পারলাম না।

ঈশান গান গাইতে গাইতে আসছিল, কিন্তু থেমে গেছে অনেক আগে। বিভাস নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, গানটা থামালেন যে?

বিভাসের গলায় একটু ভক্তির আভাস দেখে ঈশান দাঁড়িতে হাত বুলিয়ে আর একটু দেখল তার দিকে। তারপর নিচু গলায় বলল, এইখ্যানে গান গাইতে মানা আছে যে।

কার মানা?

ঈশান নিজের বুকের দিকে আঙুল দেখিয়ে বলল, এঁয়ার মানা। পাখি পাখালির গান শুইনেছেন কোনদিন এই বাগানে। নিদেন কাগের ডাক।

তা অবশ্য মনে নেই বিভাসের। নির্জন বাগানটি নিঃসাড়ে পড়ে থাকে, এই কথাই মনে হয়েছে বরাবর। পাখি কখনো কুজন করেছে কিনা, খেয়াল করেনি। বোধহয় নির্জনতার মধ্যেই ওটা পড়ে। বলল, মনে করতে পারছি নে তো।

ঈশান বলল, পারবেন কেমন করে। পাখি ওঁয়ার জীব, তার পরানে ভয় নাই? এইখ্যানে গান গাইতে মানা আছে।

ব্যাপারটি কেমন রহস্যাবৃত লেগেছিল। বিভাস বলল, কেন?

ঈশানের গোঁফদাড়ির মধ্যে একটি ভুবন বিজয়ী হাসি দেখা গেল। বলল, যে বনে ব্যাধ থাকে, পাখি সেইখানে যায় না। এ বাড়ির কাছে আসলে গলা আপনি বুজে আসেন, এর তো আর অন্য জবাব নেই বাবা।

তারপরে নিজের পরিচয় দিল ঈশান। ধর্মে সে বাউল, জাতিতেও তাই। এ গ্রাম এককালে বাউলদেরই ছিল। আঁচনপুর এর আসল নাম। সেটা ছিল

নরসিংহ বাউলের আমলে। তারপরে 'পুর' গেছে, 'অচেনা' বলতে বলতে এখন 'আঁচনা'য় দাঁড়িয়েছে। কিন্তু বাউল আর প্রায় নেই, দু-তিন ঘর আছে। তারা নামেই বাউল। চাষ-আবাদ করে। ঈশানের স্ত্রী-পুত্র সবই আছে। কিন্তু দিনে একবার টহল না দিলে মনটা নাকি বাঁধা-বাঁধা লাগে। বেরিয়ে পড়ে। দু-একদিন ফেরা হয় না। তবে ফিরতেই হয়, বাউল এখন সংসারী হয়েছে।

তারপরে ঈশান মুগ্ধ চোখে বিভাসের দিকে তাকিয়ে বলল, কিন্তু তুমি এখানে ঠাঁই পেলে কেমন কইরে গো দাদা। তোমাকে যে আলাদা মানুষ মনে হচ্ছে।

কেন?

তোমার চ'খ দুইখান কয়। বড় যে জ্বালা জ্বালা পোড়া পোড়া ভাব লাগে। এইখ্যানে তো তোমার বাস বেশিদিন থাকবে না।

দৈববাণীর মতো শোনাল ঈশানের কথা। পাগল কিনা, তা-ই বা কে জানে! পাগলের মতোই ঈশান হাত বাড়িয়ে বিভাসের থুতনি ধরে বলল, 'নিজেরে যে যায় না চেনা, তাই এসেছ অচিনপুরে'। জানা রইল, আসব তোমার কাছে।

তারপরে অনেকবার এসেছে ঈশান এক বছরে। একটি বিচিত্র সম্পর্কও যেন কবে কখন স্থাপিত হয়ে গেছে তার সঙ্গে বিভাসের। ঈশান না এলে তার মন খারাপ হয়।

মাঠ বেশি, মানুষ কম চোখে পড়ে এই আঁচনা গ্রামে। বোধহয় সেটা দূরে গ্রাম বলেই। তবু স্টেশন আছে, হাট আছে। বেশ বড় হাট। প্রতি শুক্রবার হাট বসে। ধান, আনাজ-তরকারি কিছু কম চালান যায় না বাইরে। গাই বলদও হাটের দিনে প্রচুর পাওয়া যায়। মেলাই আদিবাসী ক্ষেতমজুরে মেয়েপুরুষের ভিড় হয়। তাদের সংখ্যাই যেন এখানে বেশি বাঙালী চাষীর থেকে। হাটের দিনে সাময়িক চালাঘর বসে হাটের পিছনে। কোথা থেকে কিছু দেহোপজীবিনী মেয়েমানুষ আসে। পরদিন চলে যায়। পয়ারপুর থেকে নাকি আসে।

হাটের পরে আঁচনা ঝিমোয়। ডাকঘর আছে, মাধ্যমিক বিদ্যালয় আছে। বিভাস দেখেছে, স্কুলটাতে ছেলে প্রায় নেই। মাষ্টাররা অধিকাংশই নাকি বাইরে থেকে রোজ আসেন পড়াতে। স্কুলের মাঠে গোরু চরে। দরজা বন্ধ থাকে ক্লাসের। হেডমাষ্টারমশাই গ্রামের লোক। তিনি বলেন, ছেলে নেই এখানে, স্কুল চলে না। পড়বার মতো ছেলেরা পয়ারপুরের হাইস্কুলে যায়। ভদ্রলোকেরা শহরে গেছে জীবিকার সন্ধানে। সেখানে বাসা করে থাকে তারা। ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করে সেখানেই।

অথচ আঁচনা গ্রামেরই নাম বেশি চারিদিকে।

রাসুর সঙ্গে এখন প্রতিদিনই দেখা হয় বিভাসের। কথা হয় কম। সেই প্রথমদিন যে বিভাস ডাক্তারখানার পাশের ঘরে টাকা-পয়সার ঝনঝনানি শুনতে পেয়েছিল, সেটা এখন রোজই দেখে। তারকেশ্বরের তেজারতি-মহাজনী ঘর ওটা। ঋণ দেওয়া, সুদ কিস্তিবন্দীর কারবার রেখেছেন তারকেশ্বর। মহাজনী লাইসেন্স ছেলে তাপসের নামে। রাসু অর্থাৎ রাসবিহারীই সব দেখা-শোনা করে।

রাসু যেন পা টিপেটিপে চলে সব সময়। কথা বলে যেন অনেক ভেবে চিন্তে, আটঘাট বেঁধে। দ্বিতীয়বার যখন কথা বলেছিল রাসু জিজ্ঞেস করেছিল আবার, আই-এ পাশ করেছেন।

বিভাস অবাক হয়েছিল, কেন আপনার সন্দেহ হয়।

না। আচ্ছা আই-এ পাশ করতে শুভঙ্করী জানতে হয়।

হ্যাঁ, সে তো ছোটকালেই পাঠশালায় পড়েছি!

অ।

তারপরই চোখ পিটপিট করে।

ঈশানের কথা জিজ্ঞেস করেছিল একদিন রাসুকে, চেনেন?

হ্যাঁ। বলে রাসু অনেকক্ষণ দু'চোখ পিটপিট করেছিল তার দিকে তাকিয়ে। বলেছিল, কেন বলেন তো।

এমনি, আলাপ হল। আচ্ছা, তারকেশ্বরবাবুর বাড়ির কাছে এসে গান করে না কেন বলুন তো?

ডাক্তারবাবুর ভালো লাগে না ঈশান বাউলের গান। একদিন মার দিয়েছিলেন ঈশেনকে।

গানের জন্যে?

হ্যাঁ।

কেন?

রাসুর চোখ দুটি হঠাৎ স্থির হয়ে গিয়েছিল। বিভাস তাতে কম অবাক হয়নি। কী ব্যাপার! রাসুর চোখের পাতার শির ছিঁড়ে গেল নাকি। তারপরেই হঠাৎ গলা চড়িয়ে বলেছিল, জানি না। আচ্ছা, মাসে তেরো আনা করে সুদ হলে, সাতবছরের মধ্যে একবছর তিন মাসের শোধ হলে সুদের তস্য সুদ টাকা পিছু তিন আনা হলে পাঁচবছর ন মাসে সবশুদ্ধ কত টাকা হয় বলতে পারেন?

বিভাস বলেছিল, কাগজ-কলম না হলে চট করে বলা মুশকিল।

রাসুর চোখ পিটপিট করছিল আবার। অন্য দিকে মুখ করে তাকিয়ে দেখেছিল বিভাসকে। কিন্তু সেদিন আর কথা বলেনি।

কিন্তু মার দেওয়ার কথাটা ঈশানের কাছে সে তুলতে পারেনি। লজ্জা করেছে। তারপরে একদিন রাসুই আবার বলল, একদিন কর্তা বসেছিলেন

ডাক্তারখানায়। ঈশেন এসে গান ধরে দিল,

ওরে লুকিয়ে তুই ফিরবি কোথা
ঢাকাঢুকি দিবি কত
যিনি আছেন অন্তরেতে
তিনি যে সব দেখতে রত।

ব্যস, চেয়ার ছেড়ে উঠে এসে মারলেন ঈশেনকে কর্তা।

কেন?

বললেন, এখানে এসে কে গান গাইতে বলেছে। কিন্তু দেখবেন কাউকে বলবেন না যেন।

কী হবে বললে?

আমি এসব বলেছি জানলে, আঁচনা ছেড়ে চলে যেতে হবে।

কিন্তু সবাই তো জানে

আবার রাসুর পিটপিট করা চোখ স্থির হয়ে এল। সরু গলা মোটা করবার চেষ্টা করে বলল, জানা এক কথা, বলা আর এক কথা। বলে দেবেন কর্তাকে, না?

সেই প্রথম বিভাস অনুভব করল, সবচেয়ে ভয়ের মুহূর্তে রাসুর চোখের পাতা পড়ে না। আর মনে পড়ল, প্রথম যেদিন সে ঈশানের কথা জিজ্ঞেস করেছিল তার চোখ স্থির হয়ে গিয়েছিল। রাসুকে কথা দিল বিভাস কোনদিন কাউকে বলবে না। কিন্তু রাসু আপনা থেকে বললই বা কেন?

ঈশানের একটা কথা সত্যি। বাগানের ওই নির্জনে পাখি সত্যি যেন আসে না। কাক আসে কালেভদ্রে। বসন্তের প্রথমে বিদেশী কোকিলগুলি এসে কয়েকদিন ডাকে। তারপর বোধহয় কিছু একটা জানাজানি হয়ে যায় নিজেদের মধ্যে, তাই আর আসে না। ঠিক যেন আরব্য উপন্যাসের সেই দৈত্যের বাগানের মতো। যার ভয়ে, বাগানে পাখি পতঙ্গ, সকলের প্রবেশ নিষিদ্ধ।

এর দুটি কারণ অনুমান করেছে বিভাস। তারকেশ্বরের ঘরে যে বন্দুক আছে, এবং যেগুলি যে-কোন মুহূর্তেই আগুন ছিটিয়ে দিতে পারে, এটা জানে বোধহয় কাক-পক্ষীও। দু-তিনদিন চমকে উঠেছিল বিভাসও, আচমকা বন্দুকের শব্দে। তারকেশ্বর অবশ্য কোকিলের পিছনে ফেরেন না। হয়তো সহসা হরিয়াল এসে পড়ে না-জেনে কিংবা অন্য কোনো পাখি। প্রথম দিন যে বিভাস পায়রা দেখেনি, তাও বোধহয় এই কারণে। আর এক কারণ হতে পারে, জাম গাছের সাপটা। তাকে দেখেছে বিভাস। কালো সাপটার গায়ে সাদা সাদা তারা, হাত দেড়েক লম্বা, চওড়ায় আধ ফুটের কম নয়। শুনেছে, সাপের আস্তানা টের পেলে পাখি সেখানে আসে না। তা সে তক্ষক বুড়োই হোক আর আয়েসী-ই হোক।

কিন্তু গানের অপরাধ ? হয়তো মন খারাপ ছিল তারকেশ্বরের। কঠিন রুগীর ভাবনা ছিল মনে, হাতের রুগী মরেছিল হয়তো কেউ। আর ঈশানেরা শুধু আপন মনে গান গেয়ে যায়। মানুষের দিকে ফিরে তাকায় না। নইলে আর কি হতে পারে। রাসু তাকে গানের কথাগুলিও বলেছিল ;

ওরে লুকিয়ে তুই ফিরবি কোথা
ঢাকাঢুকি দিবি কত ?
যিনি আছেন অন্তরেতে-
তিনি যে সব দেখতে রত।

রাসু এমন করে বলেছিল, বিভাসের মনটা চমকে উঠেছিল কি রকম। যেন রাসু তাকে বলছে। কিন্তু কি লুকিয়ে ফিরছিল বিভাস। রাসু কি মনে করছিল, বিভাস আই-এ পাশের চিঠি যখন আনেনি, তখন সে নিশ্চয়ই পাশ করেনি ? কিংবা বিদ্যুতকে দেখলে, তার কথা শুনলে ছোটবউদির কথা মনে পড়ে যায়, পদ্ম বাঁকা চোখে হাসে, অকারণ বাগানের ঘরে এসে উঁকিঝুঁকি মেরে যায়, এসব কথা জানে রাসু ?

কিন্তু সেসব কিছুই নয়। তারকেশ্বরের বাড়িতে খুব কমই যায় রাসু। তাপসের বউ বিদ্যুৎ। তারকেশ্বরের মেয়ে পদ্মর সঙ্গে বিভাসের আদৌ পরিচয় আছে কিনা, সেটাই রাসু জানে না।

কিন্তু ঈশানের গান শুনে কি এমনি করেই তারকেশ্বরের মনের মধ্যে চমকে উঠেছিল ? রাগ হয়েছিল তাই ?

কিন্তু তারকেশ্বর যখন ডাক্তারি করেন, তখনও যেমন তাঁর মুখের ভাঁজ-গুলি কঠিন হয়ে থাকে, শিকারে গেলেও তেমনি। কেবল পিঙ্গল চোখ-দুটি জ্বলে একটু বেশি। তার কারণ, সেদিন তারকেশ্বর মদ খান। বোতল যখন ফুরিয়ে যায়, তখন বুনো আশেপাশে কোথা থেকে কলসিতে করে তালের রস নিয়ে আসে। তারকেশ্বর তাই খান।

দেখে মনে তো হয় না যে তারকেশ্বর তাঁর কোনো কাজ লুকিয়ে করেন কিংবা কোনো কিছুতে ভয় আছে।

প্রথম যেদিন ডাক পড়ল শিকারে যাওয়ার, সেদিন ঘাবড়ে গিয়েছিল বিভাস। তারকেশ্বর বললেন, একটা চাদর নিয়ে নিও, নইলে শীত করবে।

কিন্তু বাঘে খায় কি ভাল্লুকে খায়, তার ঠিক নেই, চাদরটা নিয়ে যায় কেমন করে বিভাস! দুপুরের দিকে সেদিন আরো কয়েকজন আদিবাসী এসে জুটল। বাইরের ঘরে উঠোনে কালো কালো মানুষগুলি তীরধনুক আর টাঙি নিয়ে জটলা পাকাতে লাগল। বুনো তাদের সঙ্গে কথা বলল মাতৃভাষায়।

তারকেশ্বরের সঙ্গে হাঁটা কঠিন। মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে শার্টকোট পরে তারকেশ্বর অসুরের মতো চললেন পৌষের ঢ্যালা-ছড়ানো মাঠ ভেঙে ঃ

প্রায় আট মাইল দূরে কেউটে বিল।

আদিবাসীরা মাঠের চারপাশে ছড়িয়ে চলেছে। সেই এগারটি কুকুর কখনো পেছিয়ে পড়ছিল, এগিয়ে চলছিল কখনো। একসঙ্গে সবাই ডেকে উঠে পৌষের রিক্ত মাঠের বিকেলটাকে তুলছিল সচকিত করে। কুকুরের ডাক বন্ধ হলেই শোনা যাচ্ছিল ঝিঁঝিঁর ডাক। যদিও তখনো দিনের বেলা। ঝিঁঝিঁ না ডাকলে নৈঃশব্দ্যকে টের পাওয়া যায় না। তাই তারা সব সময় ডাকে। মানুষের কোলাহলের জন্য লোকালয়ে দিনের বেলা চাপা পড়ে থাকে তাদের ডাক।

বুনোকে একবার জিজ্ঞেস করল বিভাস, নামটা কেউটে বিল কেন?

বুনো বলল, কালিনী কুচকুচে জল কেউটা সাপের মতন। বড় নদীর জল যখন এইসে মেশে বর্ষাকালে, তখন মনে হয়, জল যেন সাপের মতন পাক দিয়া দিয়া চলছে। পিতি সালে দু-চারটে মানুষ কেউটাবিলের পেটে যায়।

জিজ্ঞেস করাই বোধহয় অন্যায় হয়েছে বিভাসের। বুনো একটু ভালো-ভাবে বলতে পারত না কথাটা। আবার হাত তুলে সাপের ফণার ভঙ্গি করে বলল, এ-সবও খুব আছে।

অর্থাৎ সাপ। বুনো বলল, কেউটে সাপ আছে। চোখে পড়তে পারে।

কিন্তু তারকেশ্বর কোনো কথাই শুনবেন না। না এসে উপায় কি বিভাসের। এরকম একটা ব্যাপার তার জীবনে এই প্রথম। আনন্দ হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু সব বিষয়ে সব মানুষের আনন্দ হয় না।

বিলের প্রান্তে এসে যখন পৌঁছনো গেল তখন পৌষের বেলা গেছে। আশেপাশে ছোটখাটো দু-একটা গ্রাম থেকে শাঁখের ক্ষীণ শব্দ শোনা গেল। আকাশে সরু একফালি চাঁদ দেখা দিয়েছে। টর্চলাইট, হ্যারিকেন, শতরঞ্চি, আটার রুটি, মাংস আর জল আনা হয়েছে।

তারকেশ্বরের বাড়িতে ব্যাপারটা যেন এমন কিছু নয়। এ আসার জন্যে কোনো রকম আলাদা হাঁকডাক চিৎকার হয়নি। ছুটোছুটি করতে হয়নি। অন্তত টের পায়নি বিভাস। বিকালে ডাক্তারখানায় না গিয়ে কেউটে বিলে আসা, এইটুকুনি যা তফাত।

কিন্তু বিল কোথায়? ধু ধু করছে মাঠ। দূর্বা ঘাসও হয়েছিল বোঝা যায়। ধান কেটে নিয়ে গেছে। এখানে সেখানে কাঁকড়ার খোলস। ভিতরে মাংস নেই। শামুকের খোলও দেখা যায়। একটা গোরুর কঙ্কাল চোখে পড়ল একজায়গায়। মাছ ধরার ঘুনি কবে পাতা হয়েছিল, তোলা হয়নি। বেঁকে দুমড়ে আছে একজায়গায়। কয়েকটি ঘুনি আর একটা ছোট জলা নয়ানজুলির মুখে।

বিল কোথায়! বিলের জল আরো দেড় মাইল দূরে। তার কাছাকাছি যেতে হবে। কী ভয়াবহ বাতিক মানুষের।

দু-একটা গাঙচিল, হিজল গাছ দেখা যায় দূরে দূরে। একা একা দাঁড়িয়ে আছে এখানে সেখানে। জানা-অজানা নানান ছোট-ছোট গাছে এই স্তব্ধ প্রেত প্রান্তর ছেয়ে আছে। বিলের কাছে গাছ আর একটু বেশি দেখা যায়। নরম বোধহয় মাটি। পাখি উড়ে গেল মাথার ওপর দিয়ে এক ঝাঁক।

তারকেশ্বর চোখ তুলে দেখলেন। আর মাঝে মাঝে কুকুরগুলি ডাকছে। কিন্তু ঠিক ডাকছেন না যেন। কুকুরগুলি তাকায়, আর আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়তে থাকে। মনে হয়, প্রায় একমাইল জায়গা ঘিরে ছড়িয়ে পড়েছে কুকুরগুলি।

আদিবাসীগুলিও ছড়িয়ে পড়ে এদিক ওদিকে। তারকেশ্বর বললেন বিভাসকে, তুমি আমার কাছে কাছে থাক। হরিয়ালের ঝাঁকটা কেমন মাথার ওপর দিয়ে উড়ে চলে গেল দেখেছ ?

জবাবের প্রত্যাশা না করে, ইতালিয়ান সাইডহ্যামার বারো বোরের বন্দুকটা তুলে নিলেন। ব্যারেল-লক খুলে দেখে নিলেন একবার এক চোখ লাগিয়ে। গুলি ভরলেন চেম্বারে।

হঠাৎ হাত কুড়ি দূরেই বড়বড় ঘাস কেঁপে উঠল। কাঁপুনিটা একটি রেখা ধরে দূরে মিলিয়ে গেল তীরের মতো।

বিভাস চমকে উঠেছিল। তারকেশ্বর বললেন, খরা।

অর্থাৎ খরগোস। বিভাস ভেবেছিল, এখুনি তারকেশ্বর তাগ্‌ করবেন। কিন্তু হাসলেন একটু। জিজ্ঞেস করলেন, খরার মাংস খেয়েছ কখনো।

বিভাস অবাক হয়ে বলল, ভদ্রলোকে খায় ?

তারকেশ্বরের ভ্রূ কুঁচকে উঠল। বললেন, মানে ?

কথাটা বোধহয় ঠিক হয়নি বলা। বিভাস বলল, না, মানে, খাওয়া যায় ?

তারকেশ্বর বুনোকে ডেকে বললেন, একটা খরা মারা যায় কিনা দেখিস তো, একে খাওয়াতে হবে।

একটি গাছতলায় সব রেখে তারকেশ্বর ডাকলেন বিভাসকে, এস আমার সঙ্গে। একটু নজর রেখে কানখাড়া করে এস। অবশ্য এখন ঠাণ্ডা পড়েছে, বিশেষ ভয় নেই।

কিসের ভয় ?

সাপের।

শীতটা যেন একটু বেশি লাগে বিভাসের।

রাত নেমে এসেছে বিলের প্রান্তরে। অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় প্রেতিনী কুহক ছড়িয়ে পড়েছে সর্বত্র। আকাশে আস্তরণ পড়েছে কুয়াশার।

তারকেশ্বর শিস্‌ দিলেন খুব আস্তে। তারপরে জোরে। অদূরেই একটা চাপা ক্রুদ্ধ গর্‌গর্‌ শব্দ শোনা গেল। যেন কুকুরটা কি বলছে।

বিভাস বলল, আচ্ছা, বাঘ আছে এখানে ?

তারকেশ্বর বললেন, কম। বিলের ওপারে অবশ্য চিতাবাঘ দেখা যায় প্রায়ই। বর্ষাকালে সুন্দরবনের দু' একটা বাঘ ছিটকে আসে।

বিভাস বলল, রয়েল বেঙ্গল?

তারকেশ্বর বললেন, হ্যাঁ। তোমাদের দেশেরই জানোয়ার। এ দিকে এলেই তারা মানুষ খেকো হয়ে ওঠে।

একটা শ্লেষ ঝিলিক দিয়ে উঠল তারকেশ্বরের ঠোঁটে। বললেন, আমাদের এলাকায় ঢুকে, এ পর্যন্ত একটিও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারেনি।

বলে বিভাসের দিকে তাকালেন। অস্বস্তি বোধ করল বিভাস। তারকেশ্বরের চাউনিতে যেন একটা ইঙ্গিত রয়েছে। কেন? বিভাস কি মানুষখেকো রয়েল বেঙ্গল টাইগার যে, সেও প্রাণ নিয়ে ফিরতে পারবে না।

কোথায় চলেছেন তারকেশ্বর কে জানে। বিভাসও তার স্যাণ্ডেল হেঁচড়ে হেঁচড়ে চলেছে। তারকেশ্বরের নিঃশ্বাসে মদের গন্ধ। অস্পষ্ট আলোয় মুখখানি আরো বড় আর জ্বলজ্বলে দেখাচ্ছে। শক্ত খুলির নীচে পিঙ্গল চোখ দুটি জ্বলছে যেন ধকধকিয়ে। বিভাসকে যদি গলা টিপে ধরে মেরে ফেলেন, কারুর কিছু বলবার নেই। গোরুর কঙ্কালটার মতো পড়ে থাকবে সে বিলের মাঠে। কিন্তু মারবেন কেন, আর এ সব কথা মনেই বা কেন আসে?

কিন্তু মনে হয় মানুষ যখন খুন করে, তখন ঠিক তারকেশ্বরের মতোই বোধহয় দেখায় তাকে। ডাক্তারের হাতের সর্পিল রগগুলি মোটা হয়ে ফুটে উঠেছে।

হঠাৎ একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল দক্ষিণ থেকে। তারকেশ্বর ফিরে তাকালেন সেদিকে। কাঁধে ঝোলান ছ-ব্যাটারির টর্চ লাইটটা তাঁর আঙ্গুলের চাপে চকিতে আলোয় ঝল্‌কে দিল মাঠে একটা দিগন্ত।

কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করতে করতে ছুটেছে।

হঠাৎ একটা গলা শোনা গেল কাছ থেকেই, গরর…র-র…।

ডাকটা থেমে গেল কুকুরের। তারকেশ্বর গলা তুলে বললেন, কী?

কাছের আশস্যাওড়া ঝোপ থেকেই জবাব এল, খরা।

সবাই আছে আশেপাশে, দেখতেও পায় হয়তো, শুধু বিভাস কিছুই দেখতে পায় না। কেবল এই শীতার্ত ঘাপটি-মারা ঘাস, মাঠ আর তারই নিশিতে পাওয়া তারকেশ্বর তার চোখের সামনে।

আবার চলতে লাগলেন তারকেশ্বর। পা-দুটো কালিয়ে গেছে বিভাসের। হাতদুটি কিছুতেই বাইরে রাখা যাচ্ছে না। কিন্তু পকেটে পোরাও দুষ্কর। পকেটে হাত রেখে অসমান মাটিতে টাল সামলে চলা যায় না।

তারকেশ্বর চাপা গলায় ফুঁসে উঠলেন, ভীতু জানোয়ার।

বিভাস চমকে উঠে বলল, আজ্ঞে?

দাঁতালের কথা বলছি। ভীরু জানোয়ার। মনে করেছে, চিরদিন পালিয়ে থাকতে পারবে।

দাঁতাল শুয়োর খোঁজা হচ্ছে, বুঝতে পারে বিভাস।

কতক্ষণ এরকম ঘুরছে খেয়াল নেই বিভাসের। নির্জনতার এই বিচিত্র নিশির নেশা কখন তাকেও পেয়েছে একটু একটু করে। সেও অনুভব করছে, কারা সব ঘুরছে তাদের আশেপাশে, নিঃসাড়ে বুক চেপে চেপে।

আবার একটা কুকুর ঘেউ ঘেউ করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা। তারপরে প্রায় সব কুকুরগুলিই এক জায়গায় থেকে ডেকে উঠল যেন। কুকুরগুলির ঘেউ ঘেউ ভেদ করে, একটা ভয়ংকর কর্কশ তীক্ষ্ণ চিৎকার এল ভেসে।

তারকেশ্বর চিৎকার করে উঠলেন, হেই, হেইরে।

জবাব এল, হাঁ হাঁ বাবু।

টর্চ লাইট ঝলকে উঠল তাঁর হাতে। সেই আলোয় বিভাস দেখল, কুকুরগুলির ডাক লক্ষ্য করে আদিবাসী মানুষগুলি ছুটছে। হাতে তাদের উদ্যত তীরধনুক ও টাঙি।

হঠাৎ একটা কুকুর কেঁউ কেঁউ করে কেঁদে উঠল। তারকেশ্বর সাইড্-হ্যামারটা তুলে দাঁতে দাঁত ঘষে বললেন, মেরে ফেললে কুকুরটাকে।

মেরে ফেলল? বিভাসের মনে হল, একটা অশরীরী কিছু যেন ঘিরে আসছে চারদিক থেকে। কিন্তু তার গলায় কোনো স্বর নেই।

কুকুরের ডাক ছাপিয়ে তখনো সেই আকাশ ফাটা, প্রান্তর-ছেঁড়া আঁ-আঁ চিৎকারটা ভেসে আসছে। আর আসছে যেন এ দিকেই। আদিবাসীদের ভাষা বোঝে না সে। তারাও যেন কী বলছে চিৎকার করে।

তারকেশ্বরের চোখ জ্বলছে জ্বলন্ত অঙ্গারের মতো। কেবলি ফিস্‌ফিস্ করে বলছেন, হ্যাঁ, ঠিক আছে। ঠিক আছে।

পরমুহূর্তেই বিভাসের চোখে পড়ল, কতকগুলি কালো কালো কী সব ছুটে আসছে ঘাস জঙ্গল দাপিয়ে মাড়িয়ে। কুকুরগুলি গোল হয়ে ঘিরে আসছে ঘেউ ঘেউ করতে করতে। তাদের ঘেরাওয়ের মাঝখানে তারকেশ্বরের আলো পড়ল। বিভাস দেখল, মস্তবড় একটা শুয়োর। দাঁতাল শুয়োর, একরোখা, সোজা তীরবেগে ছুটেছে চিৎকার করে।

তারকেশ্বর চিৎকার করে বললেন, পারবি?

হ্যাঁ।

বিভাসের চোখে পড়ল, একটু দূরেই অন্ধকার থেকে একটি মূর্তি যেন ঘাস ফুঁড়ে উঠল টাঙি হাতে। শুয়োরটা হঠাৎ একটু বাঁক নিয়ে লোকটার দিকে অগ্রসর হল। ছুঁচলো মুখ ছাড়িয়ে তার বাঁকা সুতীক্ষ্ম দাঁত দুটি বর্শার মতো আগে আগে চলেছে যেন।

মুহূর্তে কী ঘটে গেল। বিভাসের চোখে পড়ল টাঙিটা আঘাত করল শুয়োরটাকে। আবার তীক্ষ্ম চিৎকার। টাঙির আঘাত ঠিক মতো লাগেনি। নিমেষে তারকেশ্বরের হাতের সাইডহ্যামার গর্জে উঠল।

বিভাস পরিষ্কার দেখল, কুকুরগুলি লহমায় একজায়গায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। তারকেশ্বর চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, কাউকে মেরেছে নাকি রে?

জবাব এল, না।

তারপরেই একটা সমবেত উল্লসিত চিৎকার উঠল শুয়োরটার চেয়েও তীব্র গলায়। তারকেশ্বর বললেন, মারা পড়েছে ব্যাটা।

ফিরে আসার পর দুদিন শুধু সেই শুয়োরের চিৎকারটাই কানে ভেসেছে বিভাসের।

বিভাস কী লুকিয়ে ফিরবে। তারকেশ্বরের কাছে যখন তার লুকিয়ে ফেরার কিছু নেই, তখন তার ভয়েরও কিছু নেই। তার ভর কিসের! কিন্তু ঈশানের গান শুনে কেন ক্ষিপ্ত হয়েছিলেন তারকেশ্বর?

বিদ্যুৎ কিংবা পদ্মর যে গুপ্ত চিন্তাটা মনের কোণায় লুকিয়ে ছিল বিভাসের, তারকেশ্বরেব নিশ্চয়ই সে রকম কিছু নেই। তবে! ঈশান মিটি-মিটি হেসে গায়—

মন আছে তোর মনের ভিতরে
তারে একবার দেখ নেড়েচেড়ে।

ঈশানের চোখে হাসি, দাড়ির ভাঁজেও যেন একটি চাপা হাসি লুকিয়ে ফেরে। ঈশান গেয়েই খালাস, 'মন আছে তোর মনের ভিতরে।'

বিভাস জিজ্ঞেস করে, সেটা আবার কেমন? মন আবার মনের ভিতরে থাকে কেমন করে?

ঈশান বাউল, কিন্তু হা-হা করে হাসে না। বিভাসের কথা শুনে, তার দাড়ির ফাঁকে ফাঁকে টুনটুনির লুকোচুরির মতো হাসি একটু বেশি খেলা করে। বলে, ঠাওর করতে পারলে না, না? কথা হল, মন কারে আশ্রয় করে আছেন, সেইটে একবার দেখা। এই দেহ, মানুষের এই দেহ কারে আশ্রয় কইরে আছেন?

বলে, যেন কতো না আদর ও সোহাগ ভরে, মাটিতে হাত বুলিয়ে বলে, এনাকে। ধরিত্রীকে আশ্রয় করে আছেন দেহ, দেহকে ধারণ করে আছেন উনি। সড়ক আছে তোমার সামনে, তোমাকে চলতে হবে। তেমনি মনেরও আশ্রয় আছে যে। তারো সড়ক আছে। সে সড়ক ধরে সবাইকে চলতে হয়। মনের সেই আশ্রয় হলেন মনের ভিতর। তানারে একবারটি খুঁজে পেতে নেড়ে চেড়ে দেখতে হবে না?

বিভাস বোকার মতো চেয়ে থাকে ঈশানের মুখের দিকে। যেমন ঈশানের গান, তেমনি তার ব্যাখ্যা। বিভাসের বোকা মুখের চিবুকটা নেড়ে দিয়ে

সস্নেহে হেসে ঈশান চলে যায়।

নানান ধর্মতত্ত্বের সম্মোহনে মানুষ কত কী আবোলতাবোল কথা বলে। তাছাড়া রাস্তার ভিখিরির মুখে ওরকম অনেক কথা বিভাস শুনেছে। সে জানতো ও সব ভিক্ষে চাওয়ারই ছলাকলা। তার চিরকাল লজ্জাই করেছে ওসব কথা শুনে। সে লজ্জাবোধের জন্য দশজনের সামনে মরতেও তার মরমে লেগেছিল। তাদের গাঁয়েও এ রকম মানুষ দেখেছে বিভাস। চণ্ডীর দোকানে সেই ন্যালাপাংলা বোষ্টম লোকটা আসতো। চলতে ফিরতে পারতো না। বসে বসে এমন সব তত্ত্ব আওড়াতে লাগত যেন জগতের আদি-অন্ত জানতে তার বাকী নেই। ভিক্ষে তার জুটত সামান্যই। দু এক ছিলিম তামাক, তাও হুঁকো বাদ, শুধু কলকে, আর দু'চারটি বিড়ি। লোকটার কথা শুনলেই ভীষণ লজ্জা করতো বিভাসের। তাকে পালাতে হত। কীর্তন গান শোনার সাধ থাকা সত্ত্বেও কোনদিন শুনতে পারেনি বিভাস। গায়কের রকম-সকম দেখে লজ্জায় যেন মাটিতে মিশিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। মনে হয়, আসরের সব মানুষ বুঝি তাকেই দেখছে। কিংবা গান গাইতে গাইতে কেউ কাঁদলেও বিভাসের লজ্জা করে। গান ছাড়া, প্রিয়জনের শোকে যখন কেউ কথা বলে বলে কাঁদে, শুনতে ভীষণ অস্বস্তি হয়। কোনো কোনো সময় কাউকে খুব বেশি রাগারাগি করতে দেখলেও বিভাসের লজ্জা করে। দাদাদের ব্যবহারে তার রাগ হয়েছিল, ঘৃণা হয়েছিল। কিন্তু তার চেয়ে লজ্জা হয়েছিল অপরিসীম। এর চেয়েও বড় কথা, তার বাবা যে বজ্রাঘাতে মরেছিলেন, তাতেও যেন কোথাও একটু লজ্জার স্পর্শ লেগেছিল তার মনে।

রাগ-শোক-ভক্তি-প্রেম, এসব প্রকাশের কোনো অঙ্গ ভঙ্গি শব্দ থাকতে পারে বলে, বিভাস জানে না। আর কী ভাবে প্রকাশ করতে হয়, তাও সে জানে না। সে স্মরণ করতে পারে না, এসব ভাব তার মধ্যে কখনো উদয় হয়েছে কি না। হয়ে থাকলে, সে কেমন করে প্রকাশ করেছে, তার জানা নেই।

ঈশানের প্রথম দিনের ব্যবহারে তার যে লজ্জা না করেছিল তা নয়। কিন্তু তারকেশ্বরের ওই নিঝুম বাগানে, অচেনা আঁচনায়, কেমন যেন পাগল-পাগল ভাব থাকা সত্ত্বেও ঈশানকে ভাল লেগে গিয়েছিল।

কিন্তু ঈশানের ওই 'মনের ভিতরে মন' থাকার তত্ত্বকে পাগলামি ভেবে উড়িয়ে দিতে গিয়েও মনের কোথায় একটি অস্বস্তির ছোট কাঁটা ঈশানের মিটিমিটি হাসির মতো খচ-খচ করে। যাত্রা দেখতে গিয়ে চিরকালই বিভাসের মনে হয়েছে, 'বিবেক' লোকটা নির্ঘাত গোয়েন্দা। নইলে কোন রাজা পাপ করেছে, কোন মহারাজ পুণ্য করেছে, সে-কথা সে গান গেয়ে বলে যায় কেমন করে। ঈশানেরও মিষ্টি-মিষ্টি হাসি-হাসি রসানো কথার মধ্যে গোয়েন্দাগিরি ফুটে ওঠে যেন। ভাবখানা, ওরে আমি তোর সব জানি।

বিভাস রাগ করতে চায়। পারে না।

পদ্ম আর বিদ্যুতের কথা বলে নাকি ঈশান ! ওই দুটি মাত্র মেয়েমানুষের সঙ্গে তার কী যেন কী এক খেলা জমে উঠেছে, যার কোনো কৈফিয়ত কেউ চাইলে কোনদিন কিছু বলতে পারবে না বিভাস। বাড়িতে যেমন ছোটবউদি ছিল, সেইরকম। ছোটবউদি, বউদি ছাড়া আরো কিছু ছিল, সেটা তার ব্যবহারেই প্রকাশ পেতো। সেটা কী, বিভাস বলতে পারবে না। কিন্তু সেটা ঘর, এখানে সবাই তার পর। বাংলা দেশের ছেলে সে। একটি মেয়ে আর একটি বউ—নীরবে হোক সরবে হোক, কেন হাসে তার দিকে চেয়ে, ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে কিংবা খুনসুটি করে, এর কোনো কৈফিয়ত নেই, জানে বিভাস। জানে, পদ্ম কেন বাগানে আসে, জানালায় উঁকি মারে, হাসে খিলখিল করে, সেটা লোকের না জানাই ভালো। তা এসব তার নিজের ভালো লাগুক আর না-ই লাগুক, এই 'না-জানা ভালো'র সিদ্ধান্ত থেকেই ঈশানের মনের ভিতরে মনের তত্ত্বে সে বোকা হয়ে যায়। চোখ পিটপিট করা অভ্যাস থাকলে হয়তো রাসুর মতো তারো চোখের পাতা স্থির হয়ে যেতো।

তারকেশ্বর এক বিস্ময়। গোটা আঁচনার মধ্যেও বিস্ময়ের একটি প্রচ্ছন্ন জাল যেন ছড়িয়ে আছে। তেমনি বিদ্যুৎ-পদ্মও বিস্ময়।

সেই প্রথম দিন পুকুরে দেখা হওয়া ও 'মুখপোড়া' বলা দিয়েই খেলাটা বোধহয় শুরু হয়েছিল। তার কয়েক দিন পরে, সকাল বেলা পদ্ম আর বিদ্যুৎ দুজনেই এসেছিল বাগানের ঘরের সামনে। বাইরে থেকে একটি ধোয়া ধুতি তক্তপোষের উপর ছুড়ে দিয়ে বলেছিল বিদ্যুৎ, এই কাপড়টা পরবেন আজ। ময়লা দুটো বুনোকে দিয়ে বাড়িতে পাঠিয়ে দেবেন।

বিভাস সসম্ভ্রমে দাঁড়িয়ে উঠে বলেছিল, ও, আচ্ছা।

পদ্ম ক'দিন বিভাসকে দেখেও বোধহয় ঠিক আন্দাজ করতে পারেনি, তাই চাপা গলায় বলে উঠেছিল, ওমা ! কী ঢ্যাঙা ভাই বউদি।

বিভাস বিব্রত হয়ে চোখ নামিয়েছিল। শুনতে পেয়েছিল, পুকুর ঘাটের দিকে যেতে যেতে বিদ্যুৎ চাপা গলায় বলে উঠেছিল, চুপ কর, শুনতে পাবে যে।

তারপর দুজনেই বোধহয় হেসেছিল। হাসিটা সেই যে সুরু হয়েছিল, আর কোনদিন থামেনি।

মাঝে মাঝে দুপুরে তারকেশ্বর দূর গাঁয়ে চলে যান রুগী দেখতে। তখন বিভাসকে একলা ফিরে এসে স্নান করে খেতে বসতে হয়। যেদিন একলা পড়ে যায়, সেদিন সামনে পিছনে একটি আড়ষ্টতা বোধ করে। বিদ্যুৎ ভাত বেড়ে দিয়ে সামনে দাঁড়িয়ে থাকে। পদ্ম দাঁড়িয়ে থাকে পিছনের ঘরের দরজার উপরে। পাতের ভাত ফুরিয়ে গেলে বিদ্যুতের দিকে মুখ তুলে তাকায়। তারকেশ্বর থাকলে তাকাতে হয় না। আড়াল থেকে বিদ্যুৎ নজর রাখে, ঠিক সময়ে ভাত দিয়ে যায়। না থাকলে তাকাতে হয়।

বিদ্যুৎ বলে, ভাত চাই ?

চাকরির চুক্তি অনুযায়ী পেট-ভর্তি প্রাপ্য ভাত চাইতে লজ্জা হওয়ার কথা নয়। তা ছাড়া, পেট ভরে ভালো করে খেতে ভালোবাসে বিভাস। তবু বিদ্যুতের জিজ্ঞাসার ঢঙ-এর জন্যই কি না কে জানে, বিভাসের মনে হয়, সে যেন উপরি চাইছে। সসঙ্কোচে বলে, হ্যাঁ।

বিদ্যুতের চোখে বিদ্যুৎ চিক-চিক করে। অভ্যাসমতো ঠোঁট দুটি একটু টিপে রেখে বলে, মুখ ফুটে বলতে পারেন না?

কথার সুরটুকু কেমন চেনা-চেনা লাগে যেন। বিভাস বলে, আপনি সামনে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাই আর…।

তখন পেছনে হয়তো পদ্মর চুড়ির শব্দ বাজে তার দুষ্ট হাসির মতো। নয় তো হাসিই শোনা যায় অস্পষ্টভাবে। বিদ্যুৎ বলে, আমি বুঝি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে আপনার খাওয়া দেখছি।

দেখে বলেই বিভাস জানে। কিন্তু ওভাবে বললে, সত্য কথা জাহির করার আর কোনো উপায় থাকে না। তখন ত্রুটি সংশোধনের ভঙ্গিতে বলে বিভাস, ভাত দিন আমাকে।

বিভাসের মনে হয়, বিদ্যুৎ হাসি চেপে ভাত আনতে চলে যায়। তখন হয়তো পদ্ম জিজ্ঞেস করে, কটা ইন্‌জেকশন করলেন আজ?

ইন্‌জেকশন করতে শিখিয়েছেন তাকে তারকেশ্বর। আর যে আজকাল ইন্‌জেকশন দিয়ে থাকে রুগীদের, সে খবরটা এ বাড়ির সকলেরই জানা আছে। থালায় দাগ কাটতে কাটতে জবাব দেয় বিভাস। ছুঁচ ভেঙেছে কি না, পদ্মর এই বিদ্রূপাত্মক প্রশ্নের জবাব দিতে হয়, না, ভাঙেনি। হাত কাঁপেনি। রুগীর লাগেনি।

বিদ্যুৎ ভাত নিয়ে আসে। যদৃচ্ছা বেশি করে ঢেলে দিয়ে ধমক দিয়ে খাওয়ায়। যখন সত্যি আর খেতে পারে না, তখন বিভাস বলে, আমার কষ্ট হচ্ছে।

খাওয়া পাতে ভাত দেখলে বিভাসের গা ঘিনঘিন করে। মনে হয়, কোনো রুগী পথ্য করতে বসে, না খেতে পেরে উঠে গেছে। থালা পরিষ্কার করে না খেলে নিজেরো তার খাওয়ার তৃপ্তি হয় না। কিন্তু থালা চেটে পুটে খেতেও তার লজ্জা করে। সবাই না জানি কী ভাবে। বেশি ভালো করে খাওয়া সকলের কাছে ভালো নয়।

সে যখন সত্যি আর খেতে পারে না, তখন বিদ্যুৎ জোর করে না আর।

তারকেশ্বর থাকলে টের পাওয়া যায় না, বিদ্যুৎ ও পদ্মর সঙ্গে আদপেই বিভাসের কোনো কথাবার্তা হয় কি না।

এই ভাবে এক বছরের মধ্যে তাদের তিনজনের একটি সম্পর্ক দাঁড়িয়ে গেছে। কী সম্পর্ক, জিজ্ঞাসা করলে কিছু বলা যাবে না। যেন পদ্ম ও বিদ্যুতের একজন বিভাসের প্রয়োজন ছিল। দু-জনে তারা যে-সব কথা বলে,

হাসে, ধমকায়, বাগানে আসে, যেন এ সব-ই জমা হয়ে ছিল। বিভাস আসতেই সে সব খরচ হতে আরম্ভ করেছে। কোথাও কোনো অস্বাভাবিকতা নেই। শুধু চতুর্থ কোনো মানুষ এই তিনজনের মধ্যে এলেই, ত্রয়ীর এ চক্র নীরব হয়ে যায়। তাকাতে, হাসতে, ধমকাতে ভুলে যায়। তারকেশ্বর থাকলে নিজেই বিভাসের থালার দিকে তাকিয়ে তদারকী করেন, বউমা, বিভাসকে আর চাট্টি ভাত দাও। তখন টেরও পাওয়া যায় না, বিদ্যুৎ পদ্ম কোথায় আছে। অথচ বিদ্যুৎ পদ্ম থাকে, এটা সে অনুভব করে।

বিভাসও তাতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। খেলাটি যে-খেলা-ই হোক, তার ত্রিভুজের আঙিনায় ধরা পড়েছে সে।

আর ধরা পড়েছে বিভাসের চোখে, বিদ্যুতের বিস্ময়কর ব্যক্তিত্ব। সে বাক্‌পটিয়সী, কর্মনিপুণা, বুদ্ধিমতী। কিন্তু এ সবের আড়ালে কোথায় যেন একটি অসহায় ভয়; একটা চাপা ব্যথা তাকে সহজ করে রেখেছে।

পদ্মর কথার কোনো ধারণ-ধরন নেই। ইচ্ছে করলে ভেঙচাতেও পারে। হাত দুটি তার যে ভাবে নড়া-চড়া করে, মনে হয়, বিভাসের ঘাড়ে একটা ঘুষি দেবে কিংবা চুলের মুঠি ধরে টেনে দেবার বুঝি বড় সাধ। সে খুশি। বিভাসকে দেখে খুশি, কথা বলে খুশি, বিদ্রূপ করে খুশি। এখন বিভাসের উপর তার রাগ করার অধিকার জন্মেছে। রাগ করেও খুশি। যে-দিন কাঁদবার অধিকার জন্মাবে সেদিন বুঝি কেঁদেও খুশি হবে। তারো ভয় আছে। সে ভয় বিদ্যুতের ভয় নয়। কেমন একটা অবুঝ ভয়। সে খুশি, খুব খুশি এবং এত বে-হিসেবী খুশি যে সব বে-তাল হয়ে যায়।

এখন ঘোর দুপুরের নিঝুম বাগানে যদি পদ্ম একলা এসে উঁকি মারে বাগানের ঘরে, বলে, শুয়ে আছেন কেন? তবে বিভাস জবাব দেয়, কি করব?

পদ্ম বলে, নাচুন।

নাচতে বললেই সত্যি আর নাচা যায় না। বিভাস তখন হাসি হাসি মুখে পদ্মর দিকে তাকায়। মনে মনে ভাবে, পদ্ম আসলে তাকে কী করতে হবে। সে বলে, তুমিও দুপুরে খেয়ে একটু শুলেই পার।

—কেন শোব?

—শুলে কী হয়?

—টো টো কোম্পানী হয় না।

অথচ সত্যি কোনদিন পদ্মকে টো টো করে বেড়াতে দেখেনি বিভাস।

কিন্তু সে উঠে না বসলে পদ্ম আবার বলে, ও মা, এখনো শুয়ে রইলেন? উঠতে বললাম যে?

বিভাসকে উঠে বসতেই হয়। পদ্ম এসে ঘরে ঢোকে। পুরনো খবরের কাগজের পাঁজা ধরে টানাটানি করে। ময়লা গেঞ্জি বা জামা থাকলে মেঝের ছুঁড়ে ফেলে দেয়। নিজে নিজেই বলে, যাচ্ছে তাই। নোংরার বেহদ্দ।

এবং বিভাস চুপ করে থাকবে, এটাই যেন স্বাভাবিক। তারপরেই হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে ওঠে পদ্ম। গম্ভীর হয়ে হঠাৎ এক একটা অদ্ভুত কথা বলবে। হয়তো বলে, আমাদের এখানে থাকতে আপনার আর ভালো লাগে না, না?

বিভাস অবাক হয়ে বলে, কেন, বেশ ভালোই তো আছি।

—মিথ্যুক!

বলে পদ্ম হঠাৎ একটু হাসে। তারপর একটু মুখ ভেংচে, চলে যায়।

বিদ্যুতও কখনো কখনো একলা আসে। বাড়ির কথা, কিংবা যা হোক কিছু জিজ্ঞেস করে। কিন্তু বিদ্যুৎ আর তার, দুজনেরই কথা ফুরিয়ে যায় খুব তাড়াতাড়ি। উভয়পক্ষই যেন হাঁসফাঁস করে…কথা, কথা, কথা কেন আসে না।

হঠাৎ হেসে বলে বিদ্যুৎ, ভারি বিরক্ত করি, না?

বিস্মিত বিভাস জিজ্ঞেস করে, কেন?

এরকম এসে এসে?

না-না।

ভালো লাগে?

বিরক্ত লাগে না, সে-কথা বলা যায়। ভালো লাগার কথা বলা যায় না। তাই বিভাস চুপ করে থাকে।

বিদ্যুৎ কী ভাবে, কে জানে। সহসা ফিরে যেতে উদ্যত হয়।

বিভাস তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলে, না, যাবেন না মানে—কি বলছেন? আপনি রাগ করেছেন?

বিদ্যুতের কালো চোখ দুটিতে হাসি চমকে ওঠে। বলে, করলেই বা, আপনি তো আর কথা বলেন না। ওরকম গোঁজ হয়ে থাকেন কেন? আপনার বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করি, পরিষ্কার করে বলতে পারেন না। আমাকে তো কখনো বাড়ির কথা জিজ্ঞেস করেন না?

জিজ্ঞেস যে করা যায়, সেটাই বিভাস ভালো জানে না। আর যদি বা জানল, তবে জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করে। জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছা করে, বিদ্যুতের বর তাপস এবং তারকেশ্বরের ব্যবহার ও সম্পর্ক দেখে অবাক লাগে কেন?

সত্যি, তাপস আর বিদ্যুৎ, এ দুজনকেও ঠিক মেলাতে পারে না বিভাস। ঠিক গজ চোখো নয় তাপস। চোখের মণি দুটি, নাকের পাশের দুই কোণে এসে যেন আটকে গেছে। চেহারার সঙ্গে তারকেশ্বরের সাদৃশ্য প্রায় নেই। বরং ভুবনেশ্বরীর সঙ্গে আছে। সেটাও ভালো করে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। কারণ তাপসের শরীরে নরম মেদের বাড়াবাড়ি। মুখে প্রায় সব সময়েই হাসি লেগে আছে। যে-হাসির কোনো কারণ নেই। অর্থ নেই। এবং সেরকমই প্রায় অকারণ অর্থহীন হাত পা নাড়ে অনবরত। আর গা চুলকোয়। বিড়ি খায় ঘন ঘন।

মাঝে মাঝে, দুপুরে, তাপসও আসে বাগানের ঘরে। কথার উচ্চারণ স্পষ্ট নয়। যেন কথা বলতে গিয়ে জিভ উল্‌টে যায়। কিংবা জিভ অসম্ভব ভারি। কথা বলতে গেলে নড়ে না। অথচ তোতলা নয়। ঘরে এসে রাশি রাশি কথা বলে যায় তাপস। অর্দ্ধেক বোঝে, অর্দ্ধেক বোঝে না বিভাস। তাপসের বেশির ভাগ কথাই বিদ্যুৎ আর তারকেশ্বরকে নিয়ে।

বিভাস দেখেছে, তারকেশ্বরকে দেখলেই তাপস পালায়। তার চোখে মুখে ভয়ের ছায়া ফুটে ওঠে। বিভাস তারকেশ্বরের পাশে বসে খায়। কিন্তু তাপসকে কোনদিন খেতে দেখেনি। সে যে কখন খায়, কখন বাড়ি আসে, সে সব কথাও বিভাস জানতে পারে না।

কয়েকবার বিদ্যুতের সামনে তাপসকে দেখেছে বিভাস। তখন তাপস কারুর দিকে তাকায় না। কারুর কাছে দাঁড়ায় না। বিদ্যুতের গা ঘেঁষে থাকে। গোঙা স্বরে, জড়ানো কথায় কী সব বলে। বিদ্যুৎ কাজে ও কথার মধ্যে, হুঁ হা দিতে থাকে। খানিকটা স্নেহের সঙ্গে চুপ করাতে চেষ্টা করে। না পারলে, গম্ভীর হয়ে তাপসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলে, চুপ করতে বলছি যে? যাও, এখন যাও।

তৎক্ষণাৎ চুপ করে তাপস, করুণ মুখে চলে যায়। বিভাস লক্ষ্য করে, বিদ্যুৎও তখন কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। আর বিভাসের বুকের মধ্যে হাঁসফাঁসিয়ে ওঠে। সে তখন এক মুহূর্তও দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না। নিজেকে লুকোবার জন্যে সে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। বিদ্যুতের সামনে থেকে সে পালিয়ে যায়।

বাড়ির গৃহিণী ভুবনেশ্বরীকেও যেন কেমন কেমন লাগে। বিভাস শুনেছে. রান্না নাকি তিনিই করেন। কিন্তু কোনদিন দেখেনি। অবশ্য দেখবার কথাও নয়। এত দিনের মধ্যে, কর গুণে বলা যায়, কদিন বিভাসের সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর মুখোমুখী হয়েছে। দু-একদিন হয়তো কাছে এসে জিজ্ঞেস করেছেন বিভাসকে, পেট ভরেছে? কোনো অসুবিধে হয়নি তো বাবা। যা দরকার হবে, চেয়ে চিন্তে নিও।

কখনো কখনো লক্ষ্য করেছে, তারকেশ্বরের খাওয়ার সময় তিনি দোতলার সিঁড়ির কাছে এসে দাঁড়ান। সিঁড়ির কাছাকাছি বারান্দাতেই প্রায় প্রত্যহ ঠাঁই হয়। কিন্তু আশ্চর্য, কখনো দুজনকে কথা বলতে শোনেনি। মনে হয় ভুবনেশ্বরী যেন এখনো বিদ্যুতের মতোই একটি বউ। ব্যবহারেই শুধু নয়। যৌবনও যেন এখনো ভুবনেশ্বরীকে ছেড়ে যেতে গড়িমসি করছে। ঘোমটা খোলা অবস্থায় কখনো দেখা যায় না তাঁকে। সামনের চুল দেখলেই বোঝা যায়, এখনো পাক ধরেনি। ভাঁজ পড়েনি মুখে। সিঁথিতে সুদীর্ঘ গাঢ় সিঁদুরে রেখা। কপালে টিপ্ ছাড়া দেখা যায় না। কানে কানপাশা আর নাকে হীরে কিংবা পোখ্‌রাজের নাকছাবিতে তাঁর শ্যাম মুখখানি এখনো

রীতিমতো ঢলঢলে। কিন্তু হাসি নেই মুখে। যেন একটা গভীর ব্যথা বয়ে বেড়াচ্ছেন বলে মনে হয়। অথচ ভাবলেশহীন মুখ নয়। একে শোকের ছায়া বলে কি না বিভাস বুঝতে পারে না। নীরব স্নিগ্ধ আর যেন কেমন করুণ। তিনি যেন অনেকটা অদৃশ্যচারিণী। অথচ এই বিশাল বাড়িতে তাঁর অস্তিত্ব ভোলা যায় না।

গোটা বাড়িটাই যেন কী রকম এক অদৃশ্য পাঁচিলে ঘেরা। কিংবা বিভাস কানা। অনুভূতি ও বুদ্ধিতে হীন। কিছুই বুঝতে পারে না।

কিন্তু এ সব বিষয় প্রশ্ন করতে দ্বিধা হয়। লজ্জা করে। জানতে ইচ্ছা করে, বিদ্যুতের বাপের বাড়ি কোথায়। কোন্ দেশের মেয়ে সে। তাকে যেন বন্দিনী বলে মনে হয়।

আর বিভাসের নিজের কথা ? কী বলতে হবে, সে কিছুই জানে না। তাই, কথা আর বলা হয় না। চোখ নীচু করে, ঘরের মধ্যে বিদ্যুতের অস্তিত্বকে ঘিরে, নানান কথা, নানা ছবি তার মনের পর্দায় ছায়া ফেলে যায়।

ঘরের মধ্যে বাতাস আসে, চলে যায়। ঝিঁঝিঁর ডাক একবার তলিয়ে যায়। একবার ভেসে ওঠে।

কিন্তু কথা ? কথা নেই কেন ? এত নীরবতা, দুজন মানুষের মাঝখানে, বড় অস্বস্তিকর। কষ্টদায়ক। বিদ্যুৎও কি কথা বলতে পারে না ? সেই বা তার বাসি আলতা পরা পা দুখানির দিকে চোখ রেখে এমন স্তব্ধ কেন।

আচ্ছা, বিদ্যুতের ওই হালকা পুঁই মেটুলি রং এর দুটি ঠোঁট···কেমন যেন তীক্ষ্ম, না ? আর টেপা। তাপস যখন···আচ্ছা, বিদ্যুতের স্বাস্থ্যের উপরে এই যে একটা ইচ্ছাকৃত জোর করা নম্রতা···আচ্ছা, বিদ্যুতের এই আটপৌরে ধরনে পরা শাড়িতে উচ্ছ্বিত তার সুঠাম···। আঃ! কেন এরকম সাহস পাচ্ছে বিভাস। কেন এসব ভাবছে। কেন তাপসের আলিঙ্গনাবদ্ধা বিদ্যুতকে সে দেখছে।

তখন হয়তো বিদ্যুৎ বলে ওঠে, নিন, মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসে যান, আমি চলি। কিন্তু এলে রাগ করতে পাবেন না, বলে রাখছি।

বলে চলে যায়।

বিভাস ব্যগ্র হয়ে মুখ তোলে। তারপর চুপ করে চেয়ে থাকে অপসৃয়মানা বিদ্যুতের দিকে।

কিন্তু রাগ নয়, পদ্ম কিম্বা বিদ্যুৎ যে-দিন সকালে অথবা দুপুরে না আসে, সে-দিনটা বিভাসের ফাঁকা-ফাঁকা লাগে। কাজের মাঝেও সে-কথা মনে হয়।

তিনজনের দেখাশোনা সারাদিন সামান্যই হয়। কথা সব দিন হয় না। তবু এই অচিনার পোশাকী নাম অচিনপুরের অদৃশ্য সুতোয় তিনজনে বাঁধা পড়েছে।

তাদের তিনজনের আশেপাশে যে-মানুষটা প্রায়ই ঘোরাফেরা করে, সে বুনো। বুনোটাও যেন ঈশানের মতোই হাসে। হঠাৎ আসে বাগানের ঘরে। এসে ধোয়া বিছানার চাদরটি দেখে হয়তো হেসে বলে, ও, দিয়া গেছে বিছানার চাদর? বউদিদি দিয়া গেছে বিছানার চাদর। বউদিদি দিয়া গেছে বুঝিন?

বিভাসের নিয়মিত সব প্রয়োজনের সময়েই বুনো আসে। কিন্তু বিদ্যুৎ আর পদ্মর হাত দিয়ে সে-সব প্রয়োজন মিটে যায় আগেই। বুনো হেসে ফিরে যায়। বুনোর ছোট ছোট চোখ, চ্যাপটা নাক আর ঠোঁটের গড়নের মধ্যেই হাসিটা যেন লেগে থাকে। হাসে না হয়তো, দেখায় হাসি-হাসি।

পাখিপাখালির কূজন গুঞ্জন বিশেষ শোনা যায় না বাগানে। পদ্ম আর বিদ্যুৎ আসে, তাদের গুঞ্জন শোনা যায়।

মানুষের ঘর-বাহির আছে। বিভাসের বাইরের জগত ছেড়ে, ভিতরে আছে এই দুজন। এখানে তার মন, সকলের অগোচরে, বোধহয় পদ্ম বিদ্যুতেরও অগোচরে, নানান রকমের সুখদুঃখের চিন্তায় ভরা। তাই ঈশানের মিটিমিটি হাসি ও মন নেড়েচেড়ে দেখার কথায় মন তার চমকে চমকে ওঠে। কথায় বলে, চোরের মন বোঁচকার দিকে। এও যেন বিভাসের একরকমের চুরি।

তা বলে ঈশানকে তার মারতে ইচ্ছে করে না। কিন্তু তারকেশ্বর? তারকেশ্বরের কী হয়েছিল?

কিছু নয় বলে উড়িয়ে দিতে গিয়েও মনটা কৌতূহলে খচ্‌খচ্‌ করে। তারকেশ্বরকে সবাই যেন বড় বেশি ভয় পায়। রাসু ভয় পায়, পদ্ম-বিদ্যুৎ ভয় পায়। বিভাসের মনে হয়, ভুবনেশ্বরীও বোধহয় ভয় পান এবং তাপস ভয়ে কাছেই আসে না।

॥ চার ॥

তারকেশ্বরকে সকলেই ভয় করে। সেই সকলের মধ্যে বিভাসও এখন একজন। সকলে কতখানি জেনে ভয় করে, সে জানে না। বিভাস ভয় করে অজানাকে, তারকেশ্বরকে নয়। সেই ভয়ের সঙ্গে আছে অপরিসীম কৌতূহল।

ক্ষমতাপ্রিয়তা বোধহয় মানুষের সহজাত লিপ্সা। তারকেশ্বর লিপ্সার ঊর্ধ্বে। ক্ষমতা ভালবাসার চেয়ে মদের মতো নেশা করেন উনি। নেশার কোনো বাছবিচার থাকে না। একবার ধরে গেলে খোয়ারি না কাটা পর্যন্ত তার রেহাই নেই।

একবছরের মধ্যে যোগেশ ঘোষালের আঁচনা ছেড়ে চলে যাওয়ার ব্যাপারটিতে বিভাস সে কথা ভাল করে বুঝেছে।

যোগেশ ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য, আঁচনার বিশিষ্ট মানুষ। তারকেশ্বরের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের মিটিংএ প্রথম যোগেশের সঙ্গে তারকেশ্বরের মতান্তর হয়।

মতান্তরের কারণটি ছোট নয়। আঁচনায় চাযের প্রয়োজনীয় জলাশয় আটামুটি ভালই আছে। উত্তর-পুবে যমুনা থেকে একটি মৃদু-বেগ স্বাভাবিক খাল আঁচনার দক্ষিণ পশ্চিম প্লাবিত করে বারোমাসই বহে। খাল বললে অবশ্য অমর্যাদা করা হয়। গ্রামের লোকেরা নদী বলে। এবং কোনো এক কালে নদীর পূর্ণ মর্যাদাতেই অধিষ্ঠিত ছিল এ খাল। কিন্তু নেদো গ্রামটি জল পায় না। নেদো গ্রামে মুসলমান বেশি। তারা ম্যাজিস্ট্রেটকে দরখাস্ত করে জানিয়েছিল, বহুকাল আগে, আঁচনার পূর্বদিগন্তের দক্ষিণগামী আক্কেলগড় খালটা নাকি নেদো দিয়ে প্রবাহিত ছিল। ইতিহাসের কোনো সাক্ষী না থাকলেও, এ খাল যে গৌড়ের পাঠান রাজত্বকালে কাটানো হয়েছিল, তা অনেকেই জানে। এবং এ খালও এক সময়ে যমুনার বেগ থেকেই ধার করা হয়েছিল। মিশিয়ে দেওয়া হয়েছিল আঁচনার নদীর সঙ্গে। এখনো শুকনো ঘাস ভরা নয়নজুলির মতো সরু একটি রেখা নেদোতে আছে। খালটি যেখান থেকে আঁচনায় বাঁক নিয়েছে, সেখানে আজো একটি বাঁধ লক্ষ্য করা যায়। খাল যেখান দিয়ে নেদোতে প্রবেশ করেছে, সেখানেও অনুরূপ একটি বাঁধ লক্ষনীয়। আঁচনার চাটুজ্জেদের পূর্বপুরুষ, অখিল চাটুয্যে এই কীর্তিটি করেছিলেন। অখিল থেকে আক্কেল হয়েছে কি না, কে জানে। কিন্তু নেদোর পক্ষে ব্যাপারটি আক্কেল পাওয়ার মতোই।

অখিল চাটুয্যের যুক্তি একেবারে ছিল না, তা নয়। আঁচনার সুদীর্ঘ এলাকা জুড়ে প্রতি বছরই বন্যায় ভেসে যেত। আর সেই সর্বগ্রাসী বন্যা আসত নেদোর খাল দিয়েই। আঁচনার নদীও বন্যার দালালী কম করত না। নেদোর খালের পরিবর্তে যদি আঁচনার নদীতে বাঁধ দেওয়া যেত, তা হলেও এই একই পরিণতি হত। কিন্তু নেদোর লোকেরা আঁচনার রাঢ়ীর ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেনি। তৎকালীন জেলাশাসক সাহেব এবং স্বয়ং কালেক্টর আঁচনার পক্ষে ছিলেন। নোটিসে এরকম কথা উল্লেখ ছিল, যেহেতু আঁচনার নদী বহু দূর থেকে বিভিন্ন জনপদের ওপর দিয়ে আসছে, এবং এটি একটি স্বাভাবিক নদী, সেই হেতু গভর্ণমেণ্ট এই নদীটিকে রক্ষা করতে চান। সেই সঙ্গেই চান, এই নদী যাতে জনপদের কোনো ক্ষতির কারণ না হয়ে উঠে। আর তা করতে গেলে, গৌড়ের পাঠান শাসকদের ভুলকৃত সংক্ষিপ্ত খালটি বন্ধ করা ছাড়া উপায় নেই। গভর্ণমেণ্ট সেই ব্যবস্থাই গ্রহণ করছে।

তখন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, পরম ধার্মিক, আর গৌড়ের পাঠান নবাবদের

রক্ত-সম্পর্কিত জ্ঞাতি, নেদোর রসুল সাহেব প্রতিবাদ করেছিলেন। কৃতকার্য হননি। হননি, তার কারণ, তাঁর প্রতিবাদের পিছনে আবিষ্কার করা হয়েছিল সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার উস্কানি। যদিও সবাই জানত, রসুল সাহেব যদি সে উস্কানি দিতেন তবে দাঙ্গা রোধ করা সম্ভব ছিল না। আর সে আবিষ্কারের ঘোষণা শোনা মাত্র রসুল সাহেব সরে দাঁড়িয়েছিলেন। আসলে তিনি যে কথা বলতে চেয়েছিলেন তা বলা হয়নি। তিনি সমস্যার মূলে আঘাত করতে চেয়েছিলেন। তিনি দেখিয়েছিলেন, দোষ খালের নয়। যমুনার অগভীরতাই দায়ী। বাঁধ খাড়া করার দরকার নেই। নদীকে গভীর করা দরকার।

প্রায় গোটা জেলাটা অট্টহাসি হেসেছিল রসুল সাহেবের মুখের ওপর। নদী কেটে গভীর করার কথাটা তখন এতই অসম্ভব মনে হয়েছিল সকলের। এমন কি রসুল সাহেবের সমর্থকেরাও বিমূঢ় হয়ে পড়েছিল। তবু নেদো গ্রামকে পুলিশ বেষ্টনীর মধ্যে রেখে বাঁধ খাড়া করা হয়েছিল। প্রায় তিরিশ বছরের আগের ঘটনা হলেও, অনেকেরই সে সব কথা মনে আছে।

বাংলায় লীগ মন্ত্রীত্বের আমলে, আবার নেদোর খাল নিয়ে একবার কথা উঠেছিল। কী ভাবে উঠেছিল, সে কথা কেউ জানে না। আবার চাপা পড়েছিল কী ভাবে, সে কথাও কেউ জানে না।

সে সব অতীত দিনের প্রসঙ্গ।

স্বাধীনতার মিথ্যা উচ্ছ্বাসটা যদিও কয়েক বছরের মধ্যে অনেকখানি মরে গেছে, তবু বিশ্বাস অবিশ্বাসের মাঝামাঝি একটা মনের অবস্থা সাধারণ মানুষের। তাই নেদোর খালের প্রসঙ্গ আবার উঠেছিল। আরও উঠেছিল এই জন্যে, প্রকৃতির খেয়ালই যেন সুদীর্ঘ সময়ের অবরোধকে ভেঙে দিতে এসেছে। লক্ষ্য করা যাচ্ছে, পূর্বদিগন্তে যমুনার সঙ্গে কেউটে বিলের চির বিচ্ছেদে ভাঙন ধরেছে। আর এ বিচ্ছেদে আসলে কেউটে বিলের সঙ্গে নয়। কালিন্দীর সঙ্গে যমুনার বিচ্ছেদ। বর্ণে ও চরিত্রে দুজনের মধ্যে অনেক মিল। তারা দুই বোন। দুই সখী। কালিন্দী বহুকাল ধরে কেউটের হাতায় এসে যমুনার পথ চেয়ে বসেছিল। অন্তরায় ছিল নিষ্ঠুর এক খণ্ড ভূমি। সেই ভূমিখণ্ডের প্রতিরোধ ভেঙেছে যমুনা। কয়েক বছর ধরে দেখা যাচ্ছে, যমুনা-কালিন্দীর মিলন ঘটছে শ্রাবণে। আর এ মিলনের ফল হয়েছে শুভ। এবার নেদোর খালের মুখ খুলে দিতে পারলে, বন্যার ভয় আর থাকে না। বর্ষার পাহাড়ি উচ্ছ্বাস দ্বিগুণ হলেও ক্ষতি নেই।

অতএব বাঁধ ভাঙা হোক। জেলা শাসক এবং অন্যান্য সংস্থাগুলির অনুমতি হোক। নেদো বাঁচুক।

ম্যাজিস্ট্রেট দরখাস্তটি বিবেচনার জন্য পাঠিয়েছিলেন ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বারেরা সবাই তারকেশ্বরের অন্তরঙ্গ।

অকাজের একদল আছে। তারা সভায় যোগ দেয় কালেভদ্রে। তারকেশ্বরের মুখ দিয়ে প্রথমেই বেরিয়ে এসেছিল, না, তা হবে না।

বাকি সদস্যেরা কীর্তনের দোহারকির মতো। মূল গায়েন যা বলে, যে সুরে বলে, যেমন কাঁদে ও হাসে, বাকিরা শুধু তার অনুকরণ করে। সে অনুকরণ বোধহীন, অনুভূতিহীন, মরা। সকলেই বলেছিলেন, তা হবে না।

কেবল যোগেশ বলেছিলেন, এটা করতে হবে ভাই তারকেশ্বর। নেদোর লোকদের অনেকদিনের দাবি।

তারকেশ্বরের কপালে কতগুলি সর্পিল ভাঁজ পড়েছিল। তার মোটা নাক থেকে খানিকটা মাংস যেন কপালে উঠে গিয়েছিল তখন, আর নাকটি তীক্ষ্ন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু চুপ করেছিলেন অনেকক্ষণ। জানতেন যোগেশের সদরে যাতায়াত আছে, ম্যাজিস্ট্রেটের সঙ্গে কথাবার্তাও হয়। তার মতামতের গুরুত্ব আছে।

তারপর বলেছিলেন, নেদোতে জলের অভাব কি। যে গাঁয়ে খাল নেই, সেখানে কি চাষ আবাদ বন্ধ থাকে?

যোগেশও কিন্তু কিন্তু করেছিলেন। তারকেশ্বরকে চটাতে চাননি তিনি। কিন্তু কথার পৃষ্ঠে কথা এসে গিয়েছিল। বলেছিলেন, বন্ধ থাকে না, কিন্তু অনাবৃষ্টি হলে ভীষণ ক্ষতি হয়। জল থাকলে আর কপাল গুণে বসে থাকতে হয় না।

—নেদো চিরকাল তাই তো ছিল?

—চিরকাল না, অখিল চাটুয্যের আমল থেকে। প্রায় তিরিশ বছর ধরে।

যোগেশ ঘোষালের বন্ধুবৎসল শান্ত চোখের দৃষ্টি যেন কেমন কঠিন হয়ে উঠেছিল আস্তে আস্তে। অঙ্গারের মধ্যে গুঁজে দেওয়া লোহা যেমন ধীরে ধীরে তাতে। একটু একটু করে লাল হয়।

বিভাস অবাক হয়েছিল। ভেবেছিল, মানুষ চেনা একটা কঠিন কাজ। তার চেয়ে কঠিন বুঝি নিজেকে চেনা। আর সেটাই হয় তো ঈশানদের তত্ত্ব। যোগেশ ঘোষাল নিজেই কি জানতেন। তাঁর ভিতরে একজন বিদ্রোহী আত্মগোপন করেছিল।

বিভাসের বিশ্বাস, যোগেশ জানতেন না। গত এক বছরের মধ্যে নানান কারণে বিভাস ঘোষালের বাড়ি গিয়েছে। সে আবিষ্কার করেছিল ঘোষাল এক নেশায় আচ্ছন্ন। আঁচনার নেশা। এক একটা গ্রাম-প্রেমিক মানুষ দেখা যায়, সেই রকম। নিজের গ্রাম, পরিচিত পরিবেশ, পথঘাট খেত-খামার, আকাশ, গাছপালা, সব কিছুতেই যে মুগ্ধ। একমাত্র আবহাওয়ায় যে অভ্যস্ত। তার প্রাণ মন রক্ত মাংস সব যেন একাত্ম সেই গ্রামের ধূলিকণাটির সঙ্গে। জলের মাছের মতো। ডাঙা যার মৃত্যুপুরী।

প্রায় সেইরকম এক বিচার বিবেচনাহীন নাড়ির টান যেন আঁচনার সঙ্গে যোগেশের। অপরের বেলায় হলে একথা মনে হত না। যোগেশ বলেই মনে হয়েছিল। উনি আঁচনার বাইরে লেখাপড়া করেছেন। একজন পুরনো গ্রাজুয়েট। উনিশ শো তিরিশে প্রায় দুবছর জেলে ছিলেন স্বদেশী আন্দোলনে।

সেটা ছিল যোগেশের এক দ্বীপে বাস। এ আর এক দ্বীপ। দ্বীপান্তরিত ঘোষালের মধ্যে সেই জীবনের ছায়াটুকুও টের পাওয়া যায়নি। বিভাস ভাবত উনি অলস। ভীরু মানুষ। বাইরের জগৎ এবং মানুষকে চিরকাল পরিহার করেই চলেছেন। সুযোগ পেয়েছিলেন, অবশ্য আর্থিক স্বাচ্ছন্দের জন্যেই। এক্ষেত্রে আর্থিক সাচ্ছন্দ্য মানেই জমি ফসল। সেদিক দিয়ে তাঁর ভাগ্য অকৃপণ। মনে হত উনি একজন নির্বিরোধী সুখী মানুষ।

আর সংসারেও সেই ছায়া বর্তমান। স্ত্রী ও দুই মেয়ে নিয়ে সংসার। সকলেই পরস্পরের খুব ঘনিষ্ঠ। প্রায় বন্ধু। সেখানেই ঘোষালকে খানিকটা চেনা যেত। সংবাদপত্রের খবর নিয়ে তর্ক, কাব্য এবং সাহিত্য নিয়েও নানান কথায় মেতে উঠতে দেখা যেত যোগেশকে। সে হিসেবে ঘোষাল বাড়ির আবহাওয়া আঁচনার প্রায় ব্যতিক্রম। মেয়েদের কাছে রবীন্দ্রনাথের কবিতা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ঘোষালকে আত্মহারা হতে দেখেছে বিভাস। ঘোষাল গিন্নির রান্না জুড়িয়ে জল হতে দেখেছে। কারণ, যোগেশ তখন হয়তো মেয়েদের ভারতবর্ষের ইতিহাস বোঝাচ্ছিলেন।

কিন্তু এসবই মনে হত, স্বাচ্ছন্দ্য এবং আলস্যের এক বিলাস। এক গ্রামকুণো মানুষের ভাবুকতার উচ্ছ্বাস। একটি নিটোল নিস্তরঙ্গ জীবন। এ জীবনে কোথাও রোধ বিরোধের ধাক্কাধাক্কি নেই।

এমন মানুষের পক্ষে, তারকেশ্বরের সঙ্গে কখনো বিবাদের কথা চিন্তাও করা যায়নি। চিরকালই সায় দিয়ে এসেছেন তার কথায়। কিন্তু এবারে যোগেশের নিস্তরঙ্গতা ভিতরের এক গুপ্ত ঘূর্ণীর পাকে আবর্তিত হয়ে উঠল। তারকেশ্বরের স্তব্ধ এবড়ো খেবড়ো সাদা পাথরের মতো শক্ত মুখ, নীরব শ্লেষ, ভিতরে ভিতরে তাকে পোড়াচ্ছিল। অপমানিত করেছিল, আপোষহীন করে তুলেছিল। বন্ধুত্বের মর্যাদা চিরকাল যোগেশেরাই দিয়ে এসেছেন। তারকেশ্বর কোনদিনই দেবে না? তার আরো রাগ হয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের নেদোর প্রতিনিধিকেও চুপ করে থাকতে দেখে।

তারকেশ্বর জবাব দিয়েছিলেন, তিরিশ বছর যখন চলেছে, নেদোর বাকি জীবনও চলে যাবে। দরকার হয়, আঁচনার নদী আর যমুনার মুখ যেখানে মিলেছে, সেই মামুদপুর থেকে নতুন খাল কাটিয়ে নিয়ে আসার প্রস্তাব নাও তোমরা।

—পাগলের মতো কথা বলো না তারক।

—তোমার মনে হচ্ছে বটে আমি পাগলের মতো কথা বলছি। কিন্তু আমি প্রেসিডেণ্টের মতোই কথা বলছি।

—প্রায় বিস্ময়কর শান্ত অথচ কঠিন গলায় বলেছিলেন যোগেশ, —প্রেসিডেণ্ট তো খামখেয়ালীপনা করতে পারে না। ইউনিয়ন বোর্ডের কী ক্ষমতা আছে যে যমুনা থেকে খাল নেদোতে কাটিয়ে নিয়ে আসবে?

—আজ নয়, বিশ বছর বাদে ক্ষমতা হবে।

তারকেশ্বরের এ নির্বিকার বিদ্রূপে সহসা কথা বলতে পারেননি যোগেশ।

পরমুহূর্তেই বলে উঠেছিলেন, ইউনিয়ন বোর্ড কারুর মর্জি আর মেজাজে চলতে পারে না। আমার জিজ্ঞাস্য, খালকাটার প্রশ্ন নতুন করে আসছে কেন?

তেমনি বিদ্রূপাত্মক গলাতেই তারকেশ্বর বলেছিলেন, কারণ তোমরা হঠাৎ বলছ, নেদোর লোকদের জল চাই।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই চাই। তার জন্যে নতুন খাল কাটবার কোনো দরকার নেই। তুমি ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট, তুমি জান না, যমুনা ওপারে ভূয়ালীর জলা জমি ভাসিয়ে কালিন্দীর সঙ্গে বর্ষায় মিশে যায়।

তারকেশ্বর নির্বিকারভাবে বলেছিলেন, কই জানি না তো।

—তা হলে এখন জানো। তোমাকে আমি খবর দিচ্ছি, ভূয়ালীর মাঠ ভাসিয়ে বর্ষায় দুটো নদী এক হয়। সেটাকে বারোমাস করা কিছুই কঠিন নয়। এতে লাভ হয়েছে এই যে—ভয়ে এককালে নেদোর খাল বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল, সেই বন্যা আর কখনো এদিকে আসতে পারে না। নেদোর বাঁধের মুখ দুটো ভেঙে দিলেই হয় এখন।

তারকেশ্বরের মুখ রাগে ফেটে পড়ছিল। কিন্তু শান্তভাবেই বলেছিলেন, তাই বুঝি। বেশ জানা গেল।

ইউনিয়ন বোর্ডের সভায় একটা থমথমে স্তব্ধতা নেমে এসেছিল। অনেকক্ষণ ধরে কেউ কোনো কথা বলতে পারেননি। তারকেশ্বর যেন বিরক্তিপূর্ণ বিদ্রূপে যোগেশের দিকে তাকিয়েছিলেন। আর যোগেশ সকলের মুখ লক্ষ্য করছিলেন। বুঝেছিলেন, তাঁর পক্ষে কথা বলবার কেউ নেই। সহজ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আঁচনার যখন কোনো ক্ষতিই হচ্ছে না, তখন তোমার না বলার কারণ কী তারক?

তারকেশ্বর বলেছিলেন, আমার মনে হয়, তোমার সঙ্গে আর আঁচনার ভালমন্দ নিয়ে আলোচনা করে লাভ নেই।

যোগেশ সুদীর্ঘ বক্তৃতা দিয়েছিলেন। বলেছিলেন, যেখানে মানুষের বাঁচা মরার সমস্যা, সেখানে কোনো ব্যক্তি বিশেষের খামখেয়ালী চলতে পারে না। নেদোর দাবি যুক্তিসিদ্ধ। বোর্ডের হাতে টাকা যা আছে, তাতে এ কাজ আটকাবে না। নেদোর উপকারে আমাদেরই এলাকার লাভ, প্রাচুর্য অনেক

বাড়বে। অবশ্য নেদোর লোকেরা ইউনিয়ন বোর্ডকে কিছুই জানায়নি, সরাসরি ম্যাজিস্ট্রেটকে পত্র দিয়েছে। অনেক দুঃখে দিয়েছে। তারা বহুবার আমাদের কাছে মৌখিকভাবে বলেছে, আমরা ধামা চাপা দিয়েছি। এইটাই যদি তাদের অপরাধ হয়ে থাকে, সেটা বিচারের বিষয় নয় এখন।

যোগেশ বলছিলেন, তারকেশ্বর তীক্ষ্ণ অপলক চোখে তাকিয়েছিলেন। নাকের দু'পাশের সুগভীর রেখায় তীব্র বিদ্বেষ। বিভাসের মনে হয়েছিল, শিকারে গিয়ে বন্দুক নিয়ে যখন টারগেট করেন তারকেশ্বর, তখন এমনি দেখায়।

সভার কোনো বক্তব্য লিখিতভাবে রাখার বালাই ছিল না। তারকেশ্বর শুধু যোগেশকে বলেছিলেন, তোমার মতামতটা তাহলে আলাদা করে লিখে দিও।

সেইদিন রাতে বিভাসকে ডেকে নিয়ে তারকেশ্বর বাইরের ঘরে বসেছিলেন।

বিভাস বুঝতে পারছিল, তারকেশ্বর চিন্তিত হয়ে পড়েছেন। একবার বলেছিলেন, নেদোতে তিন ঘর মাত্র হিন্দু। বাকি সব মুসলমান। হিন্দু গ্রাম হলেও যোগেশকে আমি জিততে দেব না। পশ্চিমের কুলুঙ্গিতে পাকানো ম্যাপটা নিয়ে এস তো।

ম্যাপখানি খুলে অনেকক্ষণ দেখলেন তারকেশ্বর। নেদোর খালের রেখা দেখিয়ে বললেন, দক্ষিণ দিকে নেমে আবার পুব দিকে বেঁকেছে, না?

—হ্যাঁ।

—বেঁকে কোথায় গেছে?

—যমুনাতেই।

—অর্থাৎ ভূয়ালীর মাঠের কাছে।

—হ্যাঁ।

—আর মাঠের ওপারে কালিন্দী।

—হ্যাঁ।

—আর কালিন্দী কোন দিকে যাচ্ছে?

—আরো পুবে।

—মানে যশোরের ভিতরে, উঁ?

—হ্যাঁ।

আন্দাজে আঙ্গুল দিয়ে মেপে, স্কেলের হিসেব নিয়ে বলেছিলেন, তার মানে ধরতে গেলে, যমুনা থেকে কালিন্দীর ভেতর দিয়ে, সাত আট মাইল ঘুরে, নেদোর খালটা যেন পাকিস্থানে গিয়ে পড়ছে, কী বল?

বিভাস অবাক হয়ে বলেছিল, নেদোর খাল?

—ওই হল। ভূয়ালীর মাঠে যদি কোদাল পড়ে, নেদোর খাল যদি

যমুনাতেই যায়, কালিন্দীর স্রোত তো যশোরের ভেতর দিয়েই যায়।

—হ্যাঁ, তা যায়।

একটা মরা বুলেট চটকাচ্ছিলেন তারকেশ্বর। সার্থক শিকারের পর যেমন তীব্র উল্লাসে চোখ জ্বলে আর দপ্‌দপ্‌ করে, তেমনি জ্বলছিল। হঠাৎ উঠে পড়ে বলেছিলেন, চল খেতে যাই।

পরদিনই সকালবেলা তারকেশ্বর চলে গিয়েছিলেন সদরে। বিভাস একলাই ডিসপেন্সারি খুলেছে, ওষুধ দিয়েছে, একলা একলা ফিরে স্নান করে খেয়েছে। তার মনটা বার বার বলছিল, তারকেশ্বর জিতে গেছেন, যোগেশ হেরেছেন।

কেবল বিদ্যুৎ ধমক দিয়েছিল, কী ভাবছেন খেতে বসে?

পদ্ম বলেছিল, বোধহয় কাউকে ভুল ওষুধ দিয়ে এসেছে।

পাঁচদিন পরেই ম্যাজিস্ট্রেটের চিঠি এসেছিল ইউনিয়ন বোর্ডের কাছে! ম্যাজিস্ট্রেট লিখেছিলেন, খালের ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ, রাষ্ট্রের একটি বিশেষ ব্যাপার এর সঙ্গে জড়িত। সুতরাং ইউনিয়ন বোর্ড যেন এ বিষয়ে এক্ষুণি কোনো প্রস্তাব না নেন. কারণ, খালের মুখ কাটা এখন সম্ভব নয়।

যোগেশ হেসে ফেলেছিলেন তারকেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে। বলেছিলেন, আমারই ভুল হয়েছিল। তবু তোমার মনে রাখা উচিত—নেদোর উন্নতি শুধু নেদোর নয়, সারা বাংলাদেশের। আজ না হোক, একদিন এ খাল কাটতেই হবে। বুঝলে তারক?

তারকেশ্বর হাসেননি। এমন কি কথাও বলেননি। তারপরেও যোগেশ ঘোষাল অনেকবার এসেছেন, তারকেশ্বর কথা বলেননি। দু-একটি যা বলেছেন, তা বিদ্রূপ এবং শ্লেষ করার জন্যই।

বীতশ্রদ্ধ বিরক্ত তিক্ত যোগেশ আসা যাওয়া বন্ধ করে দিয়েছিলেন। এমন কি, বোর্ডের সভায়ও। চিঠি গিয়েছিল যোগেশের কাছে। জবাব দিয়েছিলেন, মিটিং-এ আসতে অপারগ, শরীর অসুস্থ। তারপর দিয়েছিলেন পদত্যাগ-পত্র। পত্রটি স্বীকার করে নিয়েছেন প্রেসিডেন্ট।

বিভাস মনে করেছিল, এ শুধু বন্ধুত্বের ঝগড়া। মনটা তার যোগেশের প্রতিই ঝুঁকে পড়েছিল। তার কোনো দোষ খুঁজে পায়নি সে। ম্যাপ বিভাসও দেখেছিল। নেদোর খাল পাকিস্তানে সরাসরি পড়ে না। কালিন্দীর বুকে গিয়ে পড়েছে। পূর্ব দিকে বাঁক নেবার আগে, প্রায় দু' মাইল কালিন্দী দুই দেশেরই মাঝখানে পড়েছে। সেখানে গিয়ে কতো খালই পড়তে পারে। অবশ্য কালিন্দী মরা। যমুনার বুক উপচে আসা নেদোর খাল যশোর দিয়ে, সরাসরি খুলনায় নেমে গিয়েছে। মুখ খুলে দিলে, কালিন্দীরও বুক ভরত যমুনার নাগাল পেলে।

রাষ্ট্রনীতির অদ্ভুত জটিলতায় নেদোর কপালে জল জোটেনি। কিংবা রাষ্ট্রনীতি নয়, নিতান্তই জেদ এবং ক্ষমতার দম্ভ। না-ই-বা জুটেছে, যোগেশ ঘোষালের মান যায়নি তাতে। এবং তারকেশ্বর ব্যাপারটিকে জেদের পর্যায়ে টেনে নিয়ে গেছেন। হয়তো তার জেদের জন্যেই নেদোর খরা শুধু পাকিস্তানেই যায়নি। তার দ্বারা আর কোনো উপকারই হয় না।

কিন্তু অবাক হয়েছিল সে যোগেশের প্রতি তারকেশ্বরের ব্যবহার দেখে। মতভেদের ব্যাপার তলে তলে এতদূর গড়াল কেন, বুঝতে পারেনি। তারকেশ্বর এমন অবুঝ কেন ভেবে পায়নি সে। যোগেশের সঙ্গে তারকেশ্বর কথা বলতেন না, সে অপমান যেন বিভাসের গায়ে বিঁধত।

রাসুকে বলেছিল বিভাস, উনি এরকম করেন কেন ?

রাসু চোখ পিট্ পিট্ করে বলেছিল, কার কথা বলছেন ?

—ডাক্তারবাবুর কথা।

—কে ডাক্তারবাবু ?

বিভাসের মনে হয়েছিল সে নিজেই চোখ পিট্‌পিট্ করবে কি না। পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিল, রাসু ইচ্ছে করে ন্যাকামি করছে। ন্যাকামিটুকু অবশ্য ভয় এবং এড়িয়ে যাবার জন্যেই।

সে পদ্মকেও বলেছিল ব্যাপারটা। পদ্ম একেবারেই উড়িয়ে দিয়েছিল। বলেছিল, বাবার কথা আমি শুনতে চাইনে। আপনাকে এসব ভাবতে বলেছে কে ? একদম ওসব কথায় থাকবেন না। ওরকম হাঁদার মতো ভাবেন কেন ?

বিদ্যুৎ শুনে চুপ করে ছিল অনেকক্ষণ ! তারপর কেমন এক রকম একটু হেসে বলেছিল, সংসারে কত মানুষ থাকে। আপনি কি ওঁকে বারণ করবেন ?

—কাকে ?

—আমার শ্বশুরমশায়কে ?

সেইদিন বুঝেছিল বিভাস, বিদ্যুৎ তারকেশ্বরকে বাবা বলে না। বিভাস বলেছিল, ইচ্ছা করে বারণ করতে।

—কী ?

—এই সব জেদাজেদি আর বন্ধুর সঙ্গে ঝগড়া।

—তাহলে আপনারও যোগেশ ঘোষালের হাল হবে।

—কেন ?

—কেন আপনি বারণ করবেন ?

—অন্যায়…

বিদ্যুৎ হেসে বলেছিল, যেন সংসারে কত ন্যায় হচ্ছে।

কিছুদিনের মধ্যেই অদ্ভুত সব গুজব রটছিল যোগেশ ঘোষালের নামে। সে

নাকি পাকিস্তানের চর। যোগেশের বড় বড় আইবুড়ো মেয়েরা নাকি প্রায়ই কোথায় বেড়াতে যায়। কোথায় যায়? কেন যায়? কার কাছে যায়?

বাংলাদেশের গ্রাম গ্রাম-ই। তার সংসার, সংস্কার, ছোট সীমারেখার মধ্যে জমি-নির্ভর ভদ্রলোকেরা সারাদিনে একখানি খবরের কাগজ এপাশ ওপাশ করেও চণ্ডীমণ্ডপে কিংবা বৈঠকখানা ছাড়িয়ে যেতে পারে না। যোগেশ ঘোষালের সম্পর্কে সকলেই চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। তারপর একদিন তারকেশ্বরের কথানুযায়ী বিভাসকেই একটি চিঠি লিখতে হয়েছিল। যোগেশ ঘোষালের দক্ষিণের আমবাগানটার একটি ফালি ইউনিয়ন বোর্ডের রাস্তার জন্যে প্রয়োজন মনে করা হচ্ছে।

বিভাস জিজ্ঞেস করে ফেলেছিল তারকেশ্বরকে, সত্যি নাকি?

—কিসের?

—দখল করবেন?

খানিকক্ষণ চুপ করে তাকিয়ে থেকে বলেছিলেন, তোমার লেখা হয়েছে?

—হ্যাঁ।

—দাও।

চিঠিটা নিয়ে হেসে বলেছিলেন, তোমার ঘটে যদি বুদ্ধি থাকতো, তবে তোমার দাদারা ওভাবে তোমাকে মেরে বার করে দিতে পারত না। তুমিই সবটা দখল করতে পারতে। একটা কথা জেনে রেখো, কারুর গায়ে যদি হাত তুলতে হয়, আগে তুলবে। পরে হাত তুললে হারতে হয় শেষ পর্যন্ত। আগে হাত তোলার ওই একটি সুবিধে।

সেই চিঠির কোনো জবাব দেননি যোগেশ। সপরিবারে গ্রাম ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন সামনের মহকুমা শহরে।

বিভাসের মনে হয় এ শুধু শুধু নিষ্ঠুর খামখেয়াল নয় তারকেশ্বরের। পরে হাত তুলে হারবার ভয়ে যেন সব সময় হাত তুলেই আছেন। ফলে যেখানে যতোটুকু পারা যায়, সবটুকু ক্ষমতা হাতড়ে বেড়ান।

যোগেশ ঘোষালের জন্য মনটা বিষণ্ণ হয় মাঝে মাঝে। তারকেশ্বরের দিকে তাকিয়ে সত্যি কেমন যেন ভয় ভয় করে বিভাসের। ভয়ংকর মানুষ মনে হয় তারকেশ্বরকে। আক্রমনোদ্যত হাত যার উঠে আছে সে কাকে কখন আঘাত করে বসবে, কে জানে? ভয়ের সঙ্গে রাগ হয়, ঘৃণা হয়। কিন্তু তারকেশ্বরের সঙ্গে তার কোনো বিবাদ নেই। ব্যবহারের দিক থেকেও তারকেশ্বর তার কাছে অমায়িক মানুষ। বিভাস তার অনুগত। অনুগতদের প্রতি তারকেশ্বর সদয়। মাসে মাসে টাকা দেন, ঠিক সময়ে জামা কাপড় কিনে দেন, বিশ্বাসও করেন বোধহয়। হাত ধরে অনেক কাজ শিখিয়েছেন। নিজে বসে থাকেন, বিভাস রুগীকে ইঞ্জেকশন দেয়। দরকার হলে এখন দূরে গিয়ে রুগীকে দেখেও আসে। ফিরে এসে নাড়ির গতিবিধি বলে, টেথিস্কোপ

দিয়ে রুগীর শরীরের কোন অংশে কোন শব্দ শুনেছে, সেকথাও বলতে পারে। বিভাসকে না হলে শিকারও জমে না যেন আজকাল। বন্দুকেও হাত রপ্ত হয়ে উঠেছে বিভাসের।

তবুও ভয় হয়। তারকেশ্বরের মধ্যে কোথায় একটি অমানুষিক সত্তা রয়ে গেছে যেন। যাকে দেখা যায় না কিন্তু নিয়তই পাশে পাশে ফেরে।

॥ পাঁচ ॥

বৈশাখ মাস। এ বছরে এখনো বৃষ্টি হয়নি। চারিদিক জুড়ে বড়ো ধুলোর ছড়াছড়ি। গাছের পাতায় পাতায় ধুলোর আস্তরণ। সবই যেন শ্রীহীন বিবর্ণ। আর এই বিবর্ণতার মাঝে, কোথাও কোথাও, রক্তের মতো শিমুল ও কৃষ্ণচূড়া ফুল দেখা যায়।

দুপুরবেলায় বিভাস দক্ষিণ আঁচনা থেকে ফিরে আসছিল। বেলা বুঝি তখন গোটা দুই। পায়ের পাতা-ডোবা ধুলো গরম হয়ে উঠেছে। মাঠের গোরুগুলি নিরুপায় হয়ে ঘুরছে রোদে। ডাক শোনা যায়, দেখা যায় না। একটু বৃষ্টি না হলে আর প্রাণ বাঁচে না। মানুষেরও না, মাটিরও না। গাছগাছালিগুলিও জ্বলে।

মনটা খারাপ বিভাসের। তারকেশ্বরের একটি রুগী ভয় পেয়ে পয়ার-পুরের ডাক্তারবাবুকেও ডাকিয়েছিল। খবরটা চাপতে চেয়েছিল, পারেনি। পয়ারপুর অনেক দূর, ওষুধ আনা যেমন মুশকিল, ডাক্তারকে পাওয়া তার চেয়ে কঠিন। রুগীর অবস্থা খারাপ। হাতে পায়ে ধরেছিল তারকেশ্বরের। যাননি। বিভাসকে পাঠিয়ে ছিলেন। জানে তারকেশ্বরকে আনা কঠিন। তবু, ওষুধ সে নিজেই দিয়ে এসেছে। এখন মনে হচ্ছে, লোকটা মরবে, কিন্তু বিভাসের হাতের ওষুধ খেয়ে মরবে।

পথ চলতে চলতে খেয়াল করেনি কখন মেঘ উঠেছে বায়ু কোণে। গুরু গুরু গর্জন শুনে ফিরে তাকিয়ে দেখল, পাহাড়ের চূড়োর মতো কালো মেঘের ডগায় বিদ্যুৎ ঝলকাচ্ছে। উত্তর-পুব আঁচনা দূর আছে। বোষ্টম-পাড়াটার কাছে আসতেই বাতাস উঠল। ধুলোয় অন্ধকার হয়ে গেল দিগন্ত। গাছগুলি মাতামাতি শুরু করল, দাপাদাপি আরম্ভ করল আঁশশেওড়ার বুনো ঝাড়। মাঠের গোরুগুলি ছুটোছুটি করতে লাগল ভয়ে।

সামনে একটি পাকা বাড়ির বারান্দায় উঠে দাঁড়াল বিভাস। কিন্তু ধুলোর ঝড় সেখানেও ঝাপটা দিয়ে ফিরছে। দরজাটা খোলা যায় না। দেখে মনে হয় বৈঠকখানা ঘর। হাত দিয়ে কড়া নাড়ল সে।

দরজা খুলে সামনে দাঁড়ালেন একজন প্রৌঢ়। জিজ্ঞাসু চোখে এক মুহূর্ত দেখে বললেন, ভেতরে এস।

বিভাস ঢুকতে দরজা বন্ধ করে ফিরে দাঁড়ালেন। মুখখানি চেনা মনে হল না বিভাসের। সম্ভবও নয়। আঁচনা অনেক বড়ো গ্রাম। লোক সংখ্যাও কম নয়। ক'জনকেই বা সে চেনে।

হাত কাটা পাঞ্জাবী পরা ভদ্রলোক। চুলগুলি কাঁচাপাকা উসকো খুসকো। চোখের ফাঁদ বেশ বড়ো। দৃষ্টি যেন একটু উদ্‌ভ্রান্ত। নড়বড়ে তক্তপোষে আধ ময়লা বিছানা। ফুলস্ক্যাপ সাদা কাগজ, দোয়াত, ব্লটিংপেপার ছড়ানো রয়েছে তক্তাপোষের উপরেই। আর ছড়ানো রয়েছে কয়েকটা মুচকুন্দ ফুল। বোধহয় ছারপোকা তাড়াবার জন্যে। ছোট একটি টুলের ওপর ছুঁচ-সুতো, পেরেক, হাতুড়ি, কাঁচি। টেবিলের ওপর রাশিখানেক পুরোনো বই।

দরজা বন্ধ, আধো অন্ধকারে এসব চোখে পড়ল বিভাসের। ততক্ষণে বাইরে বৃষ্টি নেমেছে বড়ো বড়ো ফোঁটায়। আগুনে জল ঢাললে যেমন গন্ধ বেরোয়, প্রায় সেই রকম পোড়ামাটির গন্ধ আসছে। বাড়িটার পুরনো দেয়ালে মাথা কুটছে বাতাস।

প্রৌঢ় নিবিষ্ট মনে কলকেতে আগুন দিয়ে ফুঁ দিতে লাগলেন। তারপর পুরনো ময়লা একটি গড়গড়ায় কলকে বসিয়ে বার কয়েক টেনে মুখ তুলে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমার নিবাস?

বিভাস বলল, রায়পাড়ায় থাকি।

ভদ্রলোক চোখ তুলে এবার আপাদমস্তক দেখলেন বিভাসের। গড়গড়ার নল ধরা হাতের আঙ্গুলগুলি অস্থিরভাবে নড়াচড়া করতে লাগলেন আর এক হাতে তক্তাপোষের ময়লা চাদর জড়িয়ে ধরলেন মুঠো করে। বললেন, রায়পাড়ায়? তুমি, তুমি ভুবনের বাড়িতে থাক?

ভুবন? ভুবন কে? অবাক হয়ে তাকাল বিভাস। বলল, কার কথা বলছেন?

ভদ্রলোক নিজেই মাথা নেড়ে বসলেন, বুঝেছি বুঝেছি, তুমিই সেই, সম্প্রতি এসেছ আঁচনায়।

বিভাস বলল, এক বছর হয়ে গেছে।

ও-ই হল। এক বছর আর কটা দিন! এস, এখানে এসে বস।

তক্তাপোষের ওপর জায়গা করে দিলেন। বিভাস বসল। বাইরে ঝড়টা প্রবল হয়ে উঠেছে। এ ঘরের পুরনো জানালা ভেদ করে জলের ধারা মেঝেতে আসছে গড়িয়ে।

ভদ্রলোক বার কয়েক নল টেনে বললেন, ভুবনেশ্বরীর কথা বলছিলাম, তুমি যে-বাড়িতে থাক সেই বাড়ির গিন্নী ভুবন, পদ্মর মা।

তারকেশ্বরের স্ত্রীর কথা বলছেন। বিভাস বিস্মিত হয়ে বলল, ও!

আপনার নাম ?

ভদ্রলোক হাসলেন। গ্রুটি তিনেক দাঁত নেই সামনে। বললেন, জগদীশ চক্রবর্তী, রাঢ়ীয় শ্রেণী বন্দ্যো বংশ, তিন পুরুষের চক্রবর্তী। তুমি যা ভাবছ, তা নয়। ওরা আমার জ্ঞাতি-গোষ্ঠীর কেউ নয়। গাঁয়ের মানুষ, চিরদিনের চেনা। ভুবন ভালো আছে ?

কেমন একটু ছিটগ্রস্থ বলে মনে হচ্ছিল জগদীশকে। তারকেশ্বরের কথা একবারও জিজ্ঞাসা না করে শুধু ভুবনেশ্বরীর কথাই জিজ্ঞেস করছেন, ভুবনেশ্বরীর কথাই বলছেন। বিভাস বলল, বোধহয় ভালোই আছেন।

জগদীশ বললেন, ঠিক করে বলা যায় না, না ? বোঝা খুব মুশকিল না ? ওই রকম, এক অদ্ভুত জাতের মেয়ে।

মেয়ে ? ভুবনেশ্বরী এখনো মেয়ে ? জগদীশ বললেন, কখনো কথাটথা বলেছ ?

—খুব কম। তবে, হয় বৈকি !

জগদীশ প্রায় ছেলেমানুষের মতো জিজ্ঞেস করলেন, হাসে টাসে একটু ?

কই, ভুবনেশ্বরীকে কোনদিন হাসতে দেখেছে বলে তো মনে পড়ে না। বিভাস বললে, মনে পড়ছে না। আপনাদের খুব চেনাশোনা বুঝি ?

—ছোট কাল থেকে। কতদিনের কথা আর। এই ধর না, এটা বাংলার তেরশো…

বিভাস বলল, সাতান্ন সাল।

জগদীশ আঙ্গুলের কর গুণে বললেন, সাতান্ন তো ? আচ্ছা, তেরশো দুইয়ে আমার জন্ম, বারো সালে ভুবন জন্মেছিল। তা হলে পঁয়তাল্লিশ হল ভুবনের। এই সেদিনের কথা।

আর এই সেদিনের মধ্যেই জগদীশ পঞ্চান্নতে পোঁছেছেন, চুল পেকেছে, দাঁত পড়ে গিয়েছে।

জগদীশ তক্তাপোষ থেকে নেমে দেয়ালের গায়ে একটি হাঁড়ির মধ্যে কী যেন নেড়ে দেখলেন। বিভাস দেখল, নারকেলের মালায় লাল নীল হলুদ রং গোলা রয়েছে ওখানে। গুটি কয়েক তুলি সাজানো রয়েছে একটি থান ইটের ওপর।

জগদীশ নিজেই বললেন, কাগজের মণ্ড তৈরি করছি। পুতুল তৈরি করব।

তারপর টেবিলের কাছে গিয়ে বললেন, এইখানে বসে ছেলেবেলায় লেখাপড়া করতাম, আর এই জানালায় ভুবন আসত। তখন বড্ড দুষ্টু মেয়ে ছিল তো। পড়তে দেবে না, লিখতে দেবে না, ঘরে ঢুকে সব অগোছালো করে দেবে। কিন্তু কিছু বলার যো ছিল না। কাছেই তো ওদের বাড়ি, জানালা খুললে দেখা যায়। আর তারকেশ্বর আসত, আমার ছেলেবেলার

বন্ধু, ভালো ছেলে, সাত চড়ে কথা ফোটে না মুখে। আমাকে আর ভুবনকে দেখত চুপচাপ বসে। তারপর…।

বিভাস গল্প শোনার মতো তন্ময় বিস্ময়ে শুনছিল জগদীশের কথা। জগদীশ থামলেন। ঝড়ের তান্ডব সমান তালে চলেছে বাইরে। ছাদের টালি চুইয়ে, কড়িকাঠ বেয়ে, দেয়াল গড়িয়ে জল পড়ছে ঘরের মধ্যে। মেঝেটা ভিজে গিয়েছে। টেবিলে তক্তাপোষেও জল পড়ছে।

জগদীশ মাথা গুঁজে কাগজের মণ্ড ছাঁকতে বসলেন।

বেশ খানিকক্ষণ চুপচাপ করে কাগজের মণ্ড ছাঁকলেন জগদীশ। উৎকর্ণ হয়েছিল বিভাস। মনে হল, জগদীশ যেন কী সব বলেই চলেছেন, ঝড়ের শব্দে ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। সে বুঝি যোগাযোগ রাখতে পারছে না আগের কথার।

বুড়ো মানুষের এমন কথা এর আগে কোনদিন শোনেনি বিভাস। শুনে যেন তারো মনটা খারাপ হয়ে গেল। অথচ কৌতূহলও হল। আপন মনে মাথা নেড়ে, নিভে যাওয়া গড়গড়াটা টানলেন কয়েকবার।

বারান্দার দরজাটা নড়ছে। যেন কেউ ঠেলছে বাইরে থেকে। ধাক্কা দিচ্ছে বাতাস, খ্যাপা ঝড় তার কাঁধ দিয়ে আঘাত করছে, লণ্ডভণ্ড করতে চাইছে ঘরের মধ্যে ঢুকে।

জগদীশ উদ্দীপ্ত অনুসন্ধিৎসু চোখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন তারপর আবার বললেন, ভুবন যেদিন তারকেশ্বরের কথা বলতে এল, সেদিনও এই রকম ঝড়। কাঁদতে কাঁদতে এসেছিল, দরজা ধাক্কাবার কথা ওর মনেই ছিল না। খালি শরীর দিয়ে ঠেলছিল। আমি ভেবেছিলাম 'বাতাস। ঝড় এরকম করছে। আমি তখন লুকিয়ে তামাক খাবার যোগাড়ে ব্যস্ত। তখনো আমাকে লুকিয়ে তামাক খেতে হত। কিন্তু সন্দেহ হল, ঝড় নয়, একটা ভারী জিনিষ দরজায় চেপে আছে। খুলে দেখলাম, ভুবন। চৌদ্দ বছরের মেয়ে, তখনকার দিনে কম তো না, যুবতী মেয়ে সে। বলল, তারকেশ্বর ওকে বিয়ে করতে চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে। তখন তারকেশ্বর ডাক্তারি পাশ করে এসেছে। ভুবনের বাবা-মা'র কাছে হাতে চাঁদ পাওয়ার মতো ব্যাপার সেটা। আমি এক এণ্ট্রাস পাশ করা ছেলে, অবস্থাও এমন কিছু ভাল নয়। কিন্তু তারকেশ্বর? থ' হয়ে গেলাম একেবারে। তারকেশ্বরের এ মতলব তো একদিনের জন্যও আমি টের পাইনি। বরং ওকে বরাবর একটা ভালো-মানুষ, গোবেচারা বলেই মনে হয়েছে। আসত, আমাকেই বলতে হত, 'তারক আমি ভুবনকে বিয়ে করব।' ছেলেমানুষ হলে কী হবে। আমি তখন প্রেম করতে শিখে গেছি। মনে হত, তারকেশ্বর ওসব বোঝে না, হাঁদার মতো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে থাকত। কেবল ভুবন আমাকে বলত, 'রায়-বাড়ির তারকটা ও-রকম করে তাকায় কেন বল তো?' আমি বলতাম, 'কেমন করে

আবার তাকায় ?'—'যেন গিলতে চায়।' আমি বলতাম, 'যা, তোর সবটাতেই বাড়াবাড়ি ভুবন। তারক ওই রকমই।' ভুবন বলত, 'মোটেও নয়কো। তারক কথা বলে না কেন ? খালি তাকিয়ে থাকে হাঁ করে, নিবিষ্ট চোখে যেন কী দ্যাখে, আমার অস্বস্তি হয়।' ভুবন। মেয়ে, এ বিষয়ে ওরই জিত। কিন্তু, আমি একটুও ভাবতে পারিনি, তারকেশ্বর কবে থেকে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে গেছে, কবে থেকে সে মনে মনে তৈরি হয়েছে, এমন কী মনে মনে রেগেছে, ফুঁসেছে। কিন্তু সময়ের অপেক্ষায় ছিল।

ভুবন ভীষণ কাঁদতে লাগল। আমি যেন তখনো বিশ্বাস করতে পারলাম না। ভুবনকে বললাম, 'ভয় পাসনি ভুবন।' ভুবন তাতে সান্ত্বনা পেল না। তারককে শাপমন্যি করতে লাগল, গালাগালি দিল। আমাকেও বকল! বলল সেদিনই যেন ওর বাবাকে গিয়ে আমি বিয়ের প্রস্তাব করি।

…ঝড় থামলে ওকে বাড়ি পাঠিয়ে আগে আমি তারকেশ্বরের কাছে গেলাম। তারকেশ্বরের মুখের দিকে তাকিয়ে আমার বুকের ভেতরটা কী রকম করে উঠল। বরাবরই সে কথা কম বলত, তাকিয়ে থাকত। কিন্তু সেদিনের তারকেশ্বরের মুখে কী যেন ছিল, আমি আর কিছু জিজ্ঞেস করতে পারলাম না। তারকেশ্বর নিজেই বলল, 'আমি বিপিনকাকার মেয়েকে বিয়ে করব।'

ভুবনের বাবার নাম বিপিন চাটুয্যে। বললাম, 'শুনেছি। ও-বেলা আসবি আমাদের বাড়িতে ? কয়েকটা কথা ছিল।'

তারকেশ্বর বলল, 'যাব'।

বিকেলে ভুবন তখন আমাদের বাড়ির ভিতরে মা-কাকীমাদের সঙ্গে কথা বলছে। তারক এল। আমার ঘেন্না করছিল, অপমানবোধ হচ্ছিল কোনো কথা বলতে। কিছু বলব-বলব করেও বসেছিলাম চুপচাপ। ভুবন এল বাইরের ঘরে। তারককে দেখেই, রাগ হয়ে গেল ওর। পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল ভুবন। আমরা তিনজনেই চুপচাপ। বুঝতে পারলাম, আমার আর তারকের বয়স হয়েছে, আমাদের কেউ আর ছেলেমানুষ নই। তবু আমি না বলে পারলাম না, 'তারক, একটা কথা বলতে ভাই আমার লজ্জা করছে, তবু না বললে নয়।'

তারক একপিঠ চুল-ছড়ানো ভুবনের দিকে তাকিয়েছিল। এবার আমার দিকে তাকিয়ে বলল, 'কী কথা ?' বললাম 'ভুবনকে তুই বিয়ে করতে চাস্‌নে।'

তারক বলল, 'কেন ?'

বললাম, 'কেন তা কি জানিস্‌ নে ? তোকে কতবার বলেছি। সব জেনে শুনে—।'

তারক জবাব দিল, 'কোনো জানা-শোনার কথা শোনা আমি দরকার বোধ

করি নে। আমি যা মনে করেছি, তাই করব।'

চোদ্দ বছরের ভুবন এলোচুলে ঝাপটা দিয়ে, দুচোখে আগুন নিয়ে তাকাল তারকের দিকে। বলল, 'জোর করে বে' করবে তুমি আমাকে?'

তারক বলল 'বে'র আবার জোরাজুরির কী আছে? সবাই যেমন ভাবে করে, সেই ভাবেই করব।'

আমার হাত-পা শক্ত হয়ে উঠল। সেই হাবাগোবা গো-বেচারাটাকে ও ভাবে কথা বলতে দেখে, মেরে হাড় ভাঙতে ইচ্ছে করল আমার। বললাম 'সংসারে মেয়ের অভাব নেই। তুই যেখানে খুশি বে' করগে—কে তোকে বারণ করেছে?'

পাঁচ বছর কলকাতায় থেকেই বোধহয় কথা শিখে এসেছিল তারক। বলল, 'যেখানে ইচ্ছে হল সেইখানেই তো দেখছি বারণ করছিস তুই।'

বললাম, 'হ্যাঁ এখানে বারণ। ভুবনকে নয়।'

ভুবন বলে উঠল, ডাক্তারি পাশ করেছ বলে একবারে ন্যাকা হয়ে গেছ, না? কিছু বোঝ না? তোমাকে আমি ঘেন্না করি।'

দেখলাম, তারকের কটা চোখ জ্বলছে ধক্‌ধক্ করে। কিন্তু সেটা লুকিয়ে থাকা চিতাবাঘের মতো। কোনো জবাব না দিয়ে হঠাৎ তারক বেরিয়ে গেল। আমরা দেখলাম সে ভুবনদের বাড়ির দিকেই গেল।

পরে শুনলাম, এক বছরের মধ্যে সে বিয়ে করবে ভেবেছিল, সে ইচ্ছে আর নেই। তিনদিন বাদেই বিয়ের দিন রয়েছে, সেইদিনই বিয়ে করবে সে।

জগদীশ চুপ করে তক্তাপোষের ময়লা চাদরটা হাত দিয়ে চটকাতে লাগলেন। একটি শুকনো মুচকুন্দের পাঁপড়ি ছিঁড়ে ফেললেন। আবার বললেন, অনেকদিন বাদে একটি বলবার লোক পেয়ে সবই বলে ফেললাম। কিছু মনে করো না যেন।

তারপরে কী চিন্তা করে হঠাৎ বলে উঠলেন, ও, হ্যাঁ হ্যাঁ, ঈশেন, ঈশেন পাগলা আমাকে তোমার কথা বলে গেছে। তোমাকে তার ভাল লেগেছে। কিছু না জেনে শুনেই, আমার ভাল লাগল বলে এত কথা বললাম।

বিভাস বলল, তারপর কী হল?

তারপর? ভুবনের বিয়ে হয়ে গেল তারকের সঙ্গে। মরবার সাহস ভুবনের ছিল না। ভগবান বাঁচিয়ে দিয়েছে। শুধু কান্না আর আমাকে ধিক্কার-দেওয়া ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না ওর। ভুবনকে নিয়ে পালিয়ে যেতে পারতাম। কিন্তু সেটা এখন মনে হয়, তখন একবারও মনে আসেনি। বোধহয় দিনকালের জন্য। বিপিনকাকার একটা মান-সম্মান আছে। তাই চুপ করে থাকা ছাড়া উপায় ছিল না। কিন্তু আমি একবারও বিপিনকাকাকে গিয়ে মুখ ফুটে বলতে পারিনি, 'বিপিনকাকা, ভুবনকে আমি বিয়ে করব।' কারণ, তারক পাশ-করা ডাক্তার, তিনি রাজি হবেন না। শুধু অশান্তি ভোগ

করবেন। আমার সমবয়সী এক কাকীমা ছিলেন। শুধু তিনি বলেছিলেন, কী হল জগদ্ শেষে বন্ধুর সঙ্গে বে' দিয়ে দিলে ভুবনের?

আর তারককে কিছু বলবার লোক কেউ ছিল না। তার এক দাদা, আর এক ভাই ছিল সংসারে। সে যে কী নোংরা জায়গা, জঘন্য বাড়ি, আর পরস্পরের সঙ্গে কী শত্রুতা। কিন্তু সে সব ভেবে বা আর কী হবে। তবে গোলমালটা কোথায় হল জান?

বিভাসের দিকে তাকালেন জগদীশ। বড় বড় চোখ দুটিতে দৃষ্টি তেমনি উদ্‌ভ্রান্ত জগদীশের। কিন্তু কয়েকটি দাঁতহীন অন্ধকার ফাঁকে তার হাসি দেখে বিভাসের বুকের মধ্যে কেমন করে উঠল। জগদীশকে একেবারে অন্যরকম দেখাচ্ছে। যেন কাঁদতে গিয়ে হেসে ফেলেছেন। বললেন, গণ্ডগোলে পড়লাম নিজেকে নিয়ে। সেই থেকে খালি বসে থাকি, খালি বসে থাকি। যতই ভেবেছি কাজকর্ম করব, আঁচনা ছেড়ে চলে যাব, কোনটাই পারিনি। ভাবতে ভাবতেই এতদিন চলে গেল। সংসারে কত জগদীশ কত ভুবনেশ্বরীকে বিয়ে করতে চেয়েছে, পায়নি, কিন্তু কে এমন অকর্মণ্য হয়েছে? তা' নয়, মানুষটা বড্ড ছোট আমি, তাই আঁচনাটুকুই ছাড়িয়ে যেতে পারলাম না। বিয়ে? তা-ই কি করতে পারলাম? কিছু ধান-জমি আছে, ভায়েরা দুটি খেতে-পরতে দেয়, ব্যস। ঘেন্না হয়, লজ্জাও হয় কিন্তু এখন ঘরে থাকার নেশায় ধরে গেছে! ভাইপো-ভাইঝিদের নিয়ে থাকি। ছোটদের মন রাখাই কাজ এখন। কাগজের পুতুল গড়ি। আমের কলম তৈরি করি। মৌমাছির চরিত্র, পিঁপড়েদের সমাজবোধ, বনের পশুদের কথা পড়তে ভাল লাগে। আর একটু সেলাই-ফোঁড়াই করি। বৌদিরা তাদের ছেলেমেয়েদের জামা-প্যান্ট সেলাই করতে দেয়। আবার তাদের ছেলে-মেয়েদেরটাও আছে এখন। বুঝতে পারছ কোথায় গণ্ডগোল হয়ে গেছে?

আবার হাসলেন জগদীশ। বিভাস তাকিয়ে থাকতে পারল না সেই মুখের দিকে। তার বড়বৌদির ছেলেটি যখন শুকনো চোখে দুধের দাঁত-পড়া মুখে হাঁ করে কাঁদত, তখন এই রকমই দেখাত যেন। তখন বিভাসের হাসি পেত। আর এখন তার বুকটার মধ্যে কী রকম বিশ্রী কষ্ট হতে লাগল। আর বৃষ্টিটা কী প্রবলভাবে ঝরছে! ঝড় থেমে গেছে; শুধু বৃষ্টি। গর্জন তখনো আছে আকাশের। বৃষ্টির ফোঁটাগুলি যেন তার বুকে ছুঁচের মতো এসে বিঁধছে।

ঘরের মেঝে ধুয়ে গেছে একেবারে। শীত করতে লাগল বিভাসের। ছাদ চুঁইয়ে জল পড়ে তার জামাও জায়গায় জায়গায় ভিজে গেছে।

জগদীশ উঠে গিয়ে তামাক সাজতে বসলেন আবার। বললেন, কিন্তু তারকটা এতবড় বোকা, শুনলে অবাক হয়ে যাবে। ছেলেটা, ভুবনের ছেলে তাপসটাকেও শেষ করেছে। ভুবনকে তো ভাল বাসেনি কোনদিন, আর

সন্দেহ, অবিশ্বাস সব সময়। শোধ নিতে গেল ছেলেটার ওপর। ছোট বয়সে ছেলেটার ভয়ংকর কাশি হল, কাশতে কাশতে ছেলেটা গজ-চোখো হয়ে গেল, আর কান গেল কালা হয়ে। চিকিৎসা করলে না। ভুগে ভুগে সেটি একটা কী জবুথবু হয়ে গেল। ছেলেবেলা থেকে কানে শুনতে পেত না বলেই, ভাল করে কথা বলতে শিখল না। বুদ্ধিসুদ্ধির অভাবে জোর করে দুটি কথা বলতে পারে না। এ কেমন ধারা প্রতিশোধ বল দিকিনি। তোরই ছেলে তো। শুনেছি, মেয়েটাকে নাকি খুব ভালবাসে। ছেলের ঘটা করে বিয়ে দিয়েছে। শুনি, ভুবনের সাড়া কেউ পায় না, কারুর সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ হয় না।

হঠাৎ একটি হুঁ দিয়ে চুপ করেন জগদীশ। বিভাসের মনটা কেমন এক অপরিচিত বিস্ময়ে, ভয়ে বোবা হয়ে গেল! বৃষ্টির শব্দটা কখন যেন ধরে এল। মেঘ ডেকে উঠল গুরুগুরু করে। আসবার সময় যেমন করে ডাকে মেঘ, যাবার সময়ও ডাক দিয়ে যায় তেমনি করে! তারপরে একেবারে নিঃশব্দে, এক ফোঁটা বৃষ্টিও বুঝি পড়ছে না বাইরে। কেবল ঝিঁ ঝিঁর চিৎকার।

বিভাস বলে, চলি।

জগদীশ উঠে এলেন। দরজা খুলে কয়েক মুহূর্ত বিভাসের দিকে তাকিয়ে থেকে বললেন, এস। ইচ্ছে হলে অবোর এস, কেমন?

বিভাস বলল, আচ্ছা।

॥ ছয় ॥

বারান্দা দিয়ে নেমে কাদায় পা দিল বিভাস। পায়ের পাতা ডোবা পথের যতো ধুলো, বৃষ্টি পড়ে সবই কাদা হয়ে গেছে। মাটি নরম বলেই ধুলো বেশি। তাই বৃষ্টি পড়ে ধুলোর নিচের স্তরের মাটিও গেছে ভিজে। গোরুর গাড়ির চাকা চলা গর্তগুলিতে জল জমে আছে। সবই ভেজা। মাটি, গাছ, পাতা, আকাশটাও ভেজা। আর সব কিছুরই রঙ আরো গাঢ় দেখাচ্ছে। কেবল কৃষ্ণচূড়ায় চোখ ঝলসানো আগুনের সমারোহ নিষ্প্রভ হয়েছে একটু। ঝড়জলে বাসা-ভাঙা পোকা-পতঙ্গের জন্য কাক-শালিকেরা বেরিয়ে পড়েছে। যে কাক-শালিকের বাসা ভেঙেছে, তারা বাসা-বাঁধা নিয়ে লাগিয়েছে চেঁচামেচি। প্রচণ্ড গরমের পর এই ভেজা আরামটুকু ভোগ করবার জন্যে সাপ বেরুবে এখন, দু-একটা পোকা-মাকড়ও জুটবে, পাখীপাখালিও জুটতে পারে এক আধটা। পশু-পক্ষী কীট-পতঙ্গ সকলেই কেউ না কেউ, কাউকে না

কাউকে খায়। মানুষও কি খায়? তারকেশ্বরের কাহিনী শুনে মনে হয়, মানুষের জগতেও কোথাও সেই খাওরাখায়ি নানান রূপে রয়ে গেছে। জিভ দিয়ে চেটে, দাঁতে চিবিয়ে মানুষের ভাত খাওয়া নয়, তার মধ্যে কোথায় যেন একটি সৌন্দর্য আছে। চটকে, মেখে, গরাসে গরাসে ভাত চিবিয়ে খিদে-পাওয়া মানুষের ভাত খাওয়া। কখনো বেশি সেদ্ধ করতে নেই, একটু শক্ত শক্ত থাকবে। যাতে চিবিয়ে খাওয়া যায়, যাতে মুখের লালা বেশি হয়, শক্ত ভাতের রসের সঙ্গে মিশিয়ে তাতে পুষ্টি বাড়ায়। বলতেন। বাবা আর গরম গরম সেই ভাতের কথা মনে করে জল আসত বিভাসের জিভে। মানুষের খাওয়া দেখতে ভাল লাগে বিভাসের।

এ ব্যাপার ঠিক সেইরকম নয়। খানিকটা যেন টিকটিকির মতো নির্বিবাদে পোকাগুলি যখন দেয়ালে বেড়াতে থাকে, টিকটিকি তখন দূরে থেকে তাকে দেখে। দেখে, বুক চেপে নিঃশব্দ এগোয়। গোপনে, খুব গোপনে লুকিয়ে লুকিয়ে আসে, তারপর আচমকা কামড়ে ধরে গিলে ফেলে।

তারকেশ্বরকে কেন এরকম মনে হয় বিভাসের। মাকড়সা ও টিকটিকির মতো। একদিন বিভাসের কোলের ওপর বসে-থাকা একটা মাছিকে, তারই গা বেয়ে বেয়ে আসা একটি মাকড়সা খেয়ে ফেলেছিল। এখানে খাবারের সন্ধান মানেই যেন গুপ্ত ঘাতকের একটা ক্রুর, গোপন হিংস্রতা। সাপও এইরকম। যারা পায়ে হাঁটে, তাদের মধ্যে এই রকমের তফাত। বুকে-হাঁটাদের গোপন হিংস্রতার মধ্যে কী একটি বিভীষিকাময় রহস্যও যেন মিশে থাকে।

কিন্তু তারকেশ্বর সম্পর্কে এরকম কথা মনে হয় কেন? জগদীশ নিজে তো একবারও তারকেশ্বরকে ভয়ংকর বলেননি। কিন্তু তার কথা শুনে বিভাসের এরকম মনে হয় কেন? ভুবনেশ্বরীকে নতুন করে দেখবার জন্য কৌতূহল হয় তার। কষ্ট হয় কেন যেন। তাপসের কথা ভেবে মনটা টনটন করে। যারা তার কেউ নয়।

কিন্তু একি কখনো সম্ভব, যার স্ত্রী, যার ছেলে, সে এত নিষ্ঠুর, হিংস্র আর যত কষ্ট পায় বাইরের মানুষ বিভাস। জগদীশ তো পাগল হতে পারেন। ব্যবহারটা তো প্রায় পাগলের—। থমকে যায় বিভাস। জগদীশের চোখ দুটি মনে পড়ে, পাগল নন কোনক্রমেই। বদমায়েস? তাও নয়। এক ভুবনেশ্বরীর শোকেই লোকটার সব গণ্ডগোল হয়ে গেছে!

মনে হয় মিথ্যে নয়, তারকেশ্বরের মধ্যে বুকে হাঁটাদের শিকার ধরার একটা সহজাত নিপুণতা যেন কোথায় লুকিয়ে আছে। ইউনিয়ন বোর্ডের ব্যাপারটা তো প্রায় সেই রকমের।

বাড়ির চত্বরে ঢুকে বিভাসের হঠাৎ পাতালপুরীর সেই বাড়িটার কথা মনে পড়ে। রূপকথার রাজপুরী। অজগরটা যেখানে মাথায় মণি নিয়ে

ঘুরে বেড়ায়। মুখে তার রক্তের দাগ, গোটা বংশটাকে সে খেয়েছে। খায়নি শুধু রাজকন্যাকে। রাজকন্যাটা তবে কে? ভুবনেশ্বরী? কিন্তু জগদীশ তো আর কোনদিন রাজপুত্রের বেশে এসে তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে পারবে না।

বিভাস একটু হাসল ঠোঁট টিপে। কী সব অদ্ভুত চিন্তাই আসে তার মাথায়। ঝড়ের কাজ সব এলোমেলো করে দেওয়া। জগদীশ চক্রবর্তী নামে এক ভদ্রলোকের সব এলোমেলো করেছে। সমস্ত ব্যাপারটা তো তাই মনে হচ্ছে।

পুরনো বাড়ি ডিঙ্গিয়ে, নতুন বাড়ির পাশ দিয়ে বাগানের দিকে পা বাড়াতেই চমকে উঠল বিভাস। দেখল পদ্ম দাঁড়িয়ে আছে। চোখাচোখি হওয়ামাত্র পদ্ম যেন ধমকে উঠল, পাগল আপনি, না?

পদ্মর কথায় এখন আর বিশেষ অবাক হয় না বিভাস। কিন্তু পাগলের কী লক্ষণ সে দেখতে পেল? বলল, কেন?

হাসছিলেন কেন একলা-একলা?

হেসেছিল বিভাস? কখন, মনে পড়ছে না তো? আর হেসেই যদি থাকে, তাতে পাগল বলার কি আছে। কিন্তু পদ্মর দিক থেকে সে চোখ ফেরাতে পারল না। জগদীশের কথাগুলি মনে পড়ছে তার। এই মেয়েকে তারকেশ্বর সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন এ বাড়িতে। নিজেও বিভাস তাই দেখেছে। কেন?

পদ্ম বলল, কী দেখছেন?

বিভাসের মনে হল পদ্মর চেহারা প্রায় অবিকল তারকেশ্বরের মতো দেখতে। তারকেশ্বরের মতোই রঙ ফরসা, মুখখানি প্রায় গোল। চিবুকের অংশটি সরু। চোখ দুটি কটা। চুলে বড় বড় কোঁচ। চেনাশোনা যে কোনো লোক দেখলে বলে দিতে পারে এ মেয়ে আঁচনার তারকেশ্বর রায়ের। সেই জন্যই বোধহয় তারকেশ্বর পদ্মকে সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। তাপস ভুবনেশ্বরীর মতো দেখতে। পদ্মর পিতৃত্বে বোধহয় তারকেশ্বর নিঃসংশয়।

পদ্ম প্রথমটা বিভ্রান্ত হয়েছিল তার প্রতি বিভাসের স্থির দৃষ্টি দেখে। কিন্তু যে মুহূর্তে বুঝতে পারল বিভাস তার দিকে তাকিয়েও ঠিক তাকে দেখছে না, তখন তার সম্বিৎ ফিরল। একটা অন্যরকম সন্দেহ করে খিড়কির দরজা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে সে বিদ্যুতকে ডাকল, বউদি তাড়াতাড়ি এদিকে এস।

বিদ্যুৎ বোধহয় আসছিলই। ডাক শুনে আরো তাড়াতাড়ি এল। পদ্ম রাগ-রাগ ভয়-ভয় গলায় বলল, দ্যাখ, এত বেলায় কোত্থেকে যেন নেশা করে এসেছে। কী রকম করে তাকিয়ে আছে আমার দিকে।

এতক্ষণে বিভাসও সাড় ফিরে পেয়ে বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেল যেন একটু। বিদ্যুতের দৃষ্টি আশ্চর্য তীক্ষ্ন। বিভাসের বুকের ভিতর

পর্যন্ত যেন দেখতে পাচ্ছে।

বিদ্যুৎ কি নেশার খোয়ারি যাচাই করছে বিভাসের না আর কিছু? সে কি কারণ খুঁজছে, কেন বিভাস অমন করে তাকিয়েছিল পদ্মর দিকে?

পাছে বিদ্যুৎ বিশ্বাস করে বসে তাই যেন তাড়াতাড়ি বলল বিভাস, না না, নেশা করব কেন? আমি নেশা করি নে তো।

বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণে একটু অস্পষ্ট হাসির রেখা দেখা গেল। বলল, সে তো বুঝতেই পারছি। কিন্তু এত বেলায় এলেন কোত্থেকে?

রুগী দেখতে গেছলুম। পথে বৃষ্টির জন্য দাঁড়িয়ে ছিলুম এক জায়গায়।

পদ্ম আবার মনে মনে বিভ্রান্ত হল। বউদির অস্পষ্ট হাসি, বিভাসের চাপা চাপা লজ্জা দেখে, চাউনির অর্থটা সে ঘুলিয়ে ফেলল। ঠোঁটে গালে চোখে তার দেখা দিল রঙের আভাস। বলল, রুগীকে মেরে এসেছেন বোধহয়?

বিভাস মুখ তুলে রাস্তার দিকে তাকিয়ে যেন একবার রুগীটিকে দেখে নিল। বলল, এতক্ষণে বোধহয় মরে গেল।

জবাব শুনে পদ্ম হেসে উঠল খিলখিল করে। বলল, ইয়ার্কি হচ্ছে, না?

বিভাস পদ্মর সঙ্গে ইয়ার্কি দেবে না। বলল, সত্যি, মরে গেল বোধহয়। মরতোই। বলে সে একটি নিশ্বাস ফেলল।

বিদ্যুৎ কিন্তু অপলক চোখে তাকিয়েই ছিল। তারও ভাবনা ঘুলিয়ে গেল যেন। বিভাসকে আজ একটু অন্যরকম লাগছে। চোখে মুখে তার একটা নতুন কৌতূহলের ছাপ। সে কি রুগীর জন্য, না কি আর কিছু, সেটা ধরতে পারছে না।

বিভাস আবার বলল, তবে এখন যারা মড়া বইবার মই কাটছে, তারা নিশ্চয় বলাবলি করছে, কমপেণ্ডারবাবুটা মেরে ফেলল লোকটাকে।...আচ্ছা, তাপসবাবু বেরিয়ে গেছেন?

কথাটা সে পদ্ম আর বিদ্যুতের মাঝামাঝি জায়গায় চোখ রেখে জিজ্ঞেস করল। আর অবাক হয়ে চোখা-চোখি করল বিদ্যুত আর পদ্ম। এক কথা বলতে বলতে হঠাৎ তাপসের খোঁজ কেন? কোনদিন যার খোঁজ করে না বিভাস।

বিদ্যুৎ জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ তার খোঁজ কেন?

বিভাস বিব্রত হয়ে উঠল বিদ্যুতের প্রশ্নের সামনে। জগদীশের কথা শুনে নতুন করে তার সবাইকে দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু সে কথা বলা যায় কেমন করে। এক কথায়, কত প্রশ্ন, কত কথা এসে যেতে পারে। সে বলল, না, এমনি জিজ্ঞেস করলুম। দেখাটেকা হয় না তো।

পদ্ম এগিয়ে গেল বিভাসের দিকে। যেন আরো ভাল করে দেখতে চায়

বিভাসকে! তারপর হেসে বলল, ভয় পেয়েছেন ওই মড়াটার জন্যে, না?

এবার বিভাস একটু হাসল। বিদ্যুৎও হেসে বলল, তাই বোধহয় হবে। কিন্তু ওদিকে কোথায় যাচ্ছেন?

বাগানে। চানটা সেরে আসি।

পদ্ম বলে, ও মা, কী লোক গো! বেলা চারটে বাজে, আর কখন খাব?

বিভাস চমকে উঠে বলল, সে কি, তোমরা খাওনি?

কেন খাব?

কেন খাবে? কেন খাবে না পদ্মরা? এ তো বড় মুশকিলের কথা। ছি, ছি, তার জন্যে বসে আছে। বলল, না, না, এটা খুবই অন্যায়। তোমরা—

পদ্ম বলল, ন্যায় অন্যায় বুঝি আপনার কাছে শিখতে হবে। এখন খেতে আসবেন, না এরকম পাগলামি করবেন।

বিদ্যুৎ বলল, এই অবেলায় আর চান করতে হবে না। আসুন, জল দিচ্ছি, মুখ হাত ধুয়ে খেয়ে নেবেন।

বিভাস যেন তখনো একটু বিব্রত। পদ্ম ঠোঁট বেঁকিয়ে ভেংচে, বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে হাসল। বলল, ফের দাঁড়িয়ে রইলেন? চলুন।

বিভাস চলতে চলতে বলল, ও তাই তোমাদের মুখগুলো অমন শুকনা দেখাচ্ছিল।

পদ্ম ঠোঁট উল্টে বলল, সত্যি? দেখতে পাচ্ছিলেন?

বিদ্যুৎ আর পদ্ম দুজনেই হেসে উঠল। বিদ্যুৎ চুপি চুপি বলল পদ্মকে, আস্তে। বলে সে ঘোমটা টেনে দিল। ওরা দুজনে আগে আগে এগিয়ে গেল। বিভাস দাঁড়িয়ে রইল খিড়কির দরজার কাছে। কেমন করে যেন বিভাস এটা বুঝে নিয়েছে, বিদ্যুৎ আর পদ্মর সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া যায় না বাড়ির মধ্যে। তিনজনের বন্ধুত্বের মধ্যে এই অদৃশ্য বাধানিষেধগুলি আপনি আপনি আয়ত্ব হয়ে গিয়েছে বিভাসের। মনে হয়, এ সব ছলনা। যদিও ছলনাতে অভ্যস্ত নয় সে কোনদিন, তবু পদ্ম ও বিদ্যুতের সঙ্গে মেলামেশার ব্যাপারে কতকগুলি ব্যাপার তার রপ্ত হয়ে উঠছে।

কিন্তু বিভাসের গায়ের মধ্যে কি রকম শিরশির করতে থাকে পদ্ম আর বিদ্যুতের পায়ের দিকে তাকিয়ে। ধুপ করে না পড়ে যায় দুজনে। যা পিছল উঠোন! খিড়কির উঠোন হলেও সেটি নেহাত ছোট নয়। আর কটি মানুষই বা সারাদিনে কিংবা সারা বছরেই চলাফেরা করে। এতবড় বাড়িতে মাত্র তো কয়েকজনের বাস। উঠোনটা শ্যাওলা পড়ে পড়ে কালো হয়ে থাকে বারোমাস। মাঠের মধ্যে পায়ে চলা পথের মতো, উঠোনের কালো শ্যাওলার মধ্যে অস্পষ্ট একটি শানের রেখা দেখা যায়। বৃষ্টি পড়ে গোটা উঠোনটা এখন যেন সাক্ষাৎ মৃত্যুর মতো চক্‌চক্‌ করছে। কিন্তু তার ওপর দিয়েই

কেমন তর্‌তর্‌ করে চলে যাচ্ছে বিদ্যুৎ আর পদ্ম। আগে বিভাসও এরকম কোনদিকে লক্ষ্য না রেখে চলত। কলকাতার কলেজে পড়বার সময়, বর্ষাকালে একদিন স্টেশনে যাচ্ছিল সে তাড়াতাড়ি। তাদের গ্রামের অবিনাশ গাঙ্গুলীও যাচ্ছিল তার আগে আগে। অফিসের কেরাণী, গাড়ি ধরতেই হবে। বৃষ্টিতে ভেজা পথ পিছল ছিল। হঠাৎ ধুপ করে একটি শব্দ হল। বিভাস দেখল অবিনাশ পড়ে গিয়েছে। বিভাস ছুটে গেল তাকে তুলতে। অভ্যাসবশত অবিনাশ পান চিবোচ্ছিল।

বিভাস বলল, ইস্‌, পড়ে গেলেন। আসুন, উঠুন।

বলে সে হাত বাড়িয়ে দিল। অবিনাশ ডান হাতটা কোনো রকমে বাড়িয়ে দিল। বিভাস ধরে টান দিতেই অবিনাশ চিৎকার করে উঠল আ, আ মাগো, মেরে ফেলল গো!

বলেই পড়ে গেল মাটিতে মুখ গুঁজে। তারপর কাঁপতে লাগল থর্‌থর্‌ করে। তাড়াতাড়ি লোকজন ডেকে অবিনাশকে বাড়ি নিয়ে গেল বিভাস। মাত্র আধ ঘণ্টা বাদে, ডাক্তার আসবার আগেই মারা গেল অবিনাশ। পাছা, কুঁচকি, পাঁজর, হাতের কি সব হাড় নাকি ভেঙে গিয়েছিল তার। আরো নানারকম গোলমাল হয়ে গিয়েছিল শুধু ওই এক আছাড়েই। বিভাসের মনে এখনো কেমন একটা সংশয় থেকে গিয়েছে, সে অবিনাশকে ধরে টান দিয়েছিল বলেই লোকটা মরে গিয়েছিল কিনা। শুধু এই সংশয়ের জন্য একটা কথা সে কোনদিন প্রকাশ করেনি যে, অবিনাশের হাত ধরা মাত্রই অবিনাশ চিৎকার করে উঠেছিল। আর মুখ থুবড়ে পড়ে কেঁপেছিল। আর সেই থেকেই পিছলকে তার বড় ভয়।

পদ্ম আর বিদ্যুৎ দুজনেরই পায়ের গোছা ও গোড়ালি সুগঠিত, সুন্দর। পদ্মর গোড়ালিতে বাসি আলতার দাগ। বিদ্যুতের আলতা নেই। তার পুষ্ট গোড়ালিতে একটুও ফাটাফুটির চিহ্ন নেই। পিছল শানে দ্রুত-চলা সেই পা দেখে মুগ্ধ হওয়ারই কথা। কিন্তু বিভাসও যেন প্রায় দাঁতে দাঁত চেপে রইল। ধুপ করে একটা শব্দ হলেই হল। হাড় জোড়া-লাগানো তারকেশ্বরের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে। সদরের হাসপাতালে যেতেও সেই গোরুর গাড়ি। পথও একটুখানি নয়। আর সেই যন্ত্রণাকাতর চিৎকার? অসহ্য, ভীষণ অসহ্য লাগে বিভাসের। আর হাড়গোড় ভাঙা অবস্থায় মরার আগে একেকটা মূর্তি যে কি সাংঘাতিক রকম দেখতে হয়!

পদ্মর চাপা শাসানি শোনা গেল, বোকার মতো দাঁড়িয়ে আছেন কেন, আসুন না!

বিভাসও ততক্ষণে নিশ্চিন্ত হয়ে গিয়েছে নিরাপদে তাদের বারান্দায় উঠতে দেখে। মাঝখান থেকে একটা ভয়ংকর উত্তেজনা ও দুশ্চিন্তায় কাটল তার কয়েকটি মুহূর্ত। কেন যে তার মাথায় এসব জট পাকায়, ভেবে পায় না।

পা টিপে টিপে উঠোন পার হল সে। যে ঘরটা দিয়ে সামনের উঠোনের দিকে, রান্নাঘরের বারান্দায় যেতে হয়, সেই ঘরেই দোতলায় ওঠার সিঁড়ি। মাত্র ছ-ধাপ উঠে সিঁড়িটা বাঁক নিয়েছে। তারপরে আরও কতগুলি বাঁক নিয়েছে কে জানে। কেননা, সেকেলে বাড়িতে দোতলায় উঠতেই তিন চারটে বাঁক থাকত। ডাকাতদের হামলা করবার অসুবিধের কথা মনে রেখে এই ধরনের সিঁড়ি তৈরি হত।

আজ জগদীশের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর তার কৌতূহল আরও উগ্র হয়েছে। বিশেষ ভুবনেশ্বরীর কথা মনে করে। এই সিঁড়ির উপরেই ভুবনেশ্বরী আছেন। তারকেশ্বর আছেন। হয়তো তাপসও আছে। ভাবতে অবাক লাগে, না? কে কোন্ ঘরে আছে, কি করছে, কিছুই বোঝবার উপায় নাই। তাপসের সঙ্গে ভুবনেশ্বরীর কেমন কথাবার্তা হয়, তাও কোনদিন শোনেনি বিভাস। অথচ এক বছরের ওপর সে এসেছে! আর আজ জগদীশের সঙ্গে এত কথা হয়েছে।

বিভাস বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পদ্ম ঘটিতে করে জল নিয়ে এসে দাঁড়াল কাছে। এই অবেলায় তার আদখোলা বিনুনী লুটোচ্ছে কাঁধের পাশে। বলল, নিন, হাত-মুখ ধোন।

ওদিকে রান্নাঘরে দেখা যায়, বিদ্যুৎ ভাত বাড়ছে বিভাসের। হাত মুখ ধুয়ে, নিজের কাঁধ থেকেই গামছা দিল পদ্ম। মুছতে মুছতে বিভাস বলল, তোমাকে তোমার বাবা খুব ভালবাসেন, না?

থেকে থেকে এই ধরনের প্রশ্নের কোনো মাথামুণ্ডু পায় না পদ্ম। বলল, ভালবাসবে না তো কী করবে?

বিভাস বলল, না, তা বলছিনে। বলছিলাম তোমাকেই উনি সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন।

তাতে কি হয়েছে?

কিছু হয়নি, এমনি বলছিলাম।

বিদ্যুৎ সব কথাই শুনতে পাচ্ছিল। বারান্দায় ঠাঁই করে ভাত বেড়ে দিল সে। বলল, বলছিলেন বেশ করছিলেন, এখন বসুন।

পদ্ম বলল, দ্যাখ না। কথার মাথা নেই, মুণ্ডু নেই, আবোল-তাবোল বকছে খালি।

বিভাসের একটু সংশয় হল এরকম জিজ্ঞেস করা উচিত হচ্ছে কিনা। পদ্ম কতখানি রেগেছে দেখবার জন্যে সে মুখ তুলল। পদ্ম তার দিকেই তাকিয়ে ছিল। বিভাস বলল, রাগ করলে?

পদ্ম বলল, রাগ হয়, হাসিও পায়।

মেয়েরা এই রকম দোটানায় রেখে দেয়, সোজা কথা বলে না। রাগ হয়। হাসিও পায়। তা কেন? একটা হলে বোঝা যায়।

পদ্মর দিক থেকে মুখ ফেরাতে গিয়ে বিদ্যুতের সঙ্গে চোখাচোখি হয়ে গেল বিভাসের। বিভাসের মনটা চমকে উঠল। বিদ্যুতের দৃষ্টি তীক্ষ্ন। কী যেন খুঁজছে সে বিভাসের সারা মুখে। চোখে চোখ পড়তেই দৃষ্টি ফেরাল বিদ্যুৎ।

খেতে খেতে এক সময় আবার জিজ্ঞেস করল সে, আচ্ছা, ইয়ে, ওঁকে তো আজ দেখতে পাচ্ছি নে?

বিদ্যুৎ বলল, কে?

আপনার শাশুড়িকে।

বিদ্যুতের সঙ্গে পদ্মর আবার চোখাচোখি হল। আজকে লোকটা এসব জিজ্ঞেস করে মরছে কেন? ভুবনেশ্বরী কেন নামেন না, সে কৈফিয়ৎ কাউকেই দেওয়া হয় না এ বাড়িতে। তিনি চলেন তাঁর ইচ্ছামতো। স্নান করেন, পুজো করেন, রান্না করেন, একলা একলা থাকেন, খাবার সময় বউয়ের কাছে এসে চেয়ে খেয়ে যান, এই দেখতেই সবাই অভ্যস্ত। তারকেশ্বরের সঙ্গে কথা কম বলেন, সকলের সঙ্গেই কথা কম বলেন, তাতে কারুরই যেন বিস্ময় হয় না। বরাবরই এরকম দেখা গিয়েছে। এর ওপারে কি আছে, কারুর কোনো অনুসন্ধিৎসা থাকলেও জিজ্ঞেস করে না।

পদ্ম কি বলতে যাচ্ছিল। বিদ্যুৎ তার আগেই বলল, কতবারই আপনি বাড়ির মধ্যে আসেন, আর কতক্ষণই বা থাকেন যে মাকে দেখতে পাবেন? মার সঙ্গে কি রোজ আপনার দেখা হয়?

বিভাস বলল, তা বটে।

পদ্ম বলল, বউদি, তুমি পাগলামির জবাব দাও, আমি ততক্ষণ মাথায় একটু জল দিয়ে আসি।

বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি বলল, না ঠাকুরঝি, এই অবেলায় আর জল ছুঁইয়ো না মাথায়, সর্দি হয়ে যাবে।

যাক্, তালুতে একটু জল না ছোঁয়ালে আমার মাথা গরম হয়ে যাবে।

বলে সে চলে গেল। বিদ্যুৎ বোধহয় আবার ভাত আনতে গিয়েছিল বিভাসের জন্য। বিভাস ভাবছিল, কি করে তাপসদের প্রসঙ্গ কখনো আসে না, বিদ্যুৎ আসতে দেয় না। এইবার একদিন তাপস-বিদ্যুৎ সম্পর্ক আলোচনা না করলেই নয়। নইলে বিদ্যুৎকে কিছুতেই বোঝা যায় না, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়। দেখা যায় শুধু একটি মেয়ের ব্যক্তিত্বের আড়ালে চাপা একটা অসহায় ব্যথা।

কিন্তু বিদ্যুতের ভাত নিয়ে আসার আগেই চমকে উঠল বিভাস। সিঁড়ি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে ভুবনেশ্বরী। আজকেই বিশেষ করে এমনি ভাবে ভুবনেশ্বরীকে দেখতে পাওয়া আলাদীনের প্রদীপের মতোই বিস্ময়কর।

এঁটো হাতেই বিভাস প্রায় দাঁড়িয়েই পড়েছিল। ভুবনেশ্বরীও যেন

চমকে উঠে একটু ঘোমটা টেনে দিলেন। ঘোমটা টানার ভঙ্গীটি বিচিত্র, যেন নতুন বউ। একটু বোধহয় হেসেও উঠলেন। মুখখানি পুরোপুরি ঢাকেননি। উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, সরু নাক, চোখ দুটি মাঝারি কিন্তু শান্ত ও গম্ভীর বলে মনে হয় অনেক বড় বুঝি।

একটু যেন ত্রস্ত ভঙ্গিতেই বিভাসকে বললেন, উঠলে কেন বাবা, বস। বউমা পদ্ম কোথায় ?

বিদ্যুৎও তখন এসে পড়েছে এবং ভুবনেশ্বরীকে চোখে পড়বার আগেই বিভাসের দাঁড়িয়ে পড়া অবস্থা দেখে কী বলতে যাচ্ছিল। ভুবনেশ্বরীকে দেখে তাড়াতাড়ি ভাতের থালা নামিয়ে, বাঁ হাতে ঘোমটা টেনে দিল আরও খানিকটা। বলল, ঠাকুরঝি একটু মাথা ধুতে গেল। কিছু বলছেন মা ?

ভুবনেশ্বরী বললেন, না, তোমাদের এত দেরি দেখে নেমে এলাম। এত দেরি কেন বউমা ?

বিদ্যুৎ জবাব দেবার আগে আর একবার বিভাসকে দেখে নিল। যত সে অবাক তত তার রাগ হতে লাগল। বিভাস কি সাধারণ ভদ্রতা অভদ্রতার কথাও ভুলে গিয়েছে যে, এমন হা করে ঠায় তাকিয়ে আছে ভুবনেশ্বরীর দিকে ? না হয় কমই দেখেছে। হাবা নাকি লোকটা ?

সে বলল ভুবনেশ্বরীকে, ঠাকুরঝি আর আমি একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম নিচের ঘরে। কম্পাউন্ডারবাবুও আজ অনেক দেরি করে এলেন।

ভুবনেশ্বরী তখন বিভাসের দিকে পিছন ফিরে রয়েছেন। বললেন, ও। কিন্তু পদ্ম অবেলায় আবার মাথায় জল দিতে গেল কেন ?

বারণ করেছিলাম মা, কিন্তু—সে একবার বিভাসের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করল, পারল না—কিন্তু ঠাকুরঝির নাকি মাথা গরম হয়ে যাবে।

বিদ্যুৎ হাসল। ভুবনেশ্বরীও হাসলেন একটু। বললেন, অসুখবিসুখ বাঁধাবে একটা। তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও, আর দেরি করো না।

তারপরে ভুবনেশ্বরীও যেন টের পেলেন বিভাসের তাকিয়ে থাকা। যাবার আগে জিজ্ঞাসা করে গেলেন, খাওয়া দাওয়ার কোনো অসুবিধে হয় না তো ?

বিভাস যেন সন্ত্রস্ত। বলল, আজ্ঞে না।

বলে সে তাকিয়েই রইল। ভুবনেশ্বরী চলে গেলেন।

বিদ্যুতের দৃষ্টি আরও তীক্ষ্ন হয়েছে। সে জিজ্ঞেস করল হঠাৎ, কোথায় গেছলেন আজকে, বলুন তো ?

বিভাস বলল, কেন রুগী দেখতে ?

সেখানে বুঝি এ বাড়ির বিষয়ে কোনো কথা হয়েছে ?

না তো।

তবে ?

তবে কী ?

আজকে এরকম আবোলতাবোল বকা, মার দিকে এরকম তাকিয়ে থাকা, এসব কেন?

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বিভাস বলল, উত্তর আঁচনার জগদীশ চক্রবর্তীর সঙ্গে আজ আলাপ হল।

বিদ্যুৎ চমকাল না। কেবল গম্ভীর গলায় বলল, বুঝেছি! ঠাকুরঝি আসছে, ওর সামনে ও-কথা বলবেন না যেন, বুঝেছেন?

হ্যাঁ।

হেসে বলল বিদ্যুৎ, ছাই বুঝেছেন।

পদ্ম এসে পড়ল। কিন্তু বিভাস ভাবল, বিদ্যুৎও বলে, সে ছাই বুঝেছে!

॥ সাত ॥

আঁচনায় বর্ষা নেমেছে। শুকনো মাটি কোথাও নেই। গোটা গ্রাম জুড়ে সমস্ত পথে পথে পাঁক আর কাদা।

তবু নাকি বর্ষা এখনো ঠিক নামেনি। এখনো মাঠে মাঠে ভালো করে জল দাঁড়ায়নি। মাঠ চষা হয়ে গেছে, বীজধানের চারা উঠেছে লকলকিয়ে। যে পরিমাণে বর্ষা নেমেছে, এরকম আর দু-চারদিন ঝরলেই রোয়ার কাজ শুরু করা যায়।

তবুও বড় ভয়। আশা ও নিরাশায় মন নিয়তই দোলে। বৃষ্টির জল স্বাধীন। নিজের আইনে চলে, কারুর মন রাখার ধার ধারে না সে। যদি বেশি করে ঝরে, ভেসে যাবার ভয়। কম হলে চাষ হবে না। তবে, এখন আকাশ জুড়ে প্রচুর আশা। এখন যত ঝরবে ততই ভালো। আর ঝরেও রোজই। নদীতে পাহাড়ের ঢল এখনো নামেনি বোঝা যায়। কারণ এখনো আঁচনার নদীর জলে গেরুয়া রঙ ধরেনি। কিন্তু জল বেড়েছে। যমুনা, কেউটের বিল আর খাল একাকার হয়ে যায়নি। হবে, সেই লক্ষণ দেখা দিয়েছে মাত্র।

হাটের বেচা-কেনার মন্দা দেখা দিয়েছে। দর বাড়তে আরম্ভ করেছে ধান চালের। আসছেও কম। আলু বলে পদার্থটি চোখেও দেখা যায় না। ঝিঙে, কচু, পুঁইশাক—এই সবেই হাট ভরে থাকে। চাষীদের কাজ বেড়েছে। এখন তাদের আর হাটের দিকে নজর নেই। তবু আসতে হয়। যা হোক শাকটা পাতাটা বিক্রি করেও যদি নগদ দুটি পয়সা পাওয়া যায়। অনাহার প্রায় বৈশাখ থেকেই শুরু হয়। এ সময়টা আরো বাড়াবাড়ি। অথচ পেটে

দুটি না পড়লে, মাঠে কাজ করাই বা যায় কেমন করে।

হাটে অবশ্য এখন মানুষের লেনদেনই বেশি। হাটের দিন ছাড়াও, সকালে বাজারের সময়েও কৃষি মজুররা ভিড় করে। বিশেষ জন বলে তাদের কিছু বোঝা যায় না। অধিকাংশই আদিবাসী মেয়ে-পুরুষ। তার মধ্যে বাঙালীও কম নেই। তবে বাঙালী কিষানমজুরদের হ্যাপা কেউ বিশেষ নিতে চায় না। তাদের নাকি বড় ট্যাকটেকে কথা। দাবি বেশি, চুক্তির কাজ থেকে হাত বাড়িয়ে একটু তৃণ গাছটিও সরিয়ে দেবে না। তবে কাজ ভাল করে, বোঝে, মন দিলে একলা একশো। তবে সে মন পাওয়া দুরূহ।

কিষান মজুরদের ভিড় হয় এখন হাটে। দেখলেই চেনা যায়। টোকা, পুঁটলি, কারুর কারুর হ্যারিকেন, থলো হুঁকো নিয়ে দলে দলে সব বসে থাকে। যাদের মজুরের দরকার তারাও আসে। দর কষাকষি হয়। সব সময় এভাবেই মজুর পাওয়া যায় না। আড়কাঠিরা গিয়ে নানা জায়গা থেকে নিয়ে আসে চাষের মরশুমে।

তারকেশ্বরের সুদ-ব্যবসার গোমস্তা রাসু এসময়ে একটু চঞ্চল হয়ে ওঠে। হাটের পিছনে, কয়েকটা চালাঘরে সদর শহর থেকে যে দেহজীবিনীরা আসে, বর্ষার সময়টা তাদের বড় একটা দেখা যায় না। যাতায়াতের অসুবিধা তো আছেই। চাষী মুনিষ কাজে ব্যস্ত থাকে, হাতেও পয়সা থাকে না। সপ্তাহে একদিন হাট। হাটের দিন রাসুকে সব সময়েই খুশি-খুশি দেখায়। চোখ পিটপিট-করা অভ্যাস ছাড়াও তার আর একটি দোষ ছিল, নিচের ঠোঁট ওপরে এনে মাঝে মাঝে চাপ দেওয়া। কেমন কুৎসিত অশ্লীল বলে মনে হয় তখন রাসুকে।

বিভাস দেখেছে, তারকেশ্বর বাড়ি চলে গেলেই, কিংবা দূরে কোথাও রুগী দেখতে গেলে, হাটের দিন রাসু পিছনের চালাঘরের মেয়েমানুষদের কাছে চলে যায়। কম আর বেশি, তাড়ি সে খায় প্রতিদিনই। বরান্দের তেলেভাজা বাদ যায় না কোনদিন। হাটের দিনে একটু বাড়াবাড়ি হলেই দেখা যায়, তার চেহারা বদলে গেছে। মানুষটাও বদলে যায় অনেকখানি। হলদে চোখ লাল হয়। চোখ পিটপিট করে না, দৃষ্টি প্রায় স্থির। ঠোঁটের কষে লালা ভারী আঁটার মতো জমে থাকে। গলার স্বর অসম্ভব গম্ভীর শোনা যায়। সেটাই সবচেয়ে আশ্চর্য। যার গলার স্বর সব সময়েই চামচিকির মতো চিঁচিঁ করে, তার গলার স্বর অমন মোটা হয় কেমন করে।

তখন, পা টিপে টিপে, চোখ পিটপিটিয়ে, সরু গলায় কথা বলা, ভয়-পাওয়া রাসুকে চেনা যায় না। বরং রাসুকেই যেন কেমন ভয় করে।

রাসু তখন মোটা গলায় বলে বিভাসকে, দুটো দুটো পাশ করেছেন কম্পাউন্ডারবাবু, তারকেশ্বর রায়ের বাড়িতে আছেন বেশ রসে-বশে, আপনার আর ওখানে যেতে ইচ্ছে করে না, না ?

ওখানে মানে হাটের মেয়েদের কাছে। হাটের মেয়েদের কাছে যাবার কথা কোনদিন চিন্তা করেনি বিভাস। কিন্তু একটা জিনিস টের পেয়েছে, তাড়ি খেয়ে রাসু তারকেশ্বরকে ভক্তি করে আর ডাক্তারবাবু বলে না। একটু যেন তেরছা করেই নাম ধরে বলে তারকেশ্বর রায়। রাসুর এ অবস্থায় অবশ্য কোনদিনই তারকেশ্বরের সাক্ষাৎ হয় না। হলে কেমন হত, সেটা জানবার বড় কৌতূহল বিভাসের। অনেকদিন মনে মনে ভেবেছে, কি ভাবে এসময়ে তারকেশ্বরের সঙ্গে রাসুর যোগাযোগ করিয়ে দেওয়া যায়। কথাটা ভেবে, বিভাসের মনে একটা ছেলেমানুষী উত্তেজনা দপদপিয়ে ওঠে। যেন ব্যোম-পটকার পলতেটায় আগুন জ্বালিয়ে দেবে কি দেবে না। একটা মজা অথচ ভয় ভয় উত্তেজনা অনুভব করে সে।

কিন্তু বিভাস বলে, রসে-বশে মানে ?

রাসু স্থিরদৃষ্টিতে তাকিয়ে বলে, মানে, ঘরের বৌঝিয়ের হাতে খাওয়া, জলটা পানটা হাত বাড়িয়ে নেয়া, এই মানে আর কি, বুঝলেন না ? ঘরের মানুষের মতন।

বলার চেয়ে না-বলাই যদিও বেশি থেকে যায়, আসল কথা বুঝতে অসুবিধা হয় না বিভাসের।

তার চোখের সামনে তখন পদ্ম আর বিদ্যুতের মুখ ভেসে ওঠে। রাসুর ওপর রাগ হয় তার। বিরক্ত হয় মনে মনে। সে তাকিয়ে দেখতে থাকে রাসুকে। যেন উদ্গত বমি চেপে বলে রাসু, রাগ করলেন ?

বিভাস বলে, না।

—করেছেন মনে হয়। তারকেশ্বর রায়কে বলে দেবেন ?

—না।

—আমি কি মিছে কথা বলছি কম্পাউণ্ডারবাবু ? ঘরের ছেলের মতন যত্নে আছেন। নেই কি ?

—হ্যাঁ।

—তবে ! আগেকার বুড়ো কম্পাউণ্ডারবাবুও যেত না। তারকেশ্বর রায়ের বাড়িতে সেও ঘরের লোকের মতন ছিল। বাড়ির খুড়ো-জ্যাঠার মতন। ঘরের লোক বাইরের মেয়েমানুষের কাছে যায় না।

বিভাস না বলে পারে না, ঘরের লোককেও তো যেতে দেখি।

হাত নেড়ে রাসু বলে, মিছে কথা। মাটি ফেলে দাওয়া করে, চান্দিকে চারটে বেড়া খাড়া করে, মাথায় খড় বিছিয়ে দিলেই কি ঘর হয় কম্পাউণ্ডার-বাবু। দুটো দুটো পাশ দিয়েছেন, এটুকু বোঝেন না। সেই ঘরে একটা বউ, কয়েকটা ছেলেমেয়ে থাকলেই তাকে ঘর বলে ?

এমনি অনেক কথা বলে রাসু। তত্ত্বকথা বলার জন্যে বলে না, নিজের কথাই বলে সে। যখন সে এমনি বকবক করে তখন অনেক কথা বলে। তাতে

বিভাস জানতে পেরেছে, এই আঁচনাতেই রাসুর বাড়ি ছিল। পনেরো ষোল বছর বয়স থেকে সে ভালো মামলা-মোকদ্দমা বুঝত। জীবনে নাকি অনেক মামলা করেছে। তারকেশ্বরের রায়ের সঙ্গে যাদের সরাসরি মামলা হয়েছে, এরকম অনেককে সে বুদ্ধি আর পরামর্শ দিত। তারকেশ্বরের যে দাদা আর ভাই এখন মহকুমা সদরে থাকে, তাদের সাহায্য করেছিল রাসু তারকেশ্বরের বিরুদ্ধে। যুক্তি সলা-পরামর্শ আর সাক্ষী সবই দিত সে। কিন্তু তারকেশ্বরের সঙ্গে তার ভাইয়েরা হেরে যায়। তার অনেক আগেই নিজের সাতচল্লিশ বিঘা জমি সব শেষ করেছে রাসু। রাসুর বউ তখন তারকেশ্বরের দাদা নকুলেশ্বরের বাড়িতে, যে পুরনো বাড়ি এখন তারকেশ্বরেরই অধিকার, সেই বাড়িতে রাঁধুনি বামনীর কাজ করত। হ্যাঁ, রাসুও ব্রাহ্মণ। কথায় বলে কেলে বামুন কটা শুদ্দুর বেঁটে মুসলমান, এ তিন শয়তান সমান।

রাসু তাড়ি খেয়ে বলে, কম্পাউন্ডারবাবু, আমি শয়তান, না ?

বিভাস বলে, বুঝতে পারি না।

—আমি শয়তান।

—তাই হবে। বিভাস বলে, নইলে এসব করতে গেছলেন কেন ?

রাসু বলে, কম্পাউন্ডারবাবু। আমি ফেরেববাজ হতে চেয়েছিলাম। পয়ারপুরের জমিদারের মতন, তারকেশ্বর রায়ের মতন। ফেরেববাজ না হলে বড় মানুষ হওয়া যায় না। জমিদারি তুলে দেবে নাকি সরকার। আমাদের এম-এল-এ হয়েছে কে ? পয়ারপুরের বাষট্টি বছরের বুড়ো জমিদার। চেনেন অনাদি মুখুজ্জেকে ? দেখেছেন, এখানে আসে বসে ?

—হ্যাঁ

—অনাদি মুখুজ্জে সরকারের লোক, ভোট পেয়েছে। অনাদি মুখুজ্জে পয়ারপুরের জমিদার, এখানকার সব মৌজা প্রায় তাঁদেরই। সে জমিদারি উচ্ছেদ করবে কম্পাউন্ডারবাবু, খাঁটি ফেরেববাজ হওয়া চাট্টিখানি কথা নয়। আমি হতে পারলাম না। আমার সাতচল্লিশ বিঘেও গেল। নকুলেশ্বর রায় আমার চেয়ে একটু বড় ফেরেববাজ, তাই টিকে আছে প্রাণ নিয়ে কিন্তু ভাইয়ের সঙ্গে পারল না। পালিয়ে গেল সদরে। তার ভাই গোকুলেশ্বর, পারল না তারকেশ্বরের সঙ্গে পালিয়ে গেল সদরে। তাদের হকের ধনও হাতছাড়া হয়ে গেছে। আমাকে লোকে ফেরেববাজ বলত এক সময়ে। আমার ভালো লাগত। আমাকেও ভয় পেত মানুষ। মনে মনে খুশি হতাম। এখনো কেউ কেউ ভয় করে আমাকে, কম্পাউন্ডারবাবু।

রাসুকে চেনা যায় না। কালো মূর্তি, লাল চোখ, তার ওপরে সারা মুখে গলায় দড়ির মতো শির ফুলে ওঠে। মোটা গোঙা-স্বরে তার সুরের ওঠানামা নেই।

বলে, যারা আমাকে ভয় করে, তারা আমাকে চোখে চোখে রাখে।

তারকেশ্বর রায় আমাকে চোখের আড়াল করে না।

রাসুর সামনের দিকের হলদে দাঁত কয়েকটা বেরিয়ে পড়ে। বলে, তারকেশ্বর রায় ভাবে, পাছে আমি আবার ফেরেববাজ হয়ে যাই! কিন্তু কম্পাউণ্ডারবাবু আমি আর কোনদিন ফেরেববাজ হতে পারব না।

বলে হাঁ করে, কষের গালে আঙুল দিয়ে ফাঁক করে গোড়ার মাড়ি দেখায়। বলে, দেখেন একখান দাঁতও নেই। একদিন একটাকা এগার আনা পয়সা সরিয়েছিলাম তারকেশ্বরের টাকা থেকে। হিসাবে টের পায় নাই, চোখের দিকে তাকিয়ে টের পেয়েছিল। আমি রাসু···রাসবিহারী গাঙ্গুলী, উত্তর আঁচনায় এক নামে সবাই চিনত। সেই রাসুকে মারল তারকেশ্বর। আমি পায়ে ধরে মাপ চেয়েছিলাম। আমার সাতচল্লিশ বিঘা জমি ছিল। আমি আর পাঁচটা ফেরেববাজের মতন তাকে সাতশো বিঘা করতে চেয়েছিলাম। কম্পাউণ্ডারবাবু, তারকেশ্বর তার কুকুর গুলনের সঙ্গে থাকতে বললে আমি তাই থাকব। আমি ফেরেববাজ হতে পারলাম না। তারকেশ্বরেরা তিন ভাই। দাদা নকুলেশ্বর। আমার সাতচল্লিশ বিঘা হারিয়ে, আমি নকুলেশ্বরের চাটুকার হয়েছিলাম। ভাবতাম, ফেরেববাজী করে, নকুলেশ্বরকে ডুবিয়ে, আবার আমি খাড়া হব। কিন্তু নকুলেশ্বরই পালাল, কেননা, তারকেশ্বর আরও সেয়ানা, সে সহোদর ভাইকে আবার উদরস্থ করল। মাঝখান থেকে আমার বউটাকে নিয়ে নকুলেশ্বর শুত। নকুলেশ্বরের বউ আমার বউটাকে পিটত। নকুলেশ্বর পালাল, গোকুলেশ্বরও পালাল তারকেশ্বরের ভয়ে। কারণ সেও তার বড় দাদার পিছনে ছিল। আমার বউটাও কোথায় পালিয়ে গেল। আর আমার নামে এল পরোয়ানা, পুলিশে ধরে নিয়ে যাবে বলে। বাঁচাল কে জানেন? তারকেশ্বর রায়।

নিজেকে বিদ্রূপ করেও হাসে না রাসু। শত্রুর মুখ মনে করেও দাঁত কড়মড় করে না। একরকম সুরে একঘেয়ে গলায় বলতে থাকে, কেন, এসব কেন কম্পাউণ্ডারবাবু? না, আমি ফেরেববাজ হতে চেয়েছিলাম। না হলে বড় মানুষ হওয়া যায় না। কিন্তু বড় শক্ত কাজ, খুব শক্ত। ক্ষ্যামতা চাই। তারকেশ্বর আমাকে পোষে, খেতে পরতে দেয়, দশটা করে টাকা দেয় মাসে। কত জমা করি তার হিসেব রাখে।···

···কিন্তু কম্পাউণ্ডারবাবু, নকুলেশ্বরের চেয়ে তারকেশ্বর ভাল। তারকেশ্বর লড়িয়ে। একবার টের পেলে হয়, কে ওৎ পাতছে কোপ দেবার জন্য। তার রক্ষে নেই। ঠিক তারকেশ্বর তাকে কোপ দেবে। তার ভবিষ্যৎ অনেক উঁচুতে। দেখেন নাই, পয়ারপুরের জমিদার এম-এল-এ অনাদি মুখুজ্জে আসে, কত কথা বলে। ওরা কত বড় ফেরেববাজ, আবার ওদের ওপরে কত ফেরেববাজ। সরকার জমিদারি তুলবে, জমিদার অনাদি মুখুজ্জে সরকারের লোক হয়ে গেল। কত বড় তারা।···

কম্পাউণ্ডারবাবু, চোখ বুঁজলে তারকেশ্বর সব দেখতে পায়, গোটা আঁচনায়, পয়ারপুরে, নেদোতে, ছোট কেষ্টপুরের কোথায় কী হচ্ছে। অন্তর্যামী ভগবান তারকেশ্বর। কেউ কোনদিন ওর সঙ্গে পারবে না।

রাসু থামে না। বলতেই থাকে।

বিভাস শোনে। শুনে শুনে, রাসুর মতো ভয়-ভয় চেতনাটা বাড়তে থাকে তার।

তারপর শুনে শুনে, যেমন তুষের আগুন ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে গনগনিয়ে ওঠে, কিন্তু টের পাওয়া যায় না, তেমনি বিভাসের বুকের মধ্যে জ্বলে। নিজেরও বোধহয় অবাক লাগে বিভাসের, নিজের রাগ দেখে। ধিকি-ধিকি আগুনের মতো, ক্ষোভের আঁচ লাগে তার সারা গায়ে।

আবার বিরক্ত লাগে কখনো। কিন্তু রাসু বলতে থাকে। প্রায় রোজই বলে।

বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর। আঁচনার নদীতে বান আসব আসব করে। জলে জলে গাছপালা আকাশমাটি সব যেন ডগমগ। নদীনালা, পুকুর ডোবা, সবই যেন কুল ছাপিয়ে ভাসো ভাসো করে।

রাসু এখন রোজ নেশা করে। রোজ বলে। সারাদিন মেঘের মতো, বৃষ্টির মতো, ঝিরি ঝিরি, পাঁক পাঁক, ভেজা ভেজা, পুব বাতাসের গোঙানির মতো বলতেই থাকে রাসু।

॥ আট ॥

ইউনিয়ন বোর্ডের অঞ্চলে রোজই সাঁকো ভাঙার সংবাদ আসে। রাস্তা ধ্বসে যাবার খবর পাওয়া যায়। সরকারি খয়রাতিতে ধান চাউলের বিষয় নিয়ে প্রতিদিনই অভিযোগ আসে। একে বলে 'বছুরকে মন্বন্তর'। খয়রাতি ছাড়াও ঋণের বিষয় আছে। কৃষিবিভাগের এস-ডি-ও, বি-ডি-ও, ইউনিয়ন বোর্ডের উপরেই নির্ভরশীল। সুতরাং ঋণের টাকা, কৃষি-ঋণের টাকা, সবই ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের হাতে। অর্থাৎ প্রেসিডেণ্ট যা বলেন, সরকারি প্রতিনিধি তাই করেন। সেসব বণ্টনে অত্যন্ত অসাম্য। একজন কেন বেশি পায়, একজন কেন কম পায়, আর একজন কেন কিছুই পায় না, এই নিয়ে প্রতিদিনই জিজ্ঞাসাবাদ।

যিনি জবাব দেবেন, সেই তারকেশ্বর স্বয়ং অনুপস্থিত। কোথায় যেন একটা বিশেষ গোলমাল লেগেছে। তারকেশ্বর শান্তিতে নেই। মহকুমা শহরে যাচ্ছেন প্রায়ই। এম-এল-এ অনাদি মুখুজ্জের সঙ্গে প্রতিদিনই দরকার

লেগে আছে।

প্রেসিডেন্টের অনুপস্থিতিতে, লোকে বিভাসকেই যেন তার একমাত্র প্রতিনিধি বলে ধরে নেয়। যত জিজ্ঞাসাবাদ তাকেই।

কিন্তু জবাব দেবার অধিকার বিভাসের নেই।

লোকেরা এসে বলতে থাকে। বিভাস শুনতে থাকে। শুনতে শুনতে, ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে গন-গনিয়ে ওঠা জ্বলুনিটা আবার উস্কে উঠতে থাকে বুকের মধ্যে। ইউনিয়ন বোর্ডের হিসেব-পত্র সব তার নখদর্পনে। কিছু তার অজানা নেই।

কিন্তু খাতায় হিসেব থাকে এক রকম। কাজে হয় আর এক রকম।

বিভাস নির্বিকার থাকতে চেয়েছে। এখনো থাকতে চায়।

তারকেশ্বর নিঃসংশয়ে তার সব বদ্ধ বদ্ধ নিরন্ধ অন্ধকার কোণগুলিতে হাত ধরে ধরে নিয়ে গিয়েছেন বিভাসকে। যেন একটা অন্ধকে, একটা বোকাকে, একটা কালাকে স্পর্শে স্পর্শে অনুভব করিয়েছেন তার অন্ধিসন্ধি যন্ত্রতন্ত্র। যেন নিজেরই আত্মাকে দেখিয়েছেন। নিজেরই ছায়ার সঙ্গে কথা বলেছেন। বুঝিয়েছেন তার নিজস্ব জীবনতত্ত্ব।

বিভাস বিশ্বাসী থাকতে চায়নি, অবিশ্বাসীও হতে চায়নি। বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন সে আনতে চায়নি মনে। মাঝে মাঝে মনের মধ্যে কে যেন 'কেন কেন' করে উঠেছে। সেটা বিস্মিত ভয়ের।

কিন্তু আঁচনায় তারকেশ্বর ছাড়া মানুষ আছে। তারকেশ্বরের মাথায় উপরে যে আকাশ আছে, সে আকাশ ছাড়াও আকাশ আছে। তারকেশ্বর যে বাতাসে নিশ্বাস নেন, সে বাতাস ছাড়াও বাতাস আছে। সেই মানুষেরা কথা বলে। বিভাস শোনে। শুনে শুনে, খোঁচা খেয়ে খেয়ে খাঁচা-বন্দী নির্জীব জীবটা যেমন শেষ পর্যন্ত গর্জে ওঠে, তেমনি তার ভিতরে কে যেন ওঠে গর্ গর্ করে।

সেই আকাশটা তার চোখে পড়ে। আঁচনার সেই বিশাল আকাশ। যে আকাশটার দিকে তাকিয়ে তার মন বিষাদে ভরে যায়।

সেই বাতাস এসে লাগে তার গায়ে। যে বাতাস তার মনকে ব্যাকুল করে।

কেবলই ফেলে আসা জীবনের কথা মনে পড়ে। ফেলে-আসা নয়, বিতাড়িত জীবন সেটা। যেন জীবনের একই ছকের এদিক আর ওদিক।

যেখানে লোভ, সেখানেই অপমান। বিভাসের দাদাদের চেয়েও অনেক বেশি সম্পন্ন, অর্থ ও প্রতিপত্তিতে প্রতিষ্ঠিত তারকেশ্বরের গণ্ডীর মধ্যে, লোভের একটি ঘূর্ণী যেন নিয়ত আবর্তিত হচ্ছে। সেই বুকে হাঁটা জীবন্ত বীভৎস ভয়টা কী এক দুর্জয় লালসায় যেন চারিদিক থেকে হাতড়ে হাতড়ে সব কিছু তার সীমানায় এনে তুলছে

লোভ নেই, স্বার্থ নেই, তবু ওই সীমানার শঙ্কিত লালসা-স্তূপের হিসাব রাখে সে নির্বিকারভাবে। রাখতে চায়। কিন্তু অপমানে মনটা কালো হয়ে ওঠে তার। মনে হয় মানুষ কত পরাধীন।

অপমানের লিখন বুঝি বিভাসের জন্মকাল থেকেই কপালে লেখা হয়ে গিয়েছে। সে লিখন আর কোনদিন যেন ঘুচবে না।

রীতিমত মানুষ হিসাবে অনেক ঘাটতি আছে বিভাসের। সে প্রতিদিন খবরের কাগজখানিও পড়ে না। যে কাগজটি নিয়ে, তারকেশ্বরের ডিস্‌পেন্সারি ও অফিস ঘরে অনেক বাক্‌বিতণ্ডা বয়। ঠাট্টা বিদ্রূপ হয়, মন কষাকষি পর্যন্ত গড়ায়।

জীবনের সব জায়গায়, সব বিরোধ মিটিয়েই তো বসেছিল সে। কিন্তু ভূত যে সত্যি সর্ষের মধ্যেই লুকিয়ে থাকে, এ তত্ত্ব তার জানা ছিল না। দেখছে, তার নিজের মধ্যেই অনেক বিরোধ। সেখানে নিয়ত দ্বন্দ্ব লেগেই আছে।

মন অপমান বোধ করেই ক্ষান্ত হয় না। সহ্য না করতে চাওয়াতেই তার শেষ নেই। অবসান করতে চায়।

সংসারে অনেক দুঃখ পাওয়ার স্বাধীনতা আছে সকলের। তাকে দূর করার অনেক বাধা। বাধা, তবু আঁচনার আকাশের দিকে তাকিয়ে, যে বিষাদ গ্রাস করে বিভাসকে, তার চাপাচাপি ঠাসাঠাসি ঠেলে উঠতে ইচ্ছা করে।

নির্বিরোধের কুলায় জীবন যেন কুলোতে চায় না আর। এতটুকু লাগে, এতটুকু। একেবারে একটুখানি, ক্ষীণ, হীন, দুর্বল, ভীরু।

ছড়াতে চায়, বাড়াতে চায় কেন জীবন? তারকেশ্বরের সীমানা ডিঙিয়ে, অনেক দূরে, বহুদূরে ব্যাপ্ত হতে চায় কেন?

বিদ্যুতের চোখ দুটি তার মনে পড়ে। যে-চোখে ছোটবউদির মতো অতলস্পর্শী দৃষ্টি আছে। যে-চোখ দুটি তার ভিতরের এই নিয়ত দ্বন্দ্বকে নিরন্তর দেখছে। দেখছে, আর যেন মুখ না ফুটেও বলছে, 'ভেবে কাজ করবেন, কম্পাউণ্ডারবাবু।' না, 'কম্পাউণ্ডারবাবু' নয়। যেন বলছে, 'ভেবে কাজ করো বিভাস। আঁচনা ছেড়ে, এ বাড়ি ছেড়ে যাবার জন্যেই যেন শুধু জীবনকে বাড়াতে চেয়ো না। শুধু আমার আর ঠাকুরঝির খেলার জুটি বলে বলছি! আমার নিজের জন্যেও বলছি বিভাস, সাবধান ছড়াতে গিয়ে ছড় খেয়ে যেও না।'

তা কেন? বিভাস ভাবে মনে মনে। এই সংকোচকে টুঁটি চেপে, নির্বিরোধে সীমানার বাইরে না গেল, বিদ্যুতের কাছেই বা কি মূল্য থাকে তার। নিজের সঙ্গেই বা লড়বে কত আর বিভাস।

কত না চেষ্টা করছে বিভাস, কত না বলছে নিজেকে, থাক্‌ থাক্‌, সব থাক্‌। তারকেশ্বর যা খুশি তাই করুন।

একবার মরে গিয়ে বাঁচা, সেটা যে কী, তা সবাই বোঝে না। পাখা ভাঙা, চট্‌চটে গুড়ে পড়া মাছির মতো সে জীবন।

কিন্তু মানুষের জীবনে সেই চট্‌চটে রস কখন শুকিয়ে যায়। কখন তার পাখা ওঠে সবল হয়ে, টেরও পাওয়া যায় না। তখন আর জীবনকে ধরে রাখা যায় না। সে আপনি আপনি কখন উড়ে যায়।

আঁচনা ছেড়ে চলে গেলে কেমন হয়?

বাড়ির অপমান আর মার শেষ হল না আজও। শুধু খোলস বদলানো হয়েছে। মুক্তি যদি পেতেই হয়, আঁচনা ছেড়ে গেলেই মিটে যায় সব।

কিন্তু তাতে জীবন বাড়ে কই? পালানো হয় শুধু। অলৌকিকের কথা নয়, মনের বাঁধন বলে কিছু নেই? সে বাঁধন কি এতটুকুও বাঁধেনি বিভাসকে?

বেঁধেছে। বিদ্যুৎ আর পদ্ম শুধু নয়, গোটা আঁচনার জীবনের সঙ্গে মনের একটা বাঁধাবাঁধি হয়েছে। ডাক শুনতে পায় বিভাস।

যোগেশ ঘোষালের মুখখানি তার মনে পড়ে। উঁচু গ্রাম নেদোর কিনার দিয়ে, শুকিয়ে-যাওয়া খালের দূর্বা গজানো নয়ানজুলি তার চোখে ভাসে।

আর রাসু রোজ বলতে থাকে।

বৃষ্টি পড়ে টিপ্‌-টিপ্‌, টাপুর-টুপুর। আঁচনার দিগ্‌দিগন্ত থৈ-থৈ করে।

রাসু থামে না। এক-এক সময় রাসুর গলাটা টিপে দিতে ইচ্ছে করে। চুপ্‌, চুপ হারামজাদা, তুই ফেরেব্‌বাজ হতে চেয়েছিলি; জীবনও নয়, মরণও নয়, এই প্রেতের জীবনই তোর পাওনা।

কিন্তু গলা টেপা যায় না। রাসু রোজ বলতে থাকে।

লোকেরা রোজ এসে বলতে থাকে। বলতে থাকে, বলতে থাকে।

শুনতে শুনতে মিক্‌শ্চার তৈরি করতে করতে, পাঁক পাঁক, বৃষ্টি, ভেজা নোংরা মাড়াতে মাড়াতে একটা ভয়ংকর যন্ত্রণা হতে থাকে। তারপর রাগ হতে থাকে।

ইউনিয়ন বোর্ডের চোরা হিসাবের সঙ্গে নিজের এই চুরি-চুরি খেলা আর কিছুতেই ভাল লাগে না। বারেন্দ্রপাড়ার পুকুরটা কেন অমন টলটল করবে?

গত চৈত্রে টেষ্ট রিলিফের সময় বারেন্দ্রপাড়ায় নিজের জমি দেখিয়ে ছিলেন প্রেসিডেণ্ট। বললেন, এইখানে পুকুর কাটা। এদিককার চাষীরা যাতে পাট পচাতে পারে। ঘাড়ে বয়ে বহু দূরে যেতে হয়। চাষীদের আবেদন ছিল। পাট পচাবার একটা ঠাঁই না হলে, পাট চাষ করা হয় না তাদের। পাকিস্থান নাকি চোখ রাঙায়, পাট দেবে না। পাটকলের এজেণ্টবাবুরা পাটচাষে উৎসাহ দিচ্ছে তাই।

কিন্তু পাট পচাবার জায়গা কই?

বি. ডি. ও. সাহেব প্রেসিডেণ্ট ছাড়া লোক চেনেন না। প্রেসিডেণ্ট জমি দিয়ে দিলেন বারেন্দ্র পাড়ায়।

সরকারি টাকায় মস্ত বড় পুকুর কাটানো হল। প্রেসিডেণ্ট সেই পুকুরে ঘাট বাঁধালেন। কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে ঘিরলেন। মাছ ছাড়লেন রুই, মিরগেল, কাৎলা।

হুকুম হল, পাট পচাবার এটা জায়গা নয়। রিলিফের কাটা পুকুর? সে কথা তা হলে নিশ্চয় লেখা আছে সরকারি খাতায়। হিসাব গিয়ে সেখানে কর। কিন্তু বারেন্দ্রপাড়ার পুকুরের মাছ না হলে কি আসে যায় তারকেশ্বরের? টেষ্ট রিলিফের টাকায়, রাস্তায় কাঁকর মাটি ঢেলে, কিছু টাকা ঘরে তুলতে চান কেন তারকেশ্বর। বিশ্বনাথের কৃষিঋণের খত্ দেওয়া পাঁচশো টাকা, হাতে পেতে চারশো কেন হয়? বিশ্বনাথের সামান্য একশো টাকায় কী লাভ হয় প্রেসিডেণ্টের? নয়ামতের দুশো টাকা কৃষিঋণের টিপসই পড়ে, পায় একশো ষাট টাকা। কেন? নয়ামতের চল্লিশটা টাকাও তারকেশ্বর মুঠিতে না পুরে পারেন না।

টাকাগুলি গুনে গুনে দিতে হয় যে বিভাসকে। একরকমের দেওয়া, আর একরকমের লেখাটা যে লিখতে হয় বিভাসকে।

বিভাসের বুঝি একটু হাসতে ইচ্ছে করে না, লোকের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছা করে না। কিন্তু এ সব কাজ যে করে, তার সঙ্গে যেচে কথা বলে কে?

রাঢ়ীপাড়ায় চরণ বাঁড়ুজ্জে মরো-মরো। তার নামে তিন হাজার টাকা কৃষিঋণ মঞ্জুর হল। অথচ জমি নেই এক ফোঁটা। কোথা থেকে জমি দেখানো হল, কে জানে। তারকেশ্বর ডাক্তারের ওষুধ খাচ্ছিল তিন বছর ধরে, ঋণ পাওয়ার সাতদিনের মধ্যে ভবলীলা সাঙ্গ। মরবার আগে বোধহয় জেনে যেতে পারল না, সরকারের খাতক হয়ে রইল সে চিরদিনের জন্য। দেহে সে মরল। নথিপত্র পোকায় না কাটা পর্যন্ত তার নাম পৃথিবী থেকে লুপ্ত হবে না।

বিনা পয়সায় ওষুধ খাইয়েছেন তাকে তারকেশ্বর। তিন তিন বছর ধরেই বুঝি খাইয়েছেন। তাই তিন বছরের তিন হাজার টাকা শোধ।

সরকার মামলা করবে? করতে পারে। সার্কেল অফিসার, প্রেসিডেণ্টের ওপর দায় আসবে? বলবে যে তোমরা দেখে ঋণ দাওনি? লোকটার তো ফুটোপয়সাও ছিল না।

বলতে পারে। কিন্তু এত খবর কে রাখে।

এমন একটি দুটি নয় অনেক, অনেক ব্যাপার। কেন?

দিন যায়। আচনার রোয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

রোয়ার কাজে উড়িয়া মেয়েদের হাত পাকা। সুনাম আছে। তারকেশ্বরের রোয়ার কাজও উড়িয়া মেয়েরাই করে। এই মরশুমে, দলে দলে মেয়েরা আসে।

তারকেশ্বরের চাষের কাজে বুনো আর চৌকিদার সকুনা-ই মোড়ল। রাসুও গিয়ে ভিড় করে। রোয়াবাহিনী-মেয়েদের পিছনে পিছনে ঘোরে।

সব বয়সের মেয়েরাই থাকে। মাঠে হাঁটা, ঘোরা মেয়ে। ইজ্জত তাদের কম, তা নয়। তবু বিভাস অবাক হয়ে ভাবে, হাটের চালগুলিতে ভিড়-করা রোয়ার মেয়েদের সঙ্গে কেমন করে রাসু ভাব জমায়। উড়িয়া ভাষা সে বলতে পারে না। কিন্তু দলের মধ্যে পড়ে, দশরকম কথা বলে ভাব করে যায়। তারপর আসল মতলব টের পেলে, দশজনে ধাক্কা মেরে সরিয়ে দেয়। একজন দেয় না। যে একজন দেয় না, তার সঙ্গেই রাসুর রাত কাটে।

মেয়ে মানুষগুলিকে দেখতে বিভাসের ভালো লাগে। সব মেয়েই এক বয়সের নয়। প্রৌঢ়া যুবতী মিলিয়ে তাদের দল। এক জায়গায় সবাই কাজ করে না। দশ জায়গায়, দশজনের কাজ করে। কত দূর দেশান্তর থেকে আসে। হয়তো ঘর আছে, স্বামী-শ্বশুর, ছেলেপিলে আছে ঘরে। মরশুমের সময়, সব ছেড়েছুড়ে জীবনের তাগিদে ছুটে আসতে হয়।

তাই বোধহয়, ওদের সাহস দুঃসাহস হয়ে ওঠে। ঘরের নিয়ম-শৃঙ্খলা যায় ভেঙে। মেয়েমানুষ হলেও ঘরছাড়া মানুষের মতো তারও মন দুর্বিনীত। ফেলে ছড়িয়ে চলার বেগ তাকে পেয়ে বসে।

শ্রী নেই, ছাঁদ নেই। তবু এই দুর্ভাগ্যবতীদের দেখে বিভাসের বড় ভালো লাগে। সকলের মুখ চেনা হয়ে যায়। কেউ কেউ রাসুর প্ররোচনায় তার সঙ্গে এসে রসিকতাও করে। অসুখবিসুখ হলে ওষুধ খেতে চায়। তাছাড়া, প্রতিদিনের বেতন মেটাতে হয় বিভাসকেই। রোয়ার মেয়েদের নিয়ম এই, প্রতিদিনের রোজ প্রতিদিন মিটিয়ে দিতে হবে। স্বাধীন থাকতে চায় ওরা। কাজ করেছি পয়সা দাও। কালকের কাজ কাল দেখা যাবে। অলিখিত হলেও চুক্তি থাকে, কাজ না মিটলে কেউ যেতে পারবে না।

রোয়া বাহিনী চুক্তি লঙ্ঘন কখনো বড় একটা করে না। মালিক চুক্তি না মানলে অবশ্য অন্য কথা। প্রতিদিনের 'রোজ' যখন নিতে আসে মেয়েরা, তখন গান গাইতে গাইতে আসে। গানের ভাষা বোঝে না বিভাস। কিন্তু সুরের দোলাটা লাগে তার মনে।

কখনো গলা ছেড়ে গায় না। সরু গলায় গায়। যেন অনেক দূর থেকে অনেকগুলি বাঁশীর চাপা সুরের মতো। এমনি বাঁশীর নয়, সাপ খেলাবার বাঁশীর সুরের মতো।

আদিবাসী মেয়েরাও এমনি গান করে।

ভোরবেলা কাজে বেরুবার সময়ও গান গাইতে গাইতে বেরোয়। রাত্রের ভিজিয়ে রাখা পান্তা খেয়ে, গোটা রোয়ানীদল মুখে পান গোঁজে। এইটি ওড়িষি মেয়েদের বিশেষত্ব। রাত্রিবেলা ভাত খেয়ে পান তৈরি করে রাখে। কাজে বেরোবার সময় পুঁটলি ভরে নিয়ে নেয়। পান না হলে একদণ্ড চলতে

পারে না। সাদা দাঁতের বালাই কারুর নেই। লাল ছোপ পড়ে কালো হয়ে গিয়েছে। আদিবাসীদের সাদা দাঁত না হলে যেমন মানায় না, রোয়ানীদের লাল দাঁত না হলে তেমনি মানায় না যেন। লাল দাঁত আর গুণ্ডির গন্ধ।

দল গিয়ে পড়ে মাঠে। বৃষ্টির কামাই নেই। জলে ভিজে, সারা গায় কাপড় যায় লেপ্‌টে। কাপড় তুলে দেয় হাঁটুর ওপরে। কেউ কেউ কাছা এঁটে দেয়। পায়ের পাতা ডুবে থাকে জলে। জলডোবা মাঠেই রোয়ানীদের কাজ। যেন ওদের পা নেই। মাটি-ঘোলা পাঁক জলের সঙ্গে ওদের পায়ের রং মিলে যায়। শরীরের খোলা অংশ মিশে যায় কাল্‌চে পাঁশুটে মেঘের গায়ে। দূরান্তের বনানীতে আদিবাসীনীদের মতো সাদা পছন্দ নয়, রোয়ানীদের লাল-নীল সবুজ আর রকমারি ডোরা শাড়ি, মেঘ-জল-জঙ্গলে মাখামাখি করে থাকে।

হাত জলে ডোবে আর ওঠে। জলে বুরে বুরে ফাটা ফাটা হাজা পোড়া হাত। ঘণ্টার পর ঘণ্টা উপুড় হয়ে থাকে। দূর থেকে হঠাৎ মানুষ বলে চিনতে ভুল হয় তখন।

রাসু বলে, মাগীগুলার কোমর ধরে না? বুক টাটায় না?

বিভাস বলে, কেন?

—অতক্ষণ উপুড় হয়ে থাকে।

বিভাস ভাবে, হয়তো কোমর ধরে, বুক টাটায়। কিন্তু মনের সঙ্গে আর কাজের সঙ্গে বোঝা-পড়া থাকলে জীবন কোনো বাধা মানে না। দুঃখটা তাদের জীবন-ধারণের স্বাভাবিক বেশ ধরেই আসে। আর জীবনধারণ তো নিয়তই কঠিন।

জলের নিচে কতখানি গর্ত করে চারা পুঁততে হবে সে তার মন আর হাতেই জানে। মন আর হাতের সঙ্গে কোনো বিবাদ নেই। তাই ফাঁকি নেই। প্রতিদানে যা আসবে, তা বিঘে কাঠা মেপেই আসবে। মনিবের চোখে যাদুর কাজল মাখিয়ে এক বিঘেকে দুই বিঘে দেখাতে পারবে না তারা। মাপজোক করা গোনাগাঁথা হিসাবের কড়ি। ফাঁকি তার জীবনের ত্রিসীমানায় ঢোকবার রাস্তা খুঁজে পায় না। দূর দেশে এসে দুঃখের ভাত ঘরে নিয়ে যায় মেয়েরা। বেঁচে থাকার সাহসের দাপে, কোমর ধরা বুক টাটানো, হাতের-পায়ের হাজা-পোড়া প্রকৃতির মরসুমের নিয়মের মতো। কখনো জীবনকে ছাড়াতে পারে না।

তবু ওরা হাসে। যে-হাসিতে মেঘ-বন-জল শিউরোয়। মানুষের বুকে দমকা বাতাস উড়ে পড়ে। আরি গান করে। মস্করা করে। ঘরের কথা মনে থাকে, তাই ঘরের কথাও বলাবলি করে।

আসলে বুকটা টাটায় বিভাসদেরই। মনটা হাহাকার করে। একটু সহজ হয়ে, প্রাণ খুলে হাসতে কত সাধ হয়। কিন্তু হাসতে পারে না। তাই

অবাক মুগ্ধ চোখ মেলে মেয়েমানুষগুলিকে দেখতে বড় ভালো লাগে।

অথচ এই ভালো লাগার মধ্যে একটা ভয়, ভয়ংকর আর দুর্জ্ঞেয় রহস্য জড়িয়ে থাকে। নানান রকমের ওলটপালট লেগে যায় জীবনের ধ্যানধারণা-গুলিতে।

একদিন জানা গেল, রোয়ানীরা কাজে যাবে না। তারকেশ্বর নেই। দায় হল বিভাসের। বুনো, চৌকিদার এবং রাসুর কথায়ও যখন হল না, তখন বিভাসকেই যেতে হল। বিচারক হয়ে যেতে হল। কারণ, মনিবের দোষে তারা কাজ বন্ধ করেনি। নিজেদের মধ্যে বিবাদ হয়েছে, তাই।

হাটের কাছেই তারকেশ্বরের নিজস্ব ঘরে রোয়ানীদের আস্তানা। বিভাস সেখানে গিয়ে ভয়ে প্রায় কাঁপতে লাগল। দেখল, ঝড় তখনো শেষ হয়নি। গালাগালির তোড় বইছে তখনো। আর গুটি দুই মেয়েমানুষ প্রায় একে-বারেই উলঙ্গ। চারিদিকে মাদুর কাঁথা ছড়ানো। পানের ডিবে, গুণ্ডি, পান, এমন কি পান্তা ভাত ছড়ানো, ছিটানো। বোঝা যায়, খামচে কাপড় ছিঁড়ে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কামড়ে আঁচড়ে রক্তারক্তি করেছে। এবং যুদ্ধের একটা পর্ব থেকে আর একটা পর্বে যাবার আগে, চলছে কথা ছোঁড়াছুড়ি।

পুরুষদের এ অবস্থায় দেখলে তবু এক রকম ছিল। মেয়েদের দেখে, বিভাস ভীষণ ঘাবড়ে গেল। নিজেই সে পালাবার জন্যে ছটফটিয়ে উঠল। লজ্জায় এবং ভয়ে তার মুখ দিয়ে কথা বেরুল না। চোখ তুলে ভালো করে তাকাতে পারল না।

রাসু বলল, বিচার করুন কম্পাউণ্ডারবাবু।

রসিক বলে যার খ্যাতি, রোয়ানীদের আঁতের লোক বলে যার নাম, সেই সক্‌নাও বলে উঠল, হ্যাঁ, বিচার করেন কম্পনডরবাবু। মাগীগুলোন একেবারে ক্ষেপে গেছে।

কিন্তু কার বিচার করবে বিভাস। এবং কিসের বিচার করবে। কেউ তো ফিরেও দেখছে না। কথাও শুনছে না। নিজেদের নিয়েই মত্ত। দলের ভিতরে ঢোকার সাহস নেই বিভাসের। রাসু তো রীতিমতো দূরত্ব বজায় রেখেই দাঁড়িয়েছে।

বিভাস বলল রাসুকে, ওদের আগে কাপড় পরতে বলুন। সক্‌না চেঁচিয়ে বলল, এই, এই বেটীরা, কাপড় পর, কাপড় পর।

একটি মেয়ে ভয়ংকর অশ্লীল ভঙ্গি করে, উরুতে চাপড় মেরে কী যেন বলে উঠল।

সক্‌না বলে উঠল, ওরে বল্, কম্পনডরবাবুকে বল্, তোদের কী হয়েছে।

পরমুহূর্তেই এক সঙ্গে কয়েকজন চিৎকার করে উঠল, এবং হাতাহাতির লক্ষণ দেখা দিল। সেই ভয়ংকর ছবি দেখে বিভাস অসহায়ের মতো বলে উঠল, এতো দেখছি, পুলিশ ছাড়া এদের কেউ সামলাতে পারবে না।

রাসু বলল ঠিক বলেছেন।

সে চিৎকার করে বলল, কম্পাউণ্ডারবাবু বলছেন, পুলিশ ডাকবেন, পুলিশ ছাড়া তোদের কেউ শায়েস্তা করতে পারবে না।

সহসা যেন সাপেরা মরণের মন্ত্র শুনে একেবারে ঢলে পড়ল। নিশ্চুপ হয়ে গেল। এ একটা অভূতপূর্ব আবিষ্কার বলা যায়। পুলিশের নাম শোনা মাত্র সব চুপ। অনড়। ভয়ে সন্দেহে ওদের নিঃশ্বাস পর্যন্ত পড়তে চায় না যেন। যে যা পারল, তাই নিয়ে ঘরে গিয়ে ঢুকল।

কিন্তু বিচারের জন্য কেউ আর এল না। কেবল সক্‌না বলে উঠল, পালাবে কি না কে জানে।

দেখা গেল, কেউ পালাল না। সবাই কাজে যাবার জন্যে প্রস্তুত হল। সমস্ত ব্যাপারটা ভোজবাজীর মতো রহস্যময় যেন।

পরে জানা গেছে, ঝগড়ার কারণ সুদূর এবং বহু। নিজেদের মধ্যে চুরি, দলাদলি এবং দেশের পুরনো বিবাদের বিষ। সব থেকে ভয়াবহ অবিশ্বাস্য এবং বিস্ময়কর, পরস্পরের জুটি ভাঙাভাঙি। এটা একটা প্রথা কি না, বিভাস জানে না। রাসু আর সক্‌না বললে সে বিশ্বাসও করত না। কিন্তু ওদের মুখ থেকেই বিভাসকে শুনতে হয়েছে লজ্জার মাথা খেয়ে নারী পুরুষের মতোই, ওদের কারুর কারুর জুটি আছে। আর সে বিকার দেহকে আশ্রয় করেই। তার ভঙ্গি এবং উপকরণও নাকি আছে।

প্রায় বমি করে ফেলার মতো একটা অনুভূতি ঘুলিয়ে উঠেছে বিভাসের মধ্যে। পরে যখন আবার ওদের দেখেছে, তখন আর কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারেনি।

আর একদিন। এক মেঘ ছাওয়া কালো কুচকুচে দিনে, মাঠের মধ্যেই মেয়েরা চিৎকার করে গান ধরে দিল। বলাবলি করল, যে-বাবুর মাঠ চাষ হচ্ছে, সে বাবুর পয় খুব। ভাল ফসল হবে। আর অল্পবয়সী একটি মেয়েকে ঘিরে সকলেই নাচানাচি করল। বিভাস দেখল, অল্পবয়সী মেয়েটির সঙ্গে সক্‌নার খুব ভাব। ওরা দুজনেই, উঁচু আলের আড়ালে, কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে রইল। বাকী মেয়েরা কেউ আপত্তি করল না। বরং মেয়েটির লজ্জা ভাঙিয়ে, সক্‌নার সঙ্গে জোর করেই ভিড়িয়ে দিল। অথচ, অন্য সময় কুঞ্জবনে মত্ত হস্তীর মতো সক্‌নাকে ওরা তাড়া দেয়।

কথাটা লজ্জায় কোনদিন সক্‌নাকে জিজ্ঞেস করেনি বিভাস। সক্‌নাও তাকে কিছু বলেনি। কাউকেই বলেনি। কিন্তু অবাক লাগে এই ভেবে, ব্যাপারটা কোথাও কোনো বিভ্রাটের সৃষ্টি করল না। মেয়েদের সঙ্গে সক্‌নার সম্পর্ক যা ছিল, তাই রইল। এমন কি, তারপরেও মেয়েটির সঙ্গে সক্‌নার সম্পর্ক আর দশজনের মতোই দেখা গেল। তারা ভালবাসল না কিংবা প্রেমে পড়ল না। কেবল মেয়েটি একদিন বিশ্রাম নিল, কাজে বেরুলো না। তিনদিন

স্নান করল না। চতুর্থদিন স্নান করল, আর সিঁদুরের টিপ পরে কাজে গেল।

মাঠের ঘটনাটা বিভাসের চোখে পড়েছিল বলেই পর পর কদিন লক্ষ্য করল। রাসু এসে মাঝে একদিন বলল, একটা মেয়েমানুষের ইয়ের সময় যাচ্ছে, তাই কাজে যায় নাই। বেচারীর একদিনের রোজ গেল। মেয়েমানুষের ওই এক ইয়ে। পিরীতি মাসেই…যাক গে, ভগবান মেরেছে।

তবু, সমস্ত ব্যাপারটা রহস্যময় থেকে গেল। কী যেন একটা ব্যাপার ঘটে গেল। প্রায় প্রত্যক্ষই বলা যায়। অথচ ঠিক বুঝে ওঠা গেল না।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভালই লাগে এই সব ঘর ছাড়া প্রবাসিনীদের। জীবনটা যে শ্রমের ভিতর দিয়ে, একটানা মসৃণ ভাবে গড়িয়ে চলে না, সেটা বোঝা যায়। আর এদের সবাইকে বীর্যবতী বলে মনে হয় বিভাসের।

বুনো আর সক্‌না চৌকিদার যদিও তারকেশ্বরের চাষের কাজ করে, আসলে খবরদারি করাই তাদের আসল কাজ। রোয়াবাহিনীর কাজের হিসেব রাখে তারাই। তাদের কথা অনুযায়ী বিভাস হিসাব মেটায়। তখন বাদানুবাদ হয়। সক্‌না আর বুনোর সঙ্গে ঝগড়া লাগে মেয়েদের। হাত দিয়ে মেপে নিয়ে আসে ওরা ; যতখানি জমিতে রোয়া হয়। কাঠি পুঁতে পুঁতে প্রতিদিনের কাজের হিসাব রাখে।

বোঝা যায়, বুনো আর সক্‌না চৌকিদার ইচ্ছে করেই হিসাবের গরমিল করে। বুনো বিশেষ নয়, সক্‌নাই পিছনে লাগে বেশি।

মেয়েরা সক্‌নার ওপরে যায়। সে কী প্রবল চেঁচামেচি। মনে হয় তারকেশ্বরের ভাড়ারখানায় যেন ডাকাত পড়েছে। সক্‌নার ঠোঁটের কোণে হাসিটা ওরা দেখতে পায় না। বিভাসের মনটা যেন খানিকটা বাতাস লাগা স্বচ্ছ জলের মতো টলটল করতে থাকে। উপভোগ করে এই ঝগড়া-বিবাদ। ইচ্ছে করে সেও খানিকটা চেঁচিয়ে নেয়। যেমন একটা হই-হুল্লোরের মাঝে পড়ে ছোটো ছেলেরা মানে না বুঝেই হাততালি দিয়ে চেঁচাতে থাকে।

আরও ভাল লাগে যখন বুঁচি আসে। সক্‌না চৌকিদারের বউ বুঁচি। কালোকুলো বউটি। বুঁচি বলে একেবারে বুঁচি নয় সত্যি। চোখে মুখে বেশ ধার। ঝিনুক রং পাথরের নাকছাবি কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে যখন চোখ পাকিয়ে চায়, তখন রীতিমত ভয় করে। শরীরে গাছকোমর বেঁধে যখন আসে, তখন দেখে মনে হয় না, বুঁচি পাঁচটি সন্তানের মা।

সক্‌না একটু বেশি রসিক। বুঁচি তাই অনেকবারই মাঠে ঘাটে বাজারে আসে সক্‌নার তত্ত্ব-তল্লাস করতে। রসিকদের ঢলাঢলি একটু বেশি, তাই বুঁচির আঁটন বাঁধনও একটু কড়া।

মিথ্যে নয়, সক্‌নার একটু বেশি মাখামাখি বাইরের মেয়েদের সঙ্গে। বয়স বেশি নয়। কাজেও খুব দড়ো। এমন কিছু লম্বা চওড়া নয়। কিন্তু

দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে বেশ শক্তি ধরে। কালো কুচকুচে রং মাথায় বাবড়ি চুল। গলাখানিও মন্দ নয়, গান গাইতে পারে। লাঙল দিতে বল, কোদাল চালাতে বল, আর ক্রোশের পর ক্রোশ এঁটেল কাদা মাড়িয়ে বুড়ো বলদের গাড়ি চালিয়ে নিয়ে যেতে বল, সব পারে।

এমন পুরুষের ওপর সব মাগীরই নজর থাকে, একথা জানা ও বিশ্বাস দুই-ই আছে বাঁচির। না আগ্‌লালে বাঁচিরই যাবে। কথায় বলে 'জন-জরু, ধান, অনাগলালে যান।' বাঁচির কপাল মন্দ। জরুর বদলে তাকে সক্‌নাকেই আগ্‌লে ফিরতে হয়।

তাই দিনের মধ্যে অনেকবার ছুটে ছুটে আসে বাঁচি। হাতে-নাতে ধরাও পড়ে সক্‌না। রোয়ার কাজে গিয়ে, সক্‌না হয়তো কোনো কোনো মেয়ের হাত ধরে বলে, দাও, দাও দেখি আমারে ; তুমি একটু জিরিয়ে নাও।

গায়ে হাত দেওয়াটাই আসল উদ্দেশ্য। মেয়েরা গা থেকে ধুলো ঝাড়ার মতো সক্‌নার হাতটা সরিয়ে দিয়ে হাসে খিলখিল করে। সক্‌না ততক্ষণ রুইতে শুরু করে। রোয়ানীরা নিজেদের ভাষায় কি সব বলাবলি করে নিজেদের মধ্যে আর হেসে মরে যায়। সক্‌না অমনি অঙ্গভঙ্গি করে। নাচ আরম্ভ করে দেখায়। গলাও বাধা মানে না। হয় তো গান ধরে।

রাধে ফিরে চেয়েছে গো—
রাধের মান ভেঙেছে গো।

বুনো এসব নিজে করে না। কিন্তু আনন্দ পায়। সে হাততালি দেয়। আর ঠিক সেই সময়েই হয় তো বড় হিজলের তলায় বাঁচি এসে দাঁড়ায়। কোমরে হাত আর চোখে আগুন। একেবারে রণং দেহি।

প্রথমে বুনোরই চোখে পড়ে। বলে ফিস্‌ফিসিয়ে, হেই, হেইরে চৌকিদার, তোমার বউ।

বউ? সক্‌না অমনি ছুটতে ছুটতে একেবারে বড় হিজলের তলায়। বলে, কি করতে এলি?

বাঁচি চোখ পাকিয়ে, চিবিয়ে চিবিয়ে বলে, তোমার নাগরপনা দেখতে। সক্‌না অমনি হেসে উঠে বলে, তোর খালি এক কথা। আমি কি নষ্ট হয়েছি?

বাঁচি ভেংচে বলে, নাঃ। একেবারে আখামচা গুড়ের নাগাড়ি তুমি। কোথাও তোমার দাগ লাগেনি একটু।

বলে বাঁচি কোমরের কাপড়ে নতুন করে পাক দেবার আগেই, বাঁচিকে হাত দিয়ে জাপটে ধরে বলে সক্‌না, আরে দুর পাগল কমনেকার। ভগবানের দিব্যি করে বলছি কিছু হয় নাই, মিছিমিছি রোখ্‌পাক্‌। চঃ বাড়ি চ।

কিন্তু বাঁচির রোখ্‌পাক্‌ তাতে কমে না। বলে, কেন, ওদের সঙ্গে অত মাখামাখি কিসের শুনি?

মাখামাখি দেখলি কমনে ? ঘরে গিয়ে শুয়েছি না কোলে মাথা রেখেছি। ওরা কি আমার বুঁচি নিকি ? তোর যেমন কথা ! আচ্ছা চ, আর গান গাইব না ওদের কাছে।

বুঁচির চোখের আগুন সহজেই নিভে যায়। হাসে, লজ্জাও পায়। তবু বলে, ও মাগীগুলানরে আমি ঝেঁটিয়ে গাঁ ছাড়া করব। ব্যাটাছেলের সঙ্গে ওদের ঢলানি কিসের ?

বিভাসের সঙ্গে দুজনের সমান ভাব। বুঁচি আর সকুনার।

সকুনার আড়ালে বুঁচিকে সে জিজ্ঞাসা করে, সকুনাকে কি সত্যি তোমার খারাপ বলে মনে হয়, চৌকিদার বউ ?

বুঁচি চোখ কপালে তুলে বলে, আপনার মাথা খারাপ নাকি গো, কম্পুনডারবাবু ? মানুষটা না নিষ্যস ভালোমানুষ ? ভালোরে খারাপ করবার জন্য সম্সারে কত কি হয়, তা জানেন ?

বিভাস জানে না।

বুঁচি বলে, তবে ? ভালোমানুষ বলেই তো ভয় আমার বেশি, কম্পুনডার-বাবু। কখন দেখব, কপাল পুড়ে বসে আছে। আগলে না রাখলে সবই মন্দ হয়ে যায়। আমার তো আর দুটো নেই, এ্যাট্টা। তবু তাবৎ ডাইনীগুলনের মনে থাকবে, বুঁচি চৌকিদারণী আছে। অমন পুরুষ আর কই ?

বিভাস হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বুঁচির দিকে। সকুনার মতো এত বড় ভালবাসার পুরুষ বুঝি পৃথিবীতে নেই ? বুঁচির চোখে এ কিসের স্বপ্ন ? যেন এত বড় স্বামীগরবিনী আর নেই কোথাও।

বুঁচি না থাকলে, সকুনা বলে বিভাসকে, একটু ফষ্টিনষ্টি করি, কম্পনডারবাবু। না করে পারি না। কিন্তুন্, চৌকিদারণী আমারে সতরো বছোর ধরে নিজের ছেলের মত লালন করছে। সত্যিসত্যি কি আর আমি অপর মেয়েমানুষের ঘর করতে যাব ?

বিভাসের ঢোক গিলতেও কষ্ট হয়, বলে, ছেলের মতো কি হে ? তোমার বউ না ?

সকুনা এক গাল হেসে বলে, এই দ্যাখেন, বউয়ের মধ্যে মা নাই ? সব পুরুষ তো আর একরকম না। ব্যাদড়া ছাওয়ামীটারে ধরেও তো শান করতে হয়। না কি বলেন ? ছেলে দুঃখু পেলে, ব্যামো হলে মেয়েমানুষ যেমন করে আগলায়, সোয়ামীরেও তেমনি করে। বুঁচির মতন করে।

বিভাস বোকার মতো তাকিয়ে থাকে অবাক হয়ে। আর একটা বিমূঢ় শব্দ বেরোয় তার গলা দিয়ে, অ !

সকুনা ছেলেমানুষের মতো হেসে বলে, হ্যাঁ কমপনডারবাবু। বুঁচি বলে দ্যাখ চৌকিদার তুমি বড় দুরন্ত, আমার মন ভালোলাগে না। তা বাবু এট্টু দুরন্ত আপনাদের চৌকিদার। দুরন্ত ছাওয়ালের মতন সাঁজবেলায় মন বড়

আন্‌চান্‌ করে। তখন বাঁচির কাছে যাবার জন্য গতরটার মধ্যে কেমন করে। ভাবি কি বলে, বাঁচিরে বুঝিন এ জীবনে আর দেখতে পারবো না। কেন বলেন তো, কমপনডারবাবু, এরকম মনে হয় কেন?

সকুনার অসহায় বিস্ময় প্রশ্নের সামনে বিভাসকে একটি আচ্ছন্ন বোবা, কালা মানুষের মতো মনে হয়। শুধু তার চোখদুটি চিকচিক করে। জলে নয়, কোন সুদূর অন্ধকার থেকে ছিটকে আসা আলোর মতো। হঠাৎ যেন তার প্রাণটা বড় কাঙাল হয়ে ওঠে, হাহাকার করে ওঠে, সকুনা-চৌকিদার আর বাঁচির ভালোবাসার জন্য। অমনি বউয়ে আর মায়ে মেশামেশি একটি মেয়ে। তার সারাদিন দুরন্তগিরি করে ফেরা, সারাদিনের একটি ভয়, সাঁঝবেলায় পরম নির্ভয়ে ফিরে আসা একটি ভালোবাসার জন্যে যেন বড় বেশি ব্যাকুল হয়ে ওঠে বিভাস।

বিদ্যুতের কথা মনে পড়ে। বিদ্যুতের সেই নিঃশব্দ, টেপা-ঠোঁট, স্থির অপলক চোখ। বিদ্যুতের সারাদিনের ভয় হয়ে কি কখনও ফেরে বিভাস। কি জানি। কিন্তু বিভাসের তো কখনো সাঁজবেলায় মনে হয় না, ফিরে গিয়ে বুঝি দেখতে পাব না বিদ্যুতকে।

কিন্তু বিদ্যুতের কাছে যেতে ইচ্ছে করে।

আর পদ্ম? ও তো একটি মেয়ে। মুখ ভরে, চোখ ভরে, শরীর ভরে অনেক হাসি নিয়ে যে মেয়ে·একটি করুণ ছায়া শুধু।

পদ্মর বাতাসটাও গায়ে মাখতে ইচ্ছে করে বিভাসের।

তবে? ভালোবাসার জন্য কেন অমন কাঙাল হয় সে, হাহাকার কেন করে?

॥ নয় ॥

আবার ইউনিয়ন বোর্ডের কথা ফিরে আসে। কৃষিঋণ, রিলিফ, বেনামী-নামী, আর উদ্‌বৃত্ত জমির প্রসঙ্গ। আবার বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বিভাস।

মন নিয়ে নানান জ্বালা হয়েছে বিভাসের। কখনো ব্যাকুল, কখনো বিক্ষুব্ধ। মন বড় উত্তরঙ্গ। তার যেন দিক নেই, দিশা নেই। অস্থির চঞ্চল, এক জায়গায় পাক খায়, দহে প'ড়ে ঘূর্ণি ওঠে। কোন গতি নেই।

মন হাহাকারও করে। রাগে জ্বলে উঠতে ইচ্ছে করে কখনো, কখনো বড় কাঙ্গাল মনে করে বেদনায় ভার হয়ে যায় মন। বুকের রুদ্ধ গর্জনটা নিজেকেই উপহাস করতে থাকে। এ যে বড় বিড়ম্বনা। জীবনের কি কোনো মানে নেই নাকি তাহলে?

আঁচনার দিন গড়িয়ে যায়। দিনটা যায় খুব ধীরে ধীরে। রাত্রি যায় হুস্ করে। জল ভাদুরে ভর-ভর থির, আকাশ শুকুশুকু। রোয়ানীরা চলে গিয়েছে।

সক্‌নাটা অসময়ে নিজের জমির কাজে লেগেছে। মাগ-ভাতারেই লাগতে হয়েছে। জন খাটাবার পয়সা নেই। ইউনিয়ন বোর্ডের চৌকিদার। মাইনে করা চাকরের চেয়েও প্রেসিডেণ্টের বড় চাকর সে, তারকেশ্বরের কাজ শেষ না করে নিজের কাজ করে কেমন করে?

এদিকে মাঠে মাঠে চাড়া দিয়ে উঠেছে সবুজ চারা। আকাশের মেঘ কেটে নীলিমায় দিগন্ত উদ্ভাসিত হচ্ছে। সময় আর নেই। সোয়ামী ইন্তিরির বুকে বড় ধুকপুকানি।

একদিন ঈশানের সঙ্গে দেখা হল বিভাসের। মাঠের কাজের সময়। অনেক দিন আসতে পারেনি। পথচলা বন্ধ রাখতে হয়েছে।

তারকেশ্বরের সঙ্গে এক রোগীর বাড়িতে গিয়েছিল বিভাস। একলা ফেরবার পথে বাউলপাড়া। পথের ওপর ঈশানের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা। একতারা আর ডুগি নয়, কোদাল কাঁধে, হাতে পায়ে কাদা। মাঠ থেকে ফিরছে ঈশান। মাথায় চুড়ো করা নয় চুল, এলো খোঁপার মতো বাঁধা। বিভাসকে দেখে দাড়ি উড়িয়ে হাসি। খালি গায় ঈশান বেশ শক্তপোক্ত নিটুট কঠিন। বললে, আরে বাবা! কতকাল পরে দেখা। চলেন, ঘরে চলেন।

আপত্তি না করে বিভাস গেল ঈশানের সঙ্গে।

প্রাচীন পাড়া আঁচনার। কিন্তু বর্ধিষ্ণু নয়। শ্রীছাঁদও নেই তেমন। নিকনো পিকনো তকতকে কোথায় চারদিক? বাউলপাড়া যেন সত্যি ভিখিরিদের পাড়া। নিচু জমি, নিচু ঘর, নিচু দাওয়া। এক পশলা বৃষ্টি হলেই পাড়া ভেসে যাবার কথা। তার ওপরে গোটা বর্ষাটা গিয়েছে। এখনো আছে শরতের বিনা নোটিশে যাওয়া-আসা। চালে খড় নেই, দাওয়াগুলি পাড় ভাঙা নদীর কিনারের মতো।

কোথায় বসতে দেবে বিভাসকে, ভেবে অস্থির। বাউল পাকা গৃহস্থের মতোই হাঁকাড় পেড়ে বলল, ওগো ও জয়ের মা, দাদাভাইকে বইসতে দিব কমনে গো?

দাদার সঙ্গে ভাই জুড়েছে ঈশান।

ঈশানের একপাল ছেলেমেয়ে, চারদিক থেকে উঁকিঝুঁকি মারছে। জয়ের মা বাউলানীও ঘোমটা ঢেকে এল।

বিভাস পড়ে-থাকা ঢেঁকিটাকে দেখিয়ে বলল, এখানেই বসি।

না না, ওটা ময়লা।

ঈশান হেসে হেসে গান গেয়ে উঠল:

কোথায় তোমায় বসতে দিব ?
ভুঁইয়েতে রয়েছে ধুলো
বুকেতে তমসা কালো
এ ধন আমি কোথায় থুবো ?

বাউলানীর এত কথা ভাবতে গেলে চলে না। সে ততক্ষণে একটা জলচৌকি এনে বসিয়ে দিয়েছে সজনে গাছের ছায়ায়। জলচৌকির ওপরে গেরুয়া কাপড় পাতা। তারপর ঘোমটার আড়াল থেকেই বলল জয়ের মা, মাথায় রাখলে উকুনে খায় ভুঁইয়ে রাখলে পিঁপড়ে খায়, সেই দশা।

ঈশান বিগলিত হয়ে বলল, দ্যাখেন, শোনেন জয়ের মা-র কথা। আমার সোনার ধন রাক্ষসে খাবে সেই ভয় দেখাচ্ছে।

পরিচয়ের প্রয়োজন হল না। ঈশানের বউ যেন চেনে বিভাসকে, আরও দু'চারজন এল কৌতূহলের বশে। বিভাসকে দেখে ঈশানের মতো খুশি নয় কেউ কারণ সে তারকেশ্বরের লোক। তবে ঈশানের মতে বিভাস দশজনের মানুষ।

চাষবাসের কথা উঠল। এ অঞ্চলের মাটি ভাল নয়। রবিখন্দ ভাল, ধানের টানাটানি চিরকাল। মাটিতে জোর নেই, গা ছাড়া-ছাড়া ভাব। পাটের চাষটা বরং ধানের চেয়ে ভাল।

তারপরে কথায় কথায় জানা গেল, কেন তারকেশ্বর কিছুদিন ব্যস্ত ছিলেন। অনাদি মুখুজ্যের সঙ্গে সলাপরামর্শ শেষ হয়েছে। তারকেশ্বর কো-অপারেটিভ করবেন। কৃষকদের দুর্দিনের কাণ্ডারি হবে কো-অপারেটিভ। ফসলের কথা বলা যায় না। ঘরে বাইরে কখন কি বিপদ-আপদ ঘটে। কো-অপারেটিভ থাকলে জানবে, মাথার ওপর ভগবানের স্থিতি। শেয়ার তো টাকা দিয়ে কেনার জিনিস নয় এখানে, জমি লিখে পড়ে দিয়ে মেম্বার হতে হবে। তোমার জিনিস তুমিই গড়বে। নিজের ছেলে ডাগর করার মতো। ছেলেকে ডাগর সেয়ানা করে তুললে সে তোমারই কাজ করে, কো-অপারেটিভ তেমনি কষ্ট করে, দিয়ে থুয়ে গড়ো। তারপর নাক ডাকিয়ে ঘুমোও। মামলা-মোকদ্দমা বল, অভাব-অনটন বল, তোমার জন্য লড়বে কো-অপারেটিভ নয় 'কপারটিপ'। অসুখ হয়েছে তোমার, মাঠে কাজে নামতে পারছো না ? জনের অভাব ? কোনো চিন্তা নেই। কপারটিপের জন গিয়ে কাজ করবে তোমার জমিতে। সরকারি সাহায্য তো আছেই। নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করাই ভাল। চাই কি কপারটিপ একদিন 'টাকটোর' নামিয়ে দেবে মাঠে। হাল চালাবার দরকার হবে না, যন্ত্রেই মাটি ফালা-ফালা করে দেবে। এক-এক দিনে বিঘে-বিঘে জমিতে কলের লাঙল কাজ করবে।

বিভাসের মুখ থমথমিয়ে উঠল। এত বড় একটা ভাল কাজের কথা শুনেও খুশি হল না সে। হাতে কলমে কাজ শুরু করেননি তারকেশ্বর,

তাই বিভাসকে এখনো প্রয়োজন হয়নি। তাই জানতে পারেনি বিভাস। কিন্তু কপালে বাজ পড়ল বিভাসের। তার চোখের সামনে বুকে-হাঁটা জীবের নিঃসাড়ে শিকার ধরার ছবি ভেসে উঠল। কো-অপারেটিভ উদ্‌যোগ আয়োজনে আজ যোগেশ ঘোষালের নাম শুনলে, এরকম মনে হত না বিভাসের। সে যেন দেখতে পেলে, আঁচনা, পয়ারপুর, নেদো ইউনিয়ন বোর্ডের গোটা সীমানা, পুরো মহকুমা ঘিরে একটি অদৃশ্য জাল ঘিরে আসছে। তারকেশ্বরের শক্ত চোয়াল, মোটা নাক, স্থির অপলক চোখ দেখতে পেল সে। দেখতে পেল, অনাদি মুখুজ্জের মুখ ও গলার শিথিল চামড়া, স্থির-নিঃশব্দ চোখ-খাবলার গলকম্বলের মতো কাঁপছে।

ঈশান বলল, দাদা-ভাইয়ের মতামতটা শুনি? কিসে কি হয়, বুঝি না তো।

বিভাস দেখল, সকলেই তার মুখের দিকে তাকিয়ে রয়েছে। কিন্তু ভিতর বাহির এক করতে তার সাহস হয় না। মনের কথা মুখে আনতে আটকে যাচ্ছে। কিসে থেকে কি হয়, বুঝতে পার না তো চাষবাস সংসার রেখে লাভ কি? চিরদিনই এ-রকম ন্যাকা থাকলে হবে? না, ন্যাকান্যাকা কথা বললেই চলবে?

তবু একটু নীরস গলাতে বলল সে, তা কাজটা তো ভালই।

ঈশান হেসে বলল ভাল তো অনেক কিছু শুনতে পাই গো, দাদাভাই। ভাল সবাই কইরতে চায়, আমাদের কপাল মন্দ যে! সকলে কয়, তুমি আমাদের লোক। কিন্তুন তোমার মতামতটা একবার কও, আমরা শুনি। বিভাস উঠে দাঁড়াল। বলল, ওসব আমি জানি নে। তোমাদের বিষয় তোমরাই বোঝ। আমি কোনো কথা বলতে পারব না।

এমনি উঠে দাঁড়ানো, এই বিরক্তি যেন পরিষ্কার প্রতিবাদের মতোই। মুখ ফুটে বলা যাচ্ছে না। সারা শরীর দিয়ে বোঝানো।

ঈশান বলল, বইস, যাও কমনে? আমার একখান্ নাইরকেল গাছ আছে, ডাব পাড়ানো হইছে। জল খেয়ে যাও।

ডাব আনানো হল, জল খেল বিভাস। কিন্তু ঈশানের কালো চোখের কোণে আর দাড়ি ভরে হাসিটা সহ্য হচ্ছে না। যেন বিভাসের বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখতে পেয়ে সে হাসছে অন্তর্যামীর মতো। রাগ হয়, অস্বস্তিও হয়। বুঝে থাকলে বুঝেছে। এত ঢঙ করার কি আছে। আবার দুড়মো ডাবের বুকে কোপ বসিয়ে, গুন্‌গুন্ করে গাওয়া হচ্ছে;

সাফা জলের তল দেখা যায়
চেয়ে দেখ আপন আয়নায়।

যাক দেখা। মিথ্যে কথা বলতে পারবে না বিভাস। এখন থেকেই মনের মধ্যে তার দুর্যোগ লেগেছে। আবার কতকগুলি হিসেবের ওলটপালট করতে

হবে তাকে। হিসেবের গরমিল আর দলিলের কারচুপি বসে বসে করতে হবে তাকে চুপচাপ। আর এরা ছেলেমানুষের মতো কথা বলবে চিরদিন।

বিভাসের সঙ্গে সঙ্গে ঈশানও গেল খানিকটা। আকাশের যেটুকু নীল, সেটুকু বড় বেশি নীল। রোদপড়া আয়নার মতো ঝকঝকে। যেন চোখ রাখা যায় না। যেন সাদা। এ পাড়ার কালো বুড়োদের দাড়ির মতো। বাতাসে তাপ, সঙ্গে পাট পচার গন্ধ।

মিথ্যে নয়, পাড়াটা বাউলপাড়া-ই, লোকগুলি চাষী, কিন্তু কথাবার্তা চলন-চাউনি অন্যরকম। মেয়ে পুরুষ সকলেরই। লোকে অবশ্য অন্যরকম বলে। বৈষ্ণবী ভেক্‌ধারিণী কয়েকজন স্বৈরিণী আছে পাড়ায়। আখড়া আছে বৈষ্ণবদের। ঈশানের কথায়, আমরা বাউল আছি ঘর কয়েক, বাকী পাড়াটা আউলে আর বোষ্টমদেরই।

তবু বাউলপাড়ায় বেশি যাতায়াত করলে আঁচনার দুর্ণাম হয়। কখনো গেছিলে? বাউলপাড়ায়? হুঁ! বোঝা গেল। চোখে ঠোঁটে একটু হাসি খেলে যায় লোকের। রাসুর বাউলপাড়ার আসক্তি অনেক আগেই জানে বিভাস। ঈশান বলেছে বিভাসকে, এ কথার মধ্যে কিছু সত্য আছে। আঁচনার হাটে হাট করা খোলা-ঘরের জীবিকা নয়। পাড়ায় কিছু বকধার্মিক আছে। ফলের চেয়ে আঁটি বড় হলে যা হয়। মুরোদের মান নেই, বাবাজীর ঘরে কাঁড়িখানিক মেয়েমানুষ। ভাত কুড়কুড়োয় না যৌবন কুড়কুড়োয়? ঘেন্নার কথা বলে চিপ্‌টেন কেটে লাভ নেই। দুয়েরই ক্ষুধা আছে জীবের। তাই স্বৈরিণী আছে।

তার সঙ্গে আর একটি সত্যি কথাও বলেছে ঈশান। বলেছে, যাদের অন্দরমহলের পাঁচিল নেই, দরজা নেই, সব দরজা খোলা, আগ্‌দুয়োর নেই—পাছদুয়োর নেই, এক চাটাইয়ে বসে মেয়ে-পুরুষ কথা বলে খোলা উঠোনে, ছোঁয়াছুঁয়ির ভেদ নেই, পান থেকে চুন খসলে জাত যায় না, পর-পুরুষের সঙ্গে কথা বললে যাদের ঘর থেকে ঠ্যাঙা নিয়ে বেরোয় না, সমাজে তাদের একটু দুর্ণাম হবেই। রোধ করবে কে?

বাঁধন নেই, তাই দুরন্ত। কিন্তু সে কি আসলে মন্দ? দুরন্ত তো দুষ্ট নয় দাদাবাবু।

খট্‌ খট্‌ শব্দ বাজছে। বড়বড় আকাশ-খোঁচানো ঘিঞ্জি বাঁশঝাড় প্রতিধ্বনি তুলছে খট্‌ খট্‌ খটাখট। বাউল-বোষ্টম-আউলেরা জাতে তাঁতি নয়, কিন্তু কাপড়ও বোনে। সবচেয়ে সম্পন্ন বাউল পরমেশের বাড়িতে তিনটি তাঁত আছে। জীবিকা তো চাই মানুষের।

কিন্তু ঈশান পিছন ছাড়ে না। বাউলপাড়া শেষ হয়ে এল। খালের জলে পাট ধুচ্ছে চাষীরা। গাদা গাদা পচছেও। স্রোতের জল নদীর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী খাল।

জলে টান থাকবে বৈ কি! কিন্তু টানের জলে পাট ভাল পচে না। সুতো ভাল খোলে না।

সাঁকোটার দিকে একবার ফিরে তাকালো। ভাঙ্গা সাঁকো, যেন জীবন্ত একটা বড় জানোয়ার। হাঁটু ভেঙ্গে, মুখ থুবরে পড়ে আছে। কোন বর্ষাতেই সাঁকো টিকে থাকে না। বর্ষার ঢল নামতেই সাঁকো ঘাড় গুঁজে পড়ে। প্রতি বছরই নতুন হয়।

পারাপার করে বাউল পাড়ারই সজন। ছোট নৌকো, ছোট খাল। লগির এক খোঁচায় ওপার যায় আর এক খোঁচায় এপার আসে।

ঈশান চায় কি? ফেরে না কেন?

পাখিগুলি ডাকছে কোথায় বসে কে জানে। পৃথিবী কখনোই চুপ করে না। শোনার কান থাকলে, দিনে রাত্রে সব সময়ই কিছু না কিছু শোনা যায়।

বিভাসও তো চুপ করেই থাকে। কিন্তু কান পাতলে শোনা যায়, অষ্ট-প্রহরই তার বুকের মধ্যে কিসের শব্দ বাজছে। নানান শব্দ। যেমন এখন বাজছে, কো-অপারেটিভ, জোচ্চুরি, ঠকানো, ষড়যন্ত্র। আর বুকের মধ্যে একই সঙ্গে বাজছে, 'এবার আমি আর কিছুতেই এ-সব পারব না। নতি স্বীকার করব না।'

হঠাৎ সে বলল ঈশানকে, এবার ফিরে যাও।

ঈশানের সেই হাসি। সুন্দর হাসিটি দেখলে এক এক সময় এমন গা জ্বলে যায়। বলল তা হইলে মতামতটা বললেন না দাদাভাই?

বিভাস বলল, আমার বলার কি আছে! সাফা জলের তো তল দেখা যায় বললে! নিজেদের কর্তব্য দেখতে পাও না?

ঈশান বলল, জল যে ঘোলা, ঠাহর পাই না।

বিভাস সজনের নৌকোর দিকে চোখ রেখে বলল, তবু তো অনেক দিনের চেনা। এ ঘোলা জলের সঙ্গে তো তোমাদের অনেক দিনের কারবার।

ঈশান চুপ করে রইল দাড়ি-ভরতি হাসি নিয়ে।

নৌকোয় উঠে বলল বিভাস, একটু তলিয়ে দেখতে চেষ্টা কর এবার।

নৌকো এক ঠেলায় ওপারে গিয়ে ঠেকল। ঈশান তাকিয়ে রইল তেমনি।

কোন জমি, কার জমি, অপরের ধান রয়েছে কিনা এখনো সেই মাঠে, সে কথা বলবার নাম নেই। যেন, ওঠ্ ছুঁড়ি তোর বিয়ে। তারকেশ্বর স্নেহ করে নোটিশ জারি করলেন বিভাসকে, আজকেই—এক্ষুনি যেতে হবে তাকে তারকেশ্বরের সঙ্গে রেজেস্ট্রি অফিসে। বিভাসের নামে জমি কেনা হবে।

জীবনে এটা একটা নতুনত্ব। বিভাসের জীবনে নতুন স্বত্ব ক্রয় হতে চলেছে। মনের মধ্যে এক বিচিত্র অনুভূতি তার। নিজের খাটুনির পয়সায়, নিজের অস্থাবর সম্পত্তি। নিজের, তার নিজের। কেমন যেন অদ্ভুত আশ্চর্য।

খুশিতে ভরে উঠেছে মনটা। তবু, একটি সংশয়ও ছায়ার মতো ছড়িয়ে রয়েছে চারদিকে। কিন্তু মাঠে মাঠে আমনের ফসল। কোন জমি কেনা হবে তার নামে? কার জমি?

তারকেশ্বর গম্ভীর গলায় প্রায় ধমকের সুরে বললেন, অত খোঁজে তোমার দরকার কি? ছিনিয়ে নিতে যাচ্ছ না, চুরি করতে যাচ্ছ না। অত ভাবনা কিসের?

তা তো বটেই। ফাঁকি তো দিতে যাচ্ছে না বিভাস কাউকে। রীতিমতো লেখাপড়া দলিল-দস্তাবেজের ব্যাপার। তারকেশ্বর বললেন, প্রায় দেড় বছর হতে চলল এসেছ, কাঁচা পয়সা তো একটিও পাওনি। তোমার পাঁচশো টাকা জমেছে আমার কাছে। সাড়ে তিনশো টাক ; ভটে সহ পাঁচ বিঘে জমি। চল দেখিয়ে নিয়ে যাব।

বেলা হতে পারে। তাই খেয়ে যেতে হবে। খেতে দিয়ে বিদ্যুৎ আড়াল থেকে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। বিদ্যুতের চাউনিতে যেন অবসাদ। জমি কেনার সংবাদে তার মুখে খুশির ভাব দেখতে পেল না বিভাস। বরং পদ্ম চোখমুখ কুচকে ভেংচে জিভ দেখিয়ে, বুঝিয়ে দিয়েছে, জানি জানি মশায়, আপনার সম্পত্তি কেনা হতে চলেছে।

কেন জানি না, বিভাসের মনে হল, ভুবনেশ্বরীও যেন কোনো আড়াল থেকে তার দিকেই তাকিয়ে আছেন সস্নেহে।

তারকেশ্বর খেয়ে ওপরে গেলেন। পদ্ম বলল, বউদি আচাবার জল দাও, পান নিয়ে আসছি।

আচাবার জল দেওয়াই ছিল। ঢেলে দেবারও কথা নয়। তবু বিদ্যুৎ তাড়াতাড়ি ঘটি তুলে জল ঢেলে দিতে এল। জল ঢালতে ঢালতেই বলল বিদ্যুৎ, খুব খুশি হয়েছেন, না?

বিভাস গম্ভীর গলায় বলল, আপনি তো হননি দেখছি।

বিদ্যুৎ চুপ। বিভাস মুখ আ-ধোয়া রেখেই বলল, কি, কথা বলছেন না যে?

বিদ্যুৎ তবু চুপ। জল ঢালছে। বিভাসের হাতের ফাঁক দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে যেতে লাগল।

—কথা বলছেন না যে?

আর গম্ভীর থাকতে পারল না সে। চিন্তার ছায়া পড়ল মুখে। অবাক হয়ে তাকাল বিদ্যুতের দিকে। বিদ্যুৎ তবু চুপচাপ।

বিভাস আঁচাতে পারল না। কেমন যেন চাপা উত্তেজিত দ্রুত গলায় বলল, কথা বলুন!

বিদ্যুৎ বলল, কি বলব?

—কিছু বলুন।

—ভয় করে।

—কেন ?

—কারুর সম্পত্তি হতে দেখলেই ভয় করে।

—আমি মন্দ হয়ে যাব ?

—সেজন্যে নয়। আর কারুর ক্ষতি হয়।

বিভাসের মনের কথা। যে সংশয়ের ছায়াটা তাকে ঘিরেছিল, সেই সংশয়েই মরেছে বিদ্যুৎও। বলল, তা হলে যদি বলেন—

বিদ্যুৎ ত্রস্ত দৃঢ় গলায় বলল, না, না, তা হলে খুব খারাপ হবে। রেজেস্ট্রি করবেন, কিনবেন। নইলে আমি মাথা কুটে মরব। একটু দেখে শুনে নেবেন।

বিভাস চলে গেল বাগানে, তার ঘরে। কাপড়জামা পরে তৈরি হতেই পদ্ম এল। বলল, ইস্, আর তর সইছে না দেখছি। পান না নিয়েই চলে আসা হয়েছে। নিন।

বিভাস হাত বাড়াল। পদ্ম ঠোঁট টিপে, হাত পিছিয়ে নিল। ভাবল, এমন নির্জনে, যে-মেয়ে এমন করে আসে, তার সামনে একমাত্র বিভাসের মতো পুরুষই বুঝি এমনি নির্বিকার থাকে।

পদ্ম হাত বাড়িয়ে পান দিল বিভাসের হাতে। তারপরে হঠাৎ বিভাসের বোতাম-পটিতে হাত দিল। বলল, বোতাম লাগাবার কথাও মনে নেই বুঝি ?

বলে চোখের কোণ দিয়ে তাকাল পদ্ম। পরমুহূর্তেই চোখ নামিয়ে নিল। মুখে তার নিঃশ্বাস লাগছে বিভাসের।

নত মুখ বিভাসের। সে দেখল সুগঠিত পদ্মকে। গলায় চওড়া বিছে হার। হারের নিচে, সরে যাওয়া ব্লাউজের গভীরে, বিভাস দেখল, তার নিজেরই রক্ত পাক খেয়ে মরছে।

পদ্মর ঠোঁটে নির্ভয় ও সর্বনাশের হাসি।

বিভাসের মনে হল, দাঁতে দাঁত চেপে সে যেন তার অপরিচিত আত্মাকেই ঈশ্বরের মতো ডাকছে। সে যেন চিৎকার করে কাঁদছে, আর আষ্টেপৃষ্ঠে কঠিন বাঁধন ছিঁড়ে পালাতে চাইছে। সে চায়নি, একি ভয়াবহ অবিশ্বাস্য কথা, সে মন থেকে চায়নি, তবু তার সারা শরীরে রক্ত পাক খাচ্ছে। তার করুণা হচ্ছে, মায়া লাগছে। মমতায়, ছি, ছি, মমতায় রক্ত দাপাচ্ছে জ্বরো ভালুকের মতো। মনে হচ্ছে সে যেন কার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করছে। হ্যাঁ, নিশ্চয় তার মধ্যেও একজন বিশ্বাসঘাতক আছে। তার বুকের দু দিকটা তাহলে দুরকম। একটা দিক কালো। কুচকুচে কালো, অন্ধকার, অচেনা।

পদ্মর প্রতি করুণায় বিগলিত হয়ে কথা বলতে গেল সে। কিন্তু গলার স্বর স্খলিত বিমূঢ় শোনাল। বলল, তুমি খুশি হয়েছ পদ্ম ?

পদ্মর বোতাম লাগানো যেন শেষ হয় না। বলল, তবে কি দুঃখ হবে ?

চিরকালই একজনকে হা-ভাতে হয়ে থাকতে হবে বুঝি!

কী আশ্চর্য কথা পদ্মর। যেন অনেক দিনের পুরনো চেনা মানুষকে বলছে। তারপর সে আঁচল থেকে ফুল খুলে নিল। বলল, ঠাকুরের ফুল। মা দিয়েছে। বলেছে, শুভ কাজে যাচ্ছেন, সঙ্গে নিয়ে যান। বলে বিভাসের পকেটে গুঁজে দিল ফুল। দিয়েও পদ্ম সরল না। বিভাসের মনে হল, নদীর উঁচু পাড়ে চির খেয়েছে। ভেঙে পড়ছে। দুহাত দিয়ে বেষ্টন করল সে পদ্মকে। যেন দুষ্টু দীন দুঃখী মেয়েটাকে আদর করল। এবং মনে হল, আগুনের মতো তপ্ত স্বাদ পদ্মর ঠোঁটের, সেই আগুন তার মর্মে প্রবেশ করতে লাগল চুঁইয়ে।

বুনোর চিৎকার ভেসে এল, কম্পাউণ্ডারবাবু আপনার হল?

বিভাস বেরুতে গিয়ে বুঝল, পদ্মর মুঠোতে তার জামা। চোখাচোখি হতে পদ্ম ছেড়ে দিল।

একটু পা বাড়িয়েও বিভাস দাঁড়িয়ে পড়ল। একটা অসহনীয় সংশয়ের কষ্টে এবং উত্তেজনায় তার মস্তিষ্কের সমস্ত সীমায় যেন পাঁচিল তুলে দিয়েছে। সে আবার তাকিয়ে দেখল পদ্মকে। পদ্মর ঠোঁট দুটি শিমুল ফুলের মতো লাল দেখাচ্ছে। ফুলে উঠেছে। লজ্জায় সে নতমুখী নয়। দপ্দপ্ করছে একটি দীপ্ত শিখার মতো। একটু বাতাস লাগলেই শিখা লুটিয়ে পড়বে। আগুন ছড়িয়ে দেবে। সব জ্বালিয়ে দেবে।

কিন্তু চিকুর হানা ঝিলিকের মতো দুটি অদৃশ্য চোখের বিদ্রূপ কষায় বিভাস যেন থিতিয়ে যাচ্ছে। একটা অসহ্য কষ্ট আর যন্ত্রণায় সে স্থবির হয়ে পড়ছে। কিন্তু ভাবতে পারছে না। মস্তিষ্ক বন্দী। প্রায় অকারণেই সে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, পদ্ম আমার ওপর রাগ করো না।

পদ্ম কোনো জবাব দিল না। আবেগের আগুনে তেমনি দীপ্ত এবং সেই আগুনের উত্তাপে তার দৃষ্টি মুগ্ধ। স্থির নিবদ্ধ চোখ বিভাসের ওপর। ঈষৎ ফাঁক রক্তোষ্ঠের মাঝে তার সাদা দাঁতের সারি অল্প দেখা যাচ্ছে!

বিভাসের মনে হল, তার গলা দিয়ে কোনো শব্দ বেরিয়ে পড়বে। অস্ফুট উচ্চারণে কী বলল আবার, সে নিজেও জানে না। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে গেল। কিন্তু মনে হল তার বুকে একটা তাতানো লোহা বিদ্ধ হয়ে রয়েছে।

বাগান থেকে বেরিয়ে বাড়ির পিছন দিক দিয়েই তাড়াতাড়ি বাজারের রাস্তায় যাওয়া যায়। সেই পথ দিয়ে তাড়াতাড়ি যেতে গিয়ে থম্‌কে দাঁড়াল বিভাস। চুম্বকের মতো একটা আকর্ষণে সে নিশ্চল। প্রায় শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা। সে অনুভব করল পিছন দিকে রান্নাঘর আর রান্নাঘরের খোলা জানালায় দুটি চোখ তার প্রতি নিবদ্ধ। অবিশ্বাস বিদ্রূপ এবং ভর্ৎসনায় কঠিন সেই চোখ। কিম্বা হয়তো বিস্মিত ঘৃণা। বিভাসের মনে হল তার ঘাড়ের ওপর বিষম বোঝা। কিছুতেই যেন মাথা তুলতে পারছে না। কারণ

চোখ তুলে না তাকালেও সে ঠিক সেই চেনা জানালাটার সামনেই দাঁড়িয়েছে। যে জানালাটার সামনে নিচেই অদূরের জামরুল গাছের শিকড় গোসাপের মতো এগিয়ে এসেছে। থানকুনি আর ব্রাহ্মি শাকের আস্তরণ যেখানে পায়ের কাছে ঘন হয়ে রয়েছে। আর শ্যাওলা ধরা ইটের দেওয়াল। পলেস্তারা খসা ফাঁক ফাঁক। দেখলেই মনে হয় বৃশ্চিকেরা সেখানে সুখে বাস করে। এবং বিভাসের মাথার কাছেই সেই ছোট জানালা। অনুভব করছে, খোলা জানালায় সেই দুটি চোখ। সেই দুটি চোখ···নাঃ, কিছুতেই মাথা তুলতে পারছে না বিভাস।

—কী হল।

চাপা গলার বিস্মিত ত্রস্ত প্রশ্ন শোনা গেল জানালায়। বিদ্যুতের গলা—দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? শ্বশুরমশাই অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন, আপনার জন্যে বসে আছেন ডাক্তারখানায়। তাড়াতাড়ি যান।

মুখ না তুলেই বিভাস পা বাড়াল। কিন্তু অগ্রসর হতে পারল না। মুখ তুলে তাকাল। বিদ্যুতের বিদ্যুচ্চকিত চোখে স্নিগ্ধ হাসি উপছে পড়ল। বিদ্রূপ ভর্ৎসনা অবিশ্বাস নয়। যেন একটি করুণ বিস্মিত মমতায় মাখামাখি সেই হাসি। বিভাসের এত যে ভাবান্তর, এত যে উত্তেজিত এবং আপন ব্যবহার বশে কাতর তার মুখ, সে সব যেন বিদ্যুতের চোখেও পড়ল না। বলল, এত ভাববার কী আছে?

বিভাসের মনে হল, কী দুর্বোধ্য কথা তার মুখ দিয়ে বেরিয়ে আসতে যাচ্ছে। মুখ নামিয়ে সে আবার মুখ তুলতে গেল। বিদ্যুৎ ভ্রূ কুঁচকে, হেসে ধমকে উঠল, উঁহু, কোনো কথা নয়, যান তাড়াতাড়ি।

বিভাস পা বাড়াল। আর পিছন থেকে বিদ্যুতেরই চাপা স্পষ্ট গলা ভেসে এল, পানটা হাতে নিয়ে চটকাচ্ছেন কেন? মুখে দিন।

তাই তো। পদ্মর দেওয়া পানের খিলি হাতেই রয়েছে। চুন খয়েরের মেশামেশিতে বাসি রক্তের মতো দাগ লেগেছে। বিভাসের খেয়াল নেই। কিন্তু বিদ্যুতের চোখে পড়েছে। বিভাস ফিরে তাকাল। জানালা খোলা। গরাদের ভিতরে অন্ধকার এবং শূন্য। কেউ নেই।

বিভাসের মনে হল, একটা তীক্ষ্ন বিদ্ধ ব্যথায় সে বিদ্যুতের নাম ধরে ডেকে উঠল। কিন্তু তার আগেই সে পান মুখে দিয়ে, দাঁতে দাঁত চাপাল। পা বাড়াল আবার, আর সেই মুহূর্তেই সামনের বটগাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এল তাপস। তার সারা মুখে, গজ চোখে হাসির ঢেউ খেলছে। মাথা দুলিয়ে হাত তুলে, অস্পষ্ট স্বরে বলে উঠল, দেখেছি, দেখে নিয়েছি।

বিভাস চলতে চলতেই নীচু গলায় বলল, কি দেখেছেন?

লুকোচুরি খেলায় চোর ধরা শিশুর মতো খুশিতে তাপস দুলে দুলে বলল, আপনি তো বউয়ের সঙ্গে কথা বলছিলেন। আমার বউয়ের সঙ্গে—।

অনেক দিন শুনে শুনে, প্রায় হাবা তাপসের কথা এখন সব বুঝতে পারে বিভাস। তাপস অনেকদিন কথা বলতে দেখেছে। দেখলেই এরকম বলে। যেন কী একটা মজা।

বিভাস বলল, হ্যাঁ কথা বলছিলাম।

তাপস সঙ্গে সঙ্গে চলল বিভাসের। বিভাসের গায়ে গায়ে, তার পিঠে হাত রেখে। আর কথা না শেখা শিশুর মতো ঘড়ঘড়ে গলায় হাসতে লাগল। বলল, বউ আপনাকে খুব ভালবাসে।

—তাই বুঝি?

প্রতি মুহূর্তে হোঁচট খেতে লাগল বিভাস। তাপসের মুখের দিকে সে তাকাল না। কিন্তু তীক্ষ্ম বিদ্ধ ব্যথাটা বুকের কাছে উঠে আসতে লাগল।

তাপস বলল, হ্যাঁ। রাতে, রোজ শুয়ে শুয়ে আপনার কথা বলে। আপনাকে ভালবাসে, আর আমাকে ভালবাসে। আর কারুকে না।

পরমুহূর্তেই চোখ বড় বড় করে বলল, কারুকে বলবেন না যেন। তা হলে বউ বকবে, আর আমাকে ঘুম পাড়াবে না। মাথায় হাত বুলিয়ে দেবে না।

বিভাসের মনে হল, ব্যথাটা শ্বাসনালীর কাছে উঠে আসছে। বলল, না, বলব না।

বলতে বলতে সে তাপসের একটা হাত নিজের হাতে তুলে নিল। স্নেহে এবং ভালোবাসায় তার ব্যথাটা, জোয়ারের ভরা গাঙের মতো নিস্তরঙ্গ মৌনতায় ভরে উঠল।

তাপস হেসে ওঠে আবার। বলল, আর আপনার সঙ্গে ঝগড়া করতে বারণ করেছে। আমি তো খুব ভাল। তাই আমাকে বলে, লক্ষ্মীটি। আপনাকে বলে?

—বলে।

তাপস খুশি হয়ে হেসে উঠল। বলল, আর আমি কথা শুনলে, আমার গালে হামি দেয়। আপনাকে দেয়?

—না।

প্রায় একটা আহত পশুর মতো আর্তনাদ করে উঠল বিভাস। যেন পা মচকে গিয়ে, বেঁকে, থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সে। যেন কেউ তাকে গলা টিপে ধরেছে। শ্বাসরুদ্ধ কণ্ঠে সে হঠাৎ আর কিছু উচ্চারণ করতে পারল না।

তাপস করুণ বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করল, কেন?

তাপসের হাতটা দু'হাতে চাপ দিয়ে বিভাস ফিস্‌ফিস্‌ করে বলল, জানি না। এবার আপনি যান তাপসবাবু, বাড়ি যান। আপনার জন্যে ভাত নিয়ে বসে আছে। আপনি যান।

বিভাস হাত ছেড়ে দিল তাপসের। তাপস অবাধ্যতা করল না।

নির্বিকার ভাবে, ঘাড় কাৎ করে বলল, আচ্ছা।

বিভাস মুখ ফিরিয়ে নিল। কিন্তু সাপের ছোবল-খাওয়া যন্ত্রণায় যেন সে আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল মুচকুন্দচাঁপা গাছের ছায়ায়।

কাছে পিঠে কোথাও আর একটিও গাছ নেই। জ্যৈষ্ঠের রুদ্র রৌদ্র তার সাদা আগুনের সহস্র মশাল নিয়ে, নিঃশব্দ তাণ্ডবে মেতেছে। 'ধরিত্রী কাঁপছে থর থর করে। শস্যহীন ধূসর বিস্তৃত দেহ দিগন্ত তার ফেটে চৌচির হচ্ছে। উত্তপ্ত বাতাস নির্গত হচ্ছে ফাটলের ফাঁকে। কোথাও চোখ রাখা যায় না। পাখী পশু মানুষ চোখে পড়ে না কোনোখানে। তবু এই শব্দহীন নৈঃশব্দ একটা ক্রুদ্ধ গর্জনে কাঁপছে। রৌদ্রদগ্ধ লতাগুল্মের কেমন একটা নেশা ধরানো গন্ধ ছড়ানো। ছায়া শুধু এইটুকু। এই বিচিত্র আকার মুচকুন্দের তলায়।... এই জীবনেরই মতো কি না, কে জানে। এই দুঃসহ বহু বিস্তৃত রোদ, অপ্রতিরোধ্য। এবং এই ছায়া, নিশ্চিত কিন্তু খুব ছোট। তবু এই দিগন্তবিস্তৃত রৌদ্র-পরিক্রমা জীবনের এক অবধারিত নিয়তির মতো। আর তবু এটা ছায়া, এই ছোট ছায়া রৌদ্রকে মাথায় করে যে নিশ্চিত ভাবে বিছিয়েছে। নিশ্চুপ করুণ বিষণ্ণ অথচ প্রসন্ন। তারপর সন্ধ্যা আসে। সবই মিলিয়ে যায়। গতি ও স্থিতি নিশ্চিহ্ন। মৃত্যুর মতো অন্ধকারের গ্রাসে সব বিলীন।

কিন্তু কেন রহস্যের দুয়ারে বসে এই রৌদ্র ছায়া দ্বন্দ্বে লিপ্ত হয়েছে। বিভাসের এই মনের মতো। বিশ্বাস অবিশ্বাসের এ যে বড় কষ্টদায়ক দোলা। প্রকৃতির অপ্রতিরোধ্য এ আচরণে হয়তো বা নিয়মের জোয়াল চাপানো আছে। কিন্তু মানুষের মনের! পুরুষের, এই বিভাসের মনের পরস্পর বিরোধী দ্বন্দ্বের নাম কি? এই অচেনা বিস্ময়কর জোয়াল কে চাপাল তার ঘাড়ে!

আশ্চর্য এক মুখ থুবড়ে পড়া স্তব্ধতা তার নিজের ভিতরে। নিজের সঙ্গে তার অ-বনিবনা আড়ি। মূঢ় অসহায় কষ্টে সে দূরে তাকিয়ে রইল। রৌদ্রে সে চোখ রাখতে পারছে না।

॥ দশ ॥

তারকেশ্বরের ধৈর্যচ্যুতি ঘটেছিল প্রায়। বিভাস ডিস্পেন্সারিতে এসে দাঁড়াল। সেই মাত্র রাসু ডাকতে যাচ্ছিল তাকে। আসতে দেখে বারান্দার এক পাশে থমকে রইল।

তারকেশ্বর এক মুহূর্ত তীক্ষ্ন চোখে বিভাসকে লক্ষ্য করলেন। বললেন,

কী, শরীর খারাপ নাকি ?

বিভাস সহসা মাথা তুলতে পারল না। ঘাড় নেড়ে বলল, না···ঠিক, বোধহয় তাড়াতাড়ি খেয়ে আসতে গিয়ে একটু···।

কথা শেষ করল না বিভাস। তারকেশ্বর আবার দেখলেন তাকিয়ে। বললেন, আমি আবার নিবারণের সাইকেলটা রেখে দিয়েছি। আমারটা তো আছেই। যেতে পারবে তো চালিয়ে ?

বিভাস বলল, পারব।

বাইরে রোদের চেহারা তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। বেলা বুঝি দশটা। মনে হচ্ছে যেন ঘোর দুপুর। হয়তো বিষুবরেখা অতিক্রম করেছে এই অঞ্চলের ওপর দিয়েই। কিন্তু আশ্চর্য ! এই রোদ মাথায় করে, সাইকেল চালিয়ে যেতে চাইছেন তারকেশ্বর। যদিও পয়ারপুরের রেজেস্ট্রি অফিসের দূরত্ব ক্রোশখানেক মাত্র। তবু, বিভাস ভেবেছিল, অন্ততঃ ঢাকা গরুর গাড়িতে তিনি যাবেন। মরণাপন্ন রুগী দেখতে যাবার জন্যেও কোনদিন ওঁর এত উৎসাহ বিভাস দেখেনি।

সে পাশের ঘরে যেতে যেতে বলল, একটু জল খেয়ে আসি।

তারকেশ্বর পকেট ঘড়িটা খুলে দেখে বললেন, তাড়াতাড়ি কর।

পান করার চেয়ে, কলসী থেকে জল গড়িয়ে আগে চোখে-মুখে দিল বিভাস। হয়তো শুধু রোদ নয়, অন্য কোনো দাহে তার চোখ মুখ কান পুড়ে যাচ্ছে। জ্বলছে। জলের ঝাপ্‌টার সঙ্গে অল্প অল্প বাতাস একটু আরাম এনে দিল। জল খেতে গিয়ে সে দেখল, সামনে রাসু দাঁড়িয়ে। চুপিচুপি সরু গলায় সে জিজ্ঞেস করল, আঁচনাতেই শিকড় গাড়ছেন তাহলে ?

—শিকড় ?

—তা মাটি যখন কিনছেন, তখন শিকড় ছড়াবেই !

বিভাস ঢকঢক করে জল খেয়ে বলল, তাহলে তাই।

রাসু চুপচাপ তাকিয়ে রইল বিভাসের দিকে। সেই দৃষ্টির সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে অস্বস্তি হল বিভাসের। সে পাশের ঘরে গেল। তারকেশ্বর ততক্ষণ বাইরে গিয়ে সাইকেলে চেপেছেন। বিভাস অনুসরণ করল আর একটি সাইকেলে।

কিন্তু তারকেশ্বর অন্য পথে চলেছেন। আঁচনা আর নেদোর সীমান্ত বরাবর রাস্তা ধরেছেন। পয়ারপুর ওদিকে নয়। জিজ্ঞেস করবার কিছু নেই। কারণ কোথায় যেতে হবে, তারকেশ্বরই ভাল জানেন।

আঁচনার প্রায় শেষ সীমান্তে গিয়ে তারকেশ্বর নামলেন। সামনেই কয়েক ঘর চাষী আর আদিবাসীদের বাস। একটু ছড়ানো ছিটনো। ঠিক একটা পাড়া হয়ে ওঠেনি। সাইকেল থেকে না নেমে উপায় ছিল না। আলু-জমির

জল ধরা নালীর উঁচু জমি ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এবড়োখেবড়ো হয়ে রয়েছে।

কাছাকাছির মধ্যে একটিমাত্র আমগাছের তলায় এসে দাঁড়ালেন তারকেশ্বর। সামনের ঘরটা দরজা খোলা। মানুষের সাড়া শব্দ নেই। উঠোনটা ফাঁকা। পিছনে আর একটি ছোট ঘরের খড়ের চাল দেখা যায়।

তারকেশ্বর ডাকলেন, জনক চলে গেছিস নাকি ?

বিভাস চমকে উঠল নাম শুনে। জনক ? ও নাম তো মুখে আনার কথা নয় তারকেশ্বরের। ওঁর ভাষায়, জনক ডাকাত। যদিও লোকে জানে, জনক দাস কৃষক। বরাবরই স্পষ্ট বক্তা, তাই দুর্বিনীত। তাকে অনেকবার চোখেও দেখেছে বিভাস। প্রকাণ্ড মোষের মতো চেহারা। পাহাড়ের মতো উঁচু বুক। ভাল লাঠি চালাতে জানে। কব্জি আর থাবার জোরও কম নয়। আঁচনার লোকেরা তাকে নিয়ে গল্প বলে। আর জানে, গোটা আঁচনায় তারকেশ্বরের মুখের ওপর কথা বলবার সাহস তারই আছে। আছে বলেই তার সুহৃদ কেউ নেই। থাকলেও, তেমন মেলামেশা নেই। সক্না চৌকিদারের প্রধান কাজ, জনককে চোখে চোখে রাখা। কিন্তু সক্নার মুখেই শুনেছে বিভাস, 'শালাকে এত বলি, তবু দুটো মিছে কথা বলতে পারবে না। মরবে কোনদিন বানচৎ! ডাক্তারবাবুর হাতেই ওর মরণ আছে একদিন।'

মনে আছে বিভাসের, তারকেশ্বরের ডিস্পেন্সারির সামনেই কয়েকজনের সঙ্গে কথা বলতে বলতে, জনক চিৎকার করে উঠেছিল, 'কেন, চেঁচিয়ে বললেই বা মারে কে ? সরকারি খয়রাতির টাকা যে মারে, তার মুখে আমি মুতি।'

বিভাস ওষুধ তৈরি করছিল। তারকেশ্বর রুগী দেখছিলেন। কথাগুলি ভারী তীক্ষ্ম বর্শার মতো এসে যেন বিভাসেরই বুকে বিঁধেছিল। তারকেশ্বর আর রুগী দেখছিলেন না। তাঁর মুখ আর পিঙ্গল চোখ আগুনের মতো দপদপিয়ে উঠেছিল। বাইরের দিকে তিনি ফিরে তাকাননি। কিন্তু বাজার বেলার গুঞ্জন একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল।

খোলাখুলি সোজাসুজি যুদ্ধ ঘোষণা। তারকেশ্বরের দিকে আর চোখ রাখতে সাহস করেনি বিভাস। যদিও তার হাত আড়ষ্ট এবং রুদ্ধশ্বাস হয়ে উঠেছিল সে। প্রতিটি মুহূর্ত কেটেছিল অসহ্য প্রতীক্ষায়। একটা প্রচণ্ড গর্জন এবং আক্রমণের প্রতীক্ষায়। ঘরটা থম্ থম্ করছিল।

কিন্তু তারকেশ্বরের শান্ত স্বাভাবিক গলাই শোনা গিয়েছিল, দেখি জিভ দেখি। জ্বর কদিন ধরে চলেছে ?...

বিভাস তাকিয়ে দেখেছিল। তারকেশ্বরের ভয়ংকর মুখের সঙ্গে কথা ও কাজের কোনো মিল নেই। তারকেশ্বরের নিজস্ব তত্ত্ব খাটেনি। সে আর এক তত্ত্ব। সেই বোধহয় প্রথম দেখেছিল বিভাস, তারকেশ্বরের মুখের ওপরে কথা বলবার লোক আছে। ঘৃণা প্রকাশ করবার মতো সাহসীও আছে আঁচনাতে।

আর এও বুঝেছিল, মানুষের ভীরু বিক্ষোভ সাহসীকে উস্কে দিয়ে আনন্দ পায়। যারা জনককে কথা বলিয়েছিল, তারা হয়তো পালিয়ে গিয়েছিল ভিড়ের মধ্যে। তাদের মনের কথাটা তারা শুনতে চেয়েছিল জনকের সাহসী মুখ দিয়ে। সেটাও একরকমের বিক্ষোভ প্রকাশের রূপ।

সেই থেকে জনক নামটা বিশেষ ভাবে মনে ছিল বিভাসের। দেখা এবং জানাও ছিল কিছু কিছু। আর অবাক হয়ে দেখল, তারকেশ্বরের ডাক শুনে সেই জনকই বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কোনো সাড়া না দিয়ে জনক প্রথম তাকাল বিভাসের দিকে। ঈষৎ রক্তাভ চোখে স্থির ঠাণ্ডা অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি। একটু যেন বিদ্রূপেরও আভাস। বিভাসের গায়ের মধ্যে কী রকম করে উঠল।

তারকেশ্বর বললেন, তুই বেরুসনি এখনো ?

জনক বলল, এই যাচ্ছি যাব করছি।

কোনো তাড়া নেই জনকের। তারকেশ্বর বললেন বিভাসকে, এই ভিটে, দেখে নাও। জমি আছে খাল ধারে।

জনকের সঙ্গে আবার চোখাচোখি হল বিভাসের। বলল, অ, সাকরেদের নামে দলিল করবেন বুঝি ?

কথার ভিতরের খোঁচাটা সরাসরি বিভাসের মনে বিঁধল। সাকরেদ। তারকেশ্বরের সাকরেদ বিভাস। অপমান বোধ করবার অধিকার বিভাসের আছে। প্রতিবাদের ক্ষমতা নেই।

কেন না, এ অঞ্চলে এটাই তো তার স্বাভাবিক পরিচয়।

কিন্তু বিভাস রাগ করতে পারল না। তারকেশ্বরকে তার জিজ্ঞেস করতে ইচ্ছে করল, জনক কোথায় থাকবে জিজ্ঞেস করতে পারল না। রৌদ্রতাপে রক্তমুখ তারকেশ্বরের চাউনি খুব সুবিধের মনে হল না।

তারকেশ্বর বলে উঠলেন, কার নামে দলিল দস্তাবেজ হবে সে সব পরে দেখিস। এখন তাড়াতাড়ি চল দেখি।

জনক বলল, চলেন আপনারা, আমি যাচ্ছি।

বলে ফিরতে গিয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে আবার বলল, আমি তো মশায় বেচারাম। যাব, টিপ-ছাপ দেব। হাত বাড়িয়ে টাকাও নেব না। মহাজন সেখানেই থাকবে, সে-ই নেবে। ভাগ বাঁটোয়ারা সব আপনারাই করবেন। আপনারা কেনারাম, আগে গিয়ে কাগজপত্র লেখান।

তারকেশ্বর সাইকেল ঘোরাতে ঘোরাতে বললেন, সে সব কি আর তোর জন্যে বসে আছে। তবে ঘটে যদি বুদ্ধি থাকে পালাবার মতলব করিস নে।

জনক বলল, মড়া কি পালায় ডাক্তারবাবু ! শকুনের পেটেই যাবে সে। আপনি নিশ্চিন্তে যান।

কথাগুলি নিরীহ, কিন্তু ভিতরে আগুন আছে। আর বাইরে রৌদ্রের সাদা আগুনের শিখা কাঁপছে। চুইয়ে চুইয়ে ঢুকছে রক্তের মধ্যে, মস্তিষ্ককে

আক্রমণ করছে সেই আগুন। যে কোনো একটা কথায়, চাপা অদৃশ্য এই সব আগুন দপ্ করে জ্বলে উঠতে পারে।

বিভাস বলল, চলুন আমরা যাই, ও আসুক।

সাইকেল ঘুরিয়ে সে পিছন ফিরে তাকাল। জনক ঘরে ঢুকে গিয়েছে। দুটি উলঙ্গ শিশু দাঁড়িয়ে রয়েছে উঠোনে। দেখছে বিভাসদের। আর দরজায় একটি বউ। বোধহয় জনকের বউ, বিভাস পিছন ফিরতে সরে গেল।

কিন্তু বিভাসের পিঠে যেন অসহায় অভিসাপের নিশ্বাস এসে লাগল। তার পকেটে অঙ্গারের মতো জ্বলতে লাগল আশীর্বাদী ফুল। আর মনে হল, কী একটা কুটিল রহস্য যেন এর মধ্যে চাপা রয়েছে। কারণ, যদিও এ অঞ্চলের জমির দাম কখনোই খুব বেশি নয়, তবু এত অল্প টাকায় কী করে এই ভিটে জমি বিক্রী হয়।

চওড়া রাস্তায় এসে পড়ল দুজনে। লিক্ ধরে, দুজনে পাশাপাশি চলেছে। তারকেশ্বর বললেন, জমিটাও দেখে যাবে নাকি?

বিভাস বলল, থাক্ না এখন। এ সময়ে আবার—।

—থাক।

তারকেশ্বর বললেন লোক রেখে দিয়েছি সেখানে নজর রাখবার জন্যে।

—কেন?

—আউশ ফসলটা রয়েছে যে! যদি কেটে নেয় বা আগুন জ্বালিয়ে দেয়।

আর একটা বিষাক্ত তীর আচমকা বিঁধল বিভাসের মনে। আউস ফসল রয়েছে জনকের জমিতে। আর সামনেই আষাঢ় মাস। হয়তো এর পরেও স্বপ্ন ছিল লোকটার, আষাঢ় বা শ্রাবণে আউশ উঠে যাবার পর, ওই জমিতে আবার আমন ফলাবে। জনকের মূর্তি ভেসে উঠল তার চোখের সামনে। আর পাশেই তারকেশ্বরের রৌদ্র জ্বলন্ত মুখ। শত্রু দমনে বদ্ধপরিকর, নিষ্ঠুর।

বিভাস হঠাৎ বলল, কিন্তু, এত অল্প টাকায় বিক্রী হচ্ছে কী করে?

তারকেশ্বরের রক্তাভ মুখে একটু হাসি দেখা গেল। শক্ত চোয়ালের পাশে, বর্শা ফলকের তীক্ষ্ম খোঁচায় হাসিটা যেন ফুটল। বললেন, তুমি অল্প টাকাতেই কিনছ, অর্থাৎ আসলে। কিন্তু জনকের ঋণ অনেক। সুদে আর তস্য সুদের হিসেবে দাম অনেক উঠেছে। যার কাছে ঋণ, সে মহাজনের মতলব অন্যরকম ছিল। আমি দেখলাম, ওই সুযোগ, এ বিষের ঝাড় আমি এবার আঁচনা থেকে উপড়ে ফেলব। মহাজন কেলোদত্ত ভেবেছিল জনককে রেহাই দেবে। অবিশ্যি আসলটা, আর কিছু সুদ নিয়ে। খবরটা আমি হঠাৎ পেয়েছিলাম। খোঁজ করেছিলাম রাসুকে দিয়ে। তারপর মুখুজ্জে মশাই, আমাদের অনাদি মুখুজ্জেকে ধরলাম। উনি কথা বললেন কেলো-দত্তর সঙ্গে। মুখুজ্জে মশায়ের মান রাখতেই, শুধু আসল টাকায় তোমাকে

সব বিক্রী করে দিচ্ছে। দলিলে অবিশ্যি অনেক বেশি টাকা লেখা থাকবে।

বিভাস হঠাৎ ব্রেক কষে মাটিতে পা রেখে দাঁড়াল। এখন তার নিজের মুখও তারকেশ্বরের মতোই দপ্‌দপ্‌ করে জ্বলছে। ঘাম নয়, মনে হল, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে সর্বাঙ্গে।

তারকেশ্বর এগিয়ে গেলেন। বিভাসের জন্যই শ্লথ গতিতে চলেছেন। কিন্তু কেন দাঁড়িয়েছে বিভাস। পয়ারপুরে যাবে না বলে? রেজেস্ট্রি করবে না, জমি কিনবে না? ফিরে যেতে চায় সে? প্রতিবাদ করতে ইচ্ছে তার? এই পাপ অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে? বিদ্যুতের সেই বিদ্রূপাত্মক কথা তার মনে পড়ল, 'যেন সংসারে কত ন্যায় হচ্ছে!' কিন্তু বিদ্যুৎ-ই আবার আজ বলেছে, 'দেখবেন, কারুর যেন সর্বনাশ না হয়। জানেন তো।'

কথাগুলি সাজালে দাঁড়ায়, 'সংসারে ন্যায় হচ্ছে না। কিন্তু অন্যায়ে নিষ্ক্রিয় থাকা যায় না।'

তারকেশ্বর পিছন না ফিরেই জিজ্ঞেস করলেন, কী হল?

না, ওঁর মনে কোনো সংশয় নেই বিভাসের সম্পর্কে। তাই স্বাভাবিক গলায় আবার জিজ্ঞেস করলেন, চেন খুলে গেল নাকি?

—না।

—কষ্ট হচ্ছে?

—না।

বলে বিভাস আবার প্যাডেলে চাপ দিল। কারণ, সে জানে, সে না গেলেও তারকেশ্বর জনককে ছাড়বে না। হয়তো তাপসের কিংবা নিজের নামেই, জনকের হৃৎপিণ্ডের মতো ওই জমি-ভিটে উপড়ে নেবেন। তার চেয়ে বিভাসই নেবে। এ ছাড়া আর কোনো উপায় নেই।

আবার পাশাপাশি এল সে তারকেশ্বরের। তারকেশ্বর তাকালেন তার দিকে। বললেন, বুঝতে পারছি। এ রোদে তোমার কষ্ট হচ্ছে। আমি তোমার থেকে এখনো শক্ত।

হয়তো তাই। উনি হয়তো এখনো বিভাসের থেকে শক্ত। কিন্তু এ রোদকে, আজকাল আর ভয় খায় না সে। কষ্ট হয় না।

তারকেশ্বর আবার বললেন, আজ একটু কষ্ট কর। আজ শুভদিন।

মনে মনে উচ্চারণ করল বিভাস, আজ শুভদিন। শত্রু উৎখাতের শুভদিন একজনের। কিন্তু আঁচনার বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠের রোদ মাথায় করে এই প্রথম মাঠ পাড়ি দিচ্ছে না বিভাস। আরও অনেকদিন দিয়েছে। তারকেশ্বরের মনে নেই। বিভাস উত্তেজনায় থম্‌কে গিয়েছিল। আগুন ঢালা সূর্যের তলায় দাঁড়িয়ে সে তার সিদ্ধান্ত নিচ্ছিল। সেই বোধহয় তার শুভদিনের সিদ্ধান্ত।

পয়ারপুর ঢোকবার মুখে, আদিবাসী পাড়াটার সীমানায় এসে পড়ল তারা। সেই মস্তবড় কালো সবুজ গাব্‌গাছ, আর তার নিচে তাড়ির দোকান।

গাব্‌গাছের ছায়ায় কয়েকজন মেয়ে-পুরুষ বসেছে কোলের কাছে হাঁড়ি নিয়ে। কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। এর পরে আর একটা ছোট মাঠ। মাঠের ওপারে ওই দেখা যায় গ্রাম।

পয়ারপুর থেকে সদরে মোটর বাস চলাচল করে।

রেজেস্ট্রি অফিসে তারকেশ্বরের পরিচিত লোকের অভাব নেই। আগ বাড়িয়ে অভ্যর্থনা করবার লোকও অনেক। এমন কি অফিস ঘরেও চাঞ্চল্য লক্ষ্য করা যায়।

ছোট ছোট চালা ঘর দলিল লেখকদের দপ্তর। ক্রেতা বিক্রেতাদের ভিড় সেখানেই। গাছতলায়ও অনেকে বসেছে দলিল-দস্তাবেজ নিয়ে। গরুর গাড়িগুলি জোয়াল নামিয়ে, মাটিতে মুখ দিয়ে পড়ে রয়েছে। বলদগুলি ইতস্তত বাঁধা। হিন্দু মুসলমান, মেয়ে-পুরুষ, সব রকম জনতার ভিড় চারদিকে। পয়ারপুরের রেজেস্ট্রি অফিস রীতিমতো ব্যস্ত এবং ভিড় ভারাক্রান্ত।

সক্‌না এসে তাড়াতাড়ি তারকেশ্বরের সাইকেল ধরল। একজন এসে নমস্কার করে বলল, ঘরে আসেন ডাক্তারবাবু।

লোকটিকে চেনে বিভাস। নাম শুনেছিল দীননাথ।

তারকেশ্বর বললেন, লেখা হয়ে গেছে?

দীননাথ বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ, আপনি একবার পড়ে দেখবেন চলেন। কই, আসেন বিভাসবাবু।

বিভাসের প্রতিও আজ লোকটা সম্মানে ও সম্ভ্রমে যেন গলে পড়ছে। তারকেশ্বর বললেন বিভাসকে, সাইকেলটা সক্‌নাকে দাও।

সক্‌নার এক হাতে ধরা তারকেশ্বরের সাইকেল। আর এক হাত বাড়িয়ে সে বিভাসের সাইকেলটাও ধরল।

তারকেশ্বর কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন। আর তাকে ঘিরে কয়েকজন নানান কথা বলতে লাগল। রোদ, গরম, ফসল, অসুখ আর রেজেস্ট্রি অফিসের কাজে ঢিলেমি।

তারকেশ্বর আবার দীননাথকে জিজ্ঞেস করলেন, জনকের মহাজন কেলোদত্ত এসেছে?

—আঁজ্ঞে হ্যাঁ। এসে বসে আছেন অনেকক্ষণ।

—তবে চল যাই।

বলে তিনি বিভাসকে ডাকতে উদ্যত হলেন। তার আগেই বিভাস বলল, আমি আর কী করব গিয়ে। এসব তো আমি কিছুই বুঝব না। আমি বাইরেই থাকি।

—তা বটে। বেশ থাকো। তবে কাছে পিঠেই থেকো। সই সাবুদের

জন্যে ডাকলে এস।

দীননাথ বলল, তা বেশ, থাকেন। ঘরের মধ্যে গরমও তো বটে।

বিভাস আস্তে আস্তে বটতলার ছায়ায়, টিউবওয়েলের দিকে এগিয়ে গেল। দু'তিনজন চাষী মানুষ জল খাচ্ছিল। তাদের হয়ে যেতে, নিজেরাই একজন কল টিপে দিতে লাগল বিভাসকে। আঁজলা ভরে জল নিয়ে সে চোখে-মুখে মাথায় ছিটিয়ে দিল। তারপর এই কেনাবেচার বিচিত্র জগতে ঘুরে বেড়াতে লাগল। সক্না প্রায় সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে রইল। বিভাসকে পাহারা দেবার জন্যে নয়। কথা বলবার জন্যে। কম্পাউণ্ডারবাবুকে তার আর বুচীর, দুজনেরই যে বড় পছন্দ। ঘুরে ঘুরে সক্না এর তার সঙ্গে হাসি ঠাট্টা ইয়ারকি করল খানিকক্ষণ। তারপরে এক সময়ে বলল, এবার একখান বিয়ে করেন কম্পনডরবাবু।

বিভাস বলল, বলছ?

—বলব না? আর কবে বলব?

—কেন? চোরাই মাল পাচ্ছি বলে?

—চোরাই মাল?

সক্না বিমূঢ় বিস্ময়ে তাকাল। বিভাস হেসে বলল, নয়? সুদের দায়ে যে আবাদ করা জমি বিকিয়ে যায়, শুধু আসল দাম দিয়ে কিনতে পেলে তাকে তো চোরাই মাল-ই বলে।

সক্না বুঁচীর স্নেহের স্বামী। প্রেমিক, রসিক, সর্বকিছু। কিন্তু সে একজন কৃষক। একজন গ্রাম্য চৌকিদার। সে বোকা নয়। বিভাস যতদূর জানে, বিবেকহীনও নয়। শুধু নিরাপদ আশ্রয়ে নির্বিরোধে থাকতে চায়।

বিভাসের কথায় সে এক মুহূর্ত নির্বাক বিস্ময়ে তাকিয়ে রইল। তারপরে বলল, তা আপনার তো কোনো দোষ নাই।

—কার দোষ সক্না?

সক্না আবার একটু চুপ করে থেকে বলল, জনকের কপালের দোষ কম্পনডরবাবু।

বিভাস তাকিয়েছিল সক্নার দিকে। কিন্তু সক্না চোখ তুলল না। বিভাস আবার কী বলতে যাচ্ছিল। তার আগেই দেখল, স্বয়ং জনক এগিয়ে আসছে। ঘামছে দরদর করে। কালোমুখ চকচক করছে। চোখে সেই ঠাণ্ডা শক্ত দৃষ্টি। আর বিভাসের সঙ্গেই তার প্রথম চোখাচোখি হল।

জনক জিজ্ঞেস করল, কি রে সক্না, লেখালেখি কদ্দুর?

সক্না চকিতে একবার বিভাসকে দেখে নিয়ে বলল, এই এজলাসে ওঠার সময় হল। কখন এলে?

—এই আসছি। একটা বিড়ি দিবি?

সক্না বিভাসকে আবার দেখল। জনক বলল, দে, একটা বিড়ি দিলে

কম্পাউন্ডারবাবু রাগ করবেন না। আর তো চাইতে আসব না।

সকুনা তাড়াতাড়ি একটা বিড়ি দিয়ে, যেতে যেতে বলল, যাই, তোমার আসার সংবাদটা দিয়ে আসি।

বিড়িটা নিয়ে আর একবার বিভাসের দিকে চোখ তুলল জনক। তারপর ভিড়ের দিকে উৎসুক চোখ তুলে সরে গেল।

বিভাসের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। জনকের সামনে একটা অদ্ভুত উত্তেজনা বোধ করছিল সে। যেন অর্থহীন দুর্বোধ্য সব কথা ঠেলে আসছিল তার ভিতর থেকে।

•

প্রায় পড়ন্ত বেলায় দলিল রেজিস্ট্রি হল। অত্যন্ত নম্র আর বিনীতভাবে রেজিস্ট্রার শুধু একবার জনককে জিজ্ঞেস করলেন, টাকা পয়সা সব বুঝে পেয়েছেন?

জনকের দিকে তাকিয়েছিল বিভাস। অফিস ঘরের সকলেই। জনক শান্ত গলায় বলল, আজ্ঞে হ্যাঁ পেয়েছি।

সই করে দিলেন রেজিস্ট্রার। তবু কাজ শেষ হতে হতে প্রায় বেলা শেষ হয়ে গেল।

মোটর বাসের ক্লিনার চিৎকার করছে, কেষ্টপুর…কেষ্টপুর ছেড়ে যাচ্ছে। কেষ্টপুর সদর শহরের নাম।

ইতিমধ্যে অনেক ফাঁকা হয়ে এসেছে ভিড়। লোকজন ফিরে চলে যাচ্ছে এবার। গিয়েছে অনেক।

তারকেশ্বর বিভাসকে বললেন, আমি এই বাসেই একবার সদরে যাব মুখুজ্জেমশায়ের কাছে। সকুনা আমার সঙ্গে যাবে। সাইকেল আমি অন্য লোককে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছি। তুমি গিয়ে ডিস্পেন্সারি খুলে বস। রুগী থাকলে তাদের তাড়াতাড়ি বিদেয় করে বাড়ি চলে যেও।

অন্যদিন হলে বিভাস বলত, এই অসময়ে আবার যাবেন সদরে? আজ বলতে পারল না। সে জানে তারকেশ্বর অনেক রাত্রে গরুর গাড়িতে করে আজ ফিরবেন। আর দেখল, তারকেশ্বর দলিল তার ভিতরের পকেটে রেখে সদলে চলে গেলেন।

বিভাসের মনে হল, সে যেন একটা কলঙ্কজনক বোঝার মতো পড়ে রইল। পাখীরা ফিরে এসেছে গাছে। মানুষেরা চলে যাচ্ছে। আকাশ-জুড়ে ক্রমেই রক্তাভা ছড়াচ্ছে।

সকুনা এসে তাড়াতাড়ি সাইকেলটা দিয়ে আবার ছুটে গেল। বিভাস চোখ তুলে তাকাল আশেপাশে। প্রায় উৎসুক বিভ্রান্ত দৃষ্টি তার চোখে। যেন কাউকে খুঁজছে। কিন্তু কাকে খুঁজছে, জানে না।

সে কয়েক পা অগ্রসর হতেই, পিছনে ডাক শুনতে পেল, বিভাস!

গলার স্বরটা শুনে বিভাস উদ্‌ভ্রান্তের মতো ফিরে তাকাল। দেখল যোগেশ ঘোষাল। তাঁর পাশে জনক। বিভাস তাড়াতাড়ি সাইকেলটা মাটিতে শুইয়ে রেখে বলল, আপনি? আপনি কখন এসেছেন?

বিভাসের দুচোখে যেন খুশির ঝিলিক। কিন্তু যোগেশ ঘোষাল গম্ভীর। শ্লেষ এবং ঘৃণার ছায়া তাঁর চোখে। বললেন, হ্যাঁ, আমি। পকেটে টাকা নিয়েই এসেছিলাম, যদি কেলোদত্তকে একটু বুঝিয়ে কিছু করতে পারি। কিন্তু সুদ শুদ্ধ সব টাকা দেবার ক্ষমতা নেই আমার। আর টাকার ব্যাপার তো নয় এখানে। উৎখাত করাই আসল। যাই হোক, তোমাকে একটা অনুরোধ করার ছিল।

বিভাস যেন মরমে মরে গেল যোগেশ ঘোষালের ভাবভঙ্গি দেখে। বলল, বলুন।

ঘোষাল বললেন, তোমার সম্পর্কে অবশ্য নানান জনের নানান মত। আমিও তোমাকে বরাবর নিরীহ বলেই জানি। অবিশ্যি তোমাকে কী বা আর দোষ দেব। তবু একটা কথা রাখ। জনককে তুমি এক মাস কি দেড় মাস থাকতে দিও ওর ভিটেয়। রাতারাতি ঘরের বার করো না।

—ও!

—হ্যাঁ। তারকেশ্বরকে তুমি একটু বুঝিয়ে বলো। বুঝতেই পারছ, বউ ছেলেমেয়ে নিয়ে এভাবে হঠাৎ···অবিশ্যি যেতেই হবে। তারকেশ্বর হয়তো কালকেই ঘর ভেঙে ফেলার হুকুম দেবে।

বিভাস নত মুখেই বলল, ও কোথায় যাবে দেড় মাস পরে?

—কোথাও যাবে। কোনো শহরে, কলকারখানায় যদি সুবিধে করতে পারা যায়।

বিভাস একটু চুপ করে রইল। তারপরে বলল, দেখুন, এখন তো আমিই জনকের ভিটে-জমির মালিক?

জনক রুক্ষস্বরে এই প্রথম বলে উঠল, সে কথা অস্বীকার করছে কে মশায়।

বিভাস চোখ তুলে দেখল, জনকের চোখ হিংস্র হয়ে উঠেছে। সে বলল, আর আমি জানতাম, আমার কেনা না হলেও এ জমি ভিটা আর কারু নামে কেনা হত। তাই আমি বাধা দিইনি। কারণ, আমি চাই জনক তার ভিটাতেই থাকুক।

জনক থতিয়ে গেল। ঘোষাল বলে উঠলেন, মানে?

বিভাস বলল, ঘোষালমশাই, আপনাকে কোনো কথা বলতে আমার ভয় নেই। আমি এই সাহসে আমার নামে রেজেস্ট্রি করেছি, জনক বরাবর তার ভিটেতেই থাকবে। নইলে···

বিভাসের চোখের সামনে বিদ্যুতের মুখ ভেসে উঠল। বলল, নইলে আমি

নিজের কাছে হেরে যাব।

বিমূঢ় ঘোষাল বললেন, তুমি…বিভাস তুমি কি বলছ, আমি ঠিক…।

কথা শেষ করতে পারলেন না তিনি। বিভাস বলল, আমি জানি ভয়ংকর বিপদের ঝুঁকি আমি নিতে যাচ্ছি। তারকেশ্বর রায় কখনো আমার কোনো ক্ষতি করেননি। সেজন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু আমার কোনো উপায় নেই। হয়তো তাঁর আশ্রয় আমি হারাব। জানিনে তারপরে কী আছে। কোথায় যাব।

জনক দু'হাত জোড় করে স্তম্ভিত বিস্ময়ে খালি উচ্চারণ করল, বাবু!

আবেগেই বোধহয় ঘোষালের গলার স্বর কেঁপে উঠল। বললেন, বিভাস, আমি বুঝতে পারিনি। মানুষকে বোঝাও বড় আশ্চর্য।

আশ্চর্য কিছু নয় ঘোষালমশাই। আমি নিশ্চিন্ত জীবন চেয়েছিলাম। কিন্তু দেখলাম, চাওয়ার সঙ্গে এ সংসারে কাজের কোনো মিল হয় না।

ঘোষালের বিস্মিত চোখে শঙ্কা দেখা দিল। বললেন, কিন্তু তোমার জন্যে আমি ভয় পাচ্ছি বিভাস।

বিভাস বলল, ভয়? তা হয়তো আছে। এক সময়ে মরার ভয়েই তো ছুটে এসেছিলাম এখানে। আজ দেখছি ভয় করেও যাকে পার হতে পারব না, তাকে ভয় করে আর কতদিন মরব। এ ভাবে আমি আর পারিনে।

জনক প্রায় ভয়ে ভয়ে বলল, কম্পনডরবাবু আর একবারটি ভাবেন বাবু আপনি।

বিভাস বলল, তোমার সাহস আছে জনক নইলে এ কথা বলতে পারতে না। আমার কিন্তু সে সাহসও নেই। তবু আমি যা ভেবেছি সেই আমার শেষ ভাবা। এছাড়া আমি আর কিছুই করতে পারিনে। তুমি যেদিন টাকা দেবে, সেই দিনই তোমার জমি ফিরে পাবে।

জনকের মতো পুরুষও উৎকণ্ঠিত হল। অসহায় চোখে তাকাল যোগেশ ঘোষালের দিকে।

ঘোষাল একবার তাকালেন বিভাসের দিকে। আবার অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে চুপ করে রইলেন খানিকক্ষণ। অস্বস্তি শঙ্কা বিস্ময়ে আর কী বলবেন, সহসা যেন ভেবে পেলেন না। তারপরে বললেন, তুমি দেখছি সবই স্থির করে ফেলেছ। বলার কিছু নেই। তবু বলি, একটু সাবধানে থেকো। হয়তো আঁচনা থেকে তোমাকে শীগ্‌গিরই চলে যেতে হবে। আর যদি দরকার মনে কর, যে কোনো কারণেই হোক, আমাকে একটু খবর-টবর দিও। কিন্তু একটা কথা। ফসলের কী হবে?

বিভাস বলল, ওটা জনক গতর দিয়ে খরচ করে করেছে, ওটা ওরই প্রাপ্য।

—কিন্তু তারকেশ্বর—

—সে ব্যবস্থা আমি করব। তার তো দেরি আছে। আউশধান আষাঢ়ের

শেষে বা শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহের আগে তো কাটা যাবে না।

ঘোষাল তবু উৎকণ্ঠিত চোখে তাকিয়ে রইলেন।

বিভাস বলল, ব্যাপারটা জানাজানি হবেই। ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার দু'চারদিনের মধ্যেই কথা বলতে হবে। দেখি যদি ভালোয় ভালোয়—

ঘোষাল একটা শব্দ করে শ্লেষে এবং দুঃখে হাসলেন। বললেন, ভালোয় ভালোয়…!

বিভাসও ওঁকে সমর্থন করে বলল, তা বটে। তবু দেখি! আমি এবার যাই। রুগীরা বসে আছে সব।

সে সাইকেল তুলে নিল। ঘোষাল প্রায় অন্যমনস্কভাবে বললেন, আচ্ছা এস।

জনক যেন চেষ্টা করেও কোনো কথা বলতে পারল না। বিভাস সাইকেলে উঠল।

আকাশের রক্তচ্ছটায় আসন্ন সন্ধ্যার কালিমা লেপে যাচ্ছে। ধূলিআস্তরণ পড়ে বাসি রক্তের মতো কালো হয়ে উঠেছে পশ্চিম দিগন্ত।

'আজ শুভদিন'—বলেছিলেন তারকেশ্বর। এই আসন্ন রাত্রির মতোই তা অস্পষ্ট, অজানা। সহসা যেন সবই কেমন গম্ভীর হয়ে উঠেছে। একটা শব্দহীন স্তব্ধতার তলায় যেন কী আবর্তিত হচ্ছে। শুভ কিংবা অশুভ, নানান কিছু সব ছায়ার মতো লুকিয়ে রয়েছে অদৃশ্য কোণে কোণে। বিভাসের ভিতরেও যেন এক অপরিচিত গাম্ভীর্যের ভার নেমে আসছে।

তবু একটা ঝঙ্কার বাজছে এই শব্দহীন মৌনতায়। ভয় আছে, হয়তো বেদনা আছে এবং সংকটও কঠিন হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু মনের মধ্যে একটা আশ্চর্য শান্তি স্বাধীন ভাবে বিচরণ করছে।

॥ এগারো ॥

বিভাস ডিস্পেন্সারিতে ফিরে এল।

রাসুর মহাজনী ঘরে এবং ডিস্পেন্সারিতে আলো জ্বলছে। দু' ঘরেই ভিড়। চোখ পড়তেই দেখে নিল বিভাস, ডাক্তারখানায় রুগীর চেয়ে তারকেশ্বরের অনুগৃহীত আর সংবাদপত্র পাঠকদের ভিড়ই বেশি। প্রতিদিনই এই রকম। এই গ্রীষ্মকালে সন্ধ্যার পরে তবু দু' চারজন রুগী থাকে। ভিড়টা আসলে দিনের বেলাই হয়। বরাবর তাই দেখে আসছে বিভাস। যদিও রুগীর ভিড় এ সময় থেকেই বাড়তে থাকে। রুগীর পূর্ণ জোয়ার

বর্ষায়। ভাঁটার টান গিয়ে পড়ে শরতে হেমন্তে।

রাসুর ঘরে ভিড় চৈত্র মাস থেকেই। সকালে বিকালে সন্ধ্যায় সমান। চৈত্র কিস্তি শোধের হাতে পায়ে ধরাধরি, কান্নাকাটি। সে সময়ে অনেক থালা ঘটি বাটি গাড়ি বলদ গাই এসে জড়ো হয়। বন্ধক-বিক্রী ছাড়া ঋণ শোধের উপায় থাকে না। রাসুর হম্বি-তম্বি খিস্তি-খেউড় সব সময়ে চলেছে। এ বিষয়ে তাকে সব রকমের স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছেন তারকেশ্বর। এবং এ বিষয়ে রাসু নিক্তি ওজন করা উপযুক্ত লোক। আর এই জ্যৈষ্ঠে চলেছে এখন নতুন ঋণের পালা।

অন্যান্য দোকান ঘরেও বাতি জ্বলছে। হ্যাজাক, নয় তো হ্যারিকেন। বর্ষা নামার আগে পর্যন্ত, সন্ধ্যারাত্র রোজই এমনি জম জমাট থাকবে।

এখন আর ডাক্তারখানায় ঢুকতে ইচ্ছে করছে না বিভাসের। ভুলতে ইচ্ছে করে, সে প্রবাসী, অচিনা শুধুই কর্মস্থল। আজ তার নিজেকে নতুন লাগছে। সে যে গৃহহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন, নিতান্ত একা এই সংসারে, একথা ভুলতে ইচ্ছে করছে। তার নিজের ইচ্ছে বলে কিছু নেই, এতদিন তা বিশ্বাস করত। সে শুধু বেঁচে থাকবে, অপরের ইচ্ছে পূরণ করবে। কিন্তু তা হয় না। আবিষ্কৃত হল, তার অনেক ইচ্ছে আছে এবং সে সব নিষ্ক্রিয় থাকতে চায় না।

তবু ডাক্তারখানায় ঢুকতে হল বিভাসকে। শুধু কাজ নয়। এটা কর্তব্যও বটে। রুগীদের ফিরিয়ে দেওয়া যায় না। এক মাথা রুক্ষ চুল, হাতে পায়ে ধুলো নিয়ে বিভাস ঘরে ঢুকতেই, সবাই একবার নড়ে চড়ে উঠল। বাইরের অন্ধকারে চোখ তুলে দেখল, তারকেশ্বর আসছেন কি না।

নেদোর ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার শরাফৎ সাহেব বললেন, একা যে কম্পাউণ্ডার? ডাক্তারবাবু কোথায়?

বিভাস দ্রুত একবার চোখ বুলিয়ে নিল সকলের ওপর। বলল, সদরে গেছেন।

—এই অসময়ে?

—কী যেন দরকার আছে বলছিলেন।

শরাফৎ আপন মনেই বললেন, তা হলে আজ রাত্রের মতো আর আশা নেই। ফিরবেন বলেছেন তো?

ততক্ষণে একজনের শিশি নিয়ে মিক্‌চার তৈরিতে মনযোগ দিয়েছে বিভাস। বলল, তাই তো বলেছেন।

—তা হলে হয় গোরুর গাড়ি, আর নয় তো বি-ডি-ও-র জিপে যদি আসতে পারেন। কাল সকালেই আসব তা হলে।

তবু শরাফৎ উঠলেন না। বললেন, তা হলে জনককে হালাল করে এলে তো কম্পাউণ্ডার।

বিভাস জানত, একথা না জিজ্ঞেস করে শরাফৎ খাঁ উঠবেন না। হয়তো শুধু এ কথা রসিয়ে আলোচনা করার জন্যেই এসেছিলেন খাঁ-সাহেব। বিশাল ভূখণ্ডের মালিক এই লোকটি আসলে মূর্খ। গুটি তিনেক বিবি, বারো চোদ্দটি সন্তান নিয়ে সংসার। সব সময়ে লম্বা পাঞ্জাবী আর পায়জামা ছাড়া চলেন না। তিনি যে শরীফ আদমী, সেটা সর্বক্ষণই প্রমাণ করে চলেন। চোখে সুরমা, দাড়িতে রং আর আতর, কথায় কথায় কয়েকটি উর্দু শব্দ তার মুখে লেগে আছে। বিশেষ করে যখন স্বজাতির লোকের সঙ্গে কথা বলেন।

কিন্তু বিভাস জানে, শরাফৎ খাঁ তারকেশ্বরের অঙ্গুলি সংকেতের মেকি, চোখের ইশারায় চলেন। ব্যক্তিত্ব বলতে কিছু নেই। সে-প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল নেদোর খালের বাঁধের বিষয়ে, ইউনিয়ন বোর্ডের সভায়। সেই থেকে লোকটার ওপর বিভাসের বিতৃষ্ণা।

বিভাস ওষুধ তৈরি করতে করতেই অনুভব করল, ঘরের সবাই তার দিকে তাকিয়ে আছে। জবাব শোনবার জন্যে সকলেই কৌতূহলিত। সে মুখ না ফিরিয়েই বলল, হ্যাঁ, দেনার দায়ে জনকের সবই বিকিয়ে গেল।

শরাফৎ বললেন, তোমার নামেই কেনা হল তো?

—হ্যাঁ।

—যাক্। কেলোদত্ত আর প্যাঁচ কষেনি তো? আসল দামেই ছেড়েছে?

বিভাস ওষুধের শিশি নিয়ে টেবিলের সামনে আলোর দিকে এগিয়ে এল। মুখ না ফিরিয়েই বলল, জানেন তো সবই। ও আর জিজ্ঞেস করার কী আছে।

গলার স্বরে বোঝবার উপায় নেই, বিভাস বিরক্ত হচ্ছে। শরাফৎ বললেন, জানি বৈকি। সব জানি। অনাদি মুখুজ্জে নিজে বলেছে কেলোদত্তকে। তবু তোমার মুখ থেকে শুনে একটু মজা পাচ্ছি। বে-তমিজটা বড্ড বাড় বেড়েছিল।

কে একজন বলে উঠল, আর কালীদহে যে পড়েছে, সে আর জ্যান্ত উঠেছে কবে।

কালীদহ অর্থাৎ মহাজন কেলোদত্তর কবল। আর একজন বলল, কিন্তু জনকটা একেবারে মোষের বলদ। ব্যাটা ওই জমিতে আবার কালো ধান আবাদ করে মরেছে। ফলনও বেশ ভাল হয়েছে।

আউশ চলিত কথায় কালো ধান। শরাফৎ বলে উঠলেন, ওটা আমাদের কম্পাউণ্ডারের কিসমৎ। কম করে পঞ্চাশ মণ হবে। কীরকম জমিন দেখতে হবে তো। বিষ্টির তোয়াক্কা করে না, খালের পানী পায় বারমাস। এই শাওনেই আবার আমনের চারা বুনবে। ও পাঁচ বিঘা পঞ্চাশ বিঘার সমান। সকলই ডাক্তারবাবুর দয়া।

যেন ঈশ্বরের দয়ায় আজ পরম সৌভাগ্যবান বিভাস। নইলে ও ছাড়া

এমন অন্যায় বিনা বাধায় ঘটল কেমন করে। কেমন করে এমন নির্বিচার সহজ পাপের ষোল আনা প্রাপ্তি নেচে উঠল বিভাসের কপালে। তাই শরাফৎ এবং সকলের চোখে বিস্মিত ঈর্ষা। এতবড় সৌভাগ্যবান যেন কেউ কখনো দেখেনি। অসহ্য মনে হতে লাগল বিভাসের। এইসব আলোচনা, ঈর্ষাকাতর চোখের বিস্ময়। কিন্তু বন্ধ করার উপায় নেই। আজ এখন যা এই ঘরের মধ্যে সীমাবদ্ধ, আগামীকাল তা সমস্ত গ্রামে গ্রামে রটবে। তার জন্যে একটুও দুশ্চিন্তা নেই। মালিন্য তাকে একটুও স্পর্শ করবে না। কোথাও সে মাথা নত করে চলবে না। কিন্তু এই লোকগুলি! অন্যায় এবং পাপ যাদের কোনো সমস্যা নয়। লোভ এবং লাভ ছাড়া যাদের মুখে আর কোনো ছায়া পড়ে না।

বিভাস তাড়াতাড়ি অন্য রুগীতে মনোযোগ দিল। শরাফৎ বললেন, তা ডাক্তারবাবুর খাস লোক তুমি কম্পাউণ্ডার। তোমার ফেঁপে উঠতে বেশি দিন লাগবে না। তোমাকে তো উনি রাতারাতি বড়লোক করতে পারেন। এই তো সবে সুরু।

হ্যাঁ, এই সবে সুরু। বিভাসের বিশ্বস্ততার প্রতিদানের এই তো আরম্ভ। তারকেশ্বরও হয়তো তাই ভেবেছেন আজ। তাঁর মন্ত্রশিষ্যকে প্রতিদান দিয়েছেন তিনি। কিন্তু কিসের সুরু হল, কে জানে। শরাফৎকে জবাব দিতে গিয়ে কঠিন কথা থমকে রইল বিভাসের ঠোঁটে।

মাত্র তিনজন রুগী ছিল। তাদের দেখা এবং ওষুধ দেওয়া শেষ করে বিভাস ড্রয়ার থেকে বড় টর্চলাইটটা বের করে নিল। এক মুহূর্ত দেরী না করে ঘরের বাইরে পা বাড়াল।

শরাফৎ জিজ্ঞেস করলেন, কোথায় চললে কম্পাউণ্ডার?

বিভাস বলল, রুগী দেখতে।

—আরে সারাদিন তেতেপুড়ে এসেছ, আজকের দিনে একটু বস।

—উপায় নেই খাঁ সাহেব। ডাক্তারবাবু রাগ করবেন।

মিথ্যে কথা বলতে হল বিভাসকে। ডাক্তারবাবুর নাম শোনা মাত্র শরাফৎ নিশ্চুপ। জোঁকের মুখে নুনের মতো। রুগী নেই, রুগী দেখতে যাবার তাড়াও নেই। ডাক্তারখানা থেকে বেরুবার দেরী সইছে না তার। কিন্তু তাড়া একটা আছে। ভিতরে ভিতরে একটা তাড়া সে অনুভব করছে পরারপুর থেকে। ব্যাকুল করছে তাকে।

সারাদিনের অগ্নিস্রাবী ভয়াবহ বাতাস এখন ঠাণ্ডা। পশ্চিম আকাশের মাথায় ছোট এক ফালি চাঁদ। আরো দূরে চক্রবালে ধূলিজাল এখনো ক্ষয়হীন। যেন লেপটে রয়েছে আকাশে। চতুর্থী বা পঞ্চমী-চাঁদের আলোয় ধূলিজাল পাংশু, পৃথিবীর আর এক পারের মাঝে আবছা প্রাচীরের মতো। গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে সামান্য আলো মাখামাখি। স্পষ্ট কিছুই নয়।

অস্পষ্টতার মধ্যে যেন একটু রহস্যের রেখা আঁকা পড়েছে।

বাতাসে গায়ের ঘাম শুকিয়ে গেল বিভাসের। জুড়িয়ে গেল শরীর। চোখ জ্বালা করছিল। ঠাণ্ডা হয়ে এল। সাইকেলে উঠে, প্রায় উদ্দেশ্যহীন ভাবে চলতে লাগল সে। প্রথমে মনে পড়ল ঈশানের কথা। তার সঙ্গেই দৈববাণীর মতো তার চেতনায় বেজে উঠল, 'মন আছে তোর মনের ভিতরে, তারে একবার দ্যাখ না নেড়ে চেড়ে।' এই দৈববাণীর সঙ্গেই তার চেতনার বাঁধা পথ ধরে বাড়ির দিকে এগিয়ে চলল সে। কারণ বিদ্যুৎ সেখানে আছে। বিদ্যুতের মুখোমুখী হবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে সে। মনে হয়, আজ যেন সে এক সঙ্গেই দুটি চুক্তির সীমানা লঙ্ঘন করেছে। দুটিই অলিখিত চুক্তি—একটি তারকেশ্বরের সঙ্গে অপরটি বিদ্যুতের।

মৃত্যুর শেষ সীমায় তারকেশ্বর তাকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর বিদ্যুৎ এবং পদ্মকে নিয়ে তার জীবনে সৃষ্টি হয়েছে একটি সমরেখা ত্রিভুজের আঙিনা। যে আঙিনা তার জীবনকে পুষ্ট করেছে, বেঁচে ওঠার করুণ গ্লানিকে ভুলিয়েছে, তার বিচ্ছিন্নতা ও মানসিকতাকে উজ্জীবিত করেছে।

আঁচনায় অনেক যুবক আছে। বিভাসের সমবয়সী সেই সব যুবকেরা চাষআবাদ দোকান-পাট নানান বিষয় নিয়ে আছে। সন্ধ্যা হলে তারা প্রায় সকলেই একটু বাউরিপাড়া অথবা বাউলপাড়ায় তৈরি চোলাই মদ নিয়ে বসে। মেয়েমানুষের কথা বলে, আর নয়তো যাত্রার মহড়া দেয়। মাঝে মাঝে সদরে যায় সিনেমা দেখতে।

প্রথম প্রথম এদের ওপর রাগ হত, ঘৃণা হত বিভাসের। তারপর আস্তে আস্তে বুঝেছে, এছাড়া এখানে কিছু করার নেই। ওরা আসলে অত্যন্ত অসহায়। এখানে আকাশ উদার, পৃথিবী বিস্তৃত। কিন্তু একটা নিষ্ঠুর প্রাচীর বেষ্টন করে আছে। আবহাওয়া এবং পরিবেশের মধ্যে কর্মহীন, উদ্যোগহীন অসহায়তা জড়িয়ে রয়েছে। সব ইচ্ছা ও আকাঙ্খা একটা আবর্তের মধ্যে মাথা কুটে মরে। কী করবে, কেন করবে, এই অর্থহীন যন্ত্রণার মধ্যে দিন যাপনের গ্লানি পথ খুঁজে ফেরে। এবং প্রায় শহর-ঘেঁষা বিভাস রুদ্ধশ্বাস বিস্ময়ে থমকে থেকেছে, যখন দেখেছে গ্রামে নাবালিকা ধর্ষণ, ভদ্র-ঘরের কুমারী মেয়েদের গর্ভবতী হওয়ার সংখ্যা মোটেই নগণ্য নয়।

আগে সে অবাক হয়ে ভাবত, এটা তো গ্রাম! গ্রামেও কি এসব সম্ভব! আঁচনায় আসার আগে এসব বিষয় বিভাস কোনদিন ভাবেনি।

এসব কাহিনীতেও উৎসাহ বোধ করেনি। সংবাদপত্রের ওই সব খবরকে অশ্লীল মনে করত এবং চোখ পড়লে দৃষ্টি সরিয়ে নিত।

এখন আর দৃষ্টি ফিরিয়ে নেবার কোনো প্রশ্ন নেই। এখন এসব চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, তার আশেপাশের ঘটনা। কানে আসেই এবং প্রতিক্রিয়াও হয়। এখন মনে হয়, এইসব দূর গ্রামের উদার প্রকৃতির মধ্যেই মানুষ বেশি রুদ্ধশ্বাস,

পৌনঃপুনিকতায় আবদ্ধ। বোধহয় শহরে বাসনার যে আগুন বুদ্ধি দিয়ে জ্বলে, এখানে সেই প্রবৃত্তি নিরুপায় পাপের পথে ধায়।

যে ভাবেই হোক, বিভাস এখানে যুবকদের সঙ্গে কখনো মিশতে পারে নি। কিন্তু নিঃসঙ্গ বোধ করেনি কখনো। মন নিয়ে বেঁচে থাকার যে সাহচর্য, আত্মীয়তা বন্ধুত্বের প্রয়োজন, বিদ্যুৎ আর পদ্ম তা অযাচিতভাবে সম্পূর্ণ-রূপে দিয়েছে। স্থূল বিচারে এটা হয় তো তুচ্ছ। কিন্তু বিভাস জানে তার সেই মৃত্যু-স্পর্শিত প্রেতজীবনে এই সম্পর্কই মানুষের মনটা জীইয়ে রেখে-ছিল। এ ক্ষেত্রে তিনজনের সমান অংশ ছিল। সমান অংশীদার।

কিন্তু সেই সমান অংশকে একটা মুহূর্তের ঘোরে যেন ছিন্ন করে ফেলেছে বিভাস। কারণ এ ক্ষেত্রে বিদ্যুৎ কারুর স্ত্রী নয়, পদ্ম কারুর মেয়ে নয়, সে নিজে কারুর বেতনভুক কম্পাউন্ডার নয়। তারা নিরালা বনের তিনটি ঘনিষ্ঠ গাছ। তারা তিনজন।

কিন্তু তাদের প্রকৃতির মধ্যে যে স্বাভাবিক বৈচিত্র ছিল, তার ভিতরেই কোথায় যেন এই অচেনা আত্মবিরোধের বীজও থেকে গিয়েছিল। এটা চুক্তি লঙ্ঘনেরই সামিল।

তাই বিদ্যুতের সঙ্গে মুখোমুখি হবার আগে, আজ দুপুরের কথাই বার বার মনে পড়ছে। দুপুর আর পদ্ম। পদ্মর দেহের স্পর্শ, আবেগে শিথিল সেই দেহ আর তার আভ্যন্তরীণ স্বাস্থ্যের মহিমা, সেই নিশ্বাসের সুগন্ধ স্পষ্টই মনে পড়ল। এবং মনের ভিতরে মন যেন সহসা উপছে পড়ল এই অন্ধকার আলো-কুহেলী নির্জনতায়। কিন্তু এই অচিনপুরে জীবন শুরু থেকে ভিতর মনের যোগসাজস কোথায়, ধরা পড়ে না কেন? এই সমস্ত জীবনটা যদি দৈব বলে ধরে নেওয়া যায়, তার সঙ্গে বিভাসের এ ব্যক্তি-প্রকৃতির মিল কোথায়? সেই অচেনা বিরোধের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তার রক্তের মধ্যে একটা স্থূলবোধ প্রায়ই জেগে ওঠে। হয়তো সকনা চৌকিদারের মতো তা দুর্বিনীত নয়। রাসুর মতো মদমত্ত অন্ধ হয়ে, হাটে-বাটে বাউলপাড়ায় নারীদেহ হাতড়ে ফেরে না। কিন্তু সে স্থূলবোধ আর কিছু নয়, প্রকৃতি এবং কাল তার পাওনা আদায় করে নিতে চায়। মানুষের পক্ষে এটা পাপ কি না বিভাস জানে না। এটা ঘৃণিত কি না কে জানে যে, তার রক্তের মধ্যে এক উপবাসী ক্ষুধার তাড়নায় দুর্জয় হয়ে ওঠে। আজ দুপুরে সে তার সেই মূর্তিকে প্রত্যক্ষ করছে। তার মধ্যে স্নেহ মমতা এবং পুরুষাকারের একটা গর্ব যেন আচ্ছন্ন করে। তবু, তারপরেও একটা শূন্যতা থাকে। একটি প্রতিকারহীন অসহায়তার মতো, একটি চির অগম্য আলোর সীমা অচিন ব্যথা হয়ে জেগে থাকে যেন। কারণ সেখানে ধরার কিছু নেই। ছোঁয়ার কিছু নেই। অথচ রক্তের আবর্ত সেখানেও স্তব্ধ হতে চায় না। কিন্তু স্নেহ-মমতা পুরুষাকারের কথা আর মনে থাকে না। তখন সব কিছু নিয়ে আত্মসমর্পণ

করতে ইচ্ছে করে। হয়তো সকুনার সন্ধ্যায় সেই ঘরে ফেরার মতো। ধরিত্রীর বুকে এই বিশ্বপ্রাণের মতো।······কিংবা আর কিছু, বিভাস জানে না। বিদ্যুৎ কি সেই চির অগম্য আলোর সীমায় অচিন ব্যথায় বেঁধেছে।

নিজের কাছে তো কিছু ঢাকাঢুকি নেই। মনের ভিতরে মনের মধ্যে এই জবাবহীন প্রশ্নের কাঁটা। শুধু নৈতিক প্রশ্ন নয়। বুদ্ধি দিয়ে নৈতিক বোধকে স্তোক দেওয়া যায়। আত্মাকে যায় না।

আজ বাগানের ঘরে পদ্ম, আজ পয়ারপুরের ঘটনা এবং অতীত ও বর্তমান, সব মিলে অপ্রতিরোধ্য এই জীবনে এক আশ্চর্য অসহায়তা মনের গভীরে আবর্ত তুলছে। তারকেশ্বরের সঙ্গে তাকে হয়তো শীঘ্রই মুখোমুখী দাঁড়াতে হবে। তার ভিত্তি আলাদা। কিন্তু বিদ্যুতের সঙ্গে মুখোমুখী হওয়ার প্রেরণা সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে প্রেরণা মানুষকে একটা জায়গায় গিয়ে তার আলো-কালো-অন্ধ-বন্ধ সকল দুয়ার খুলিয়ে দেয়।

কিন্তু বিদ্যুৎকে যেন আজ রহস্যময়ী দুর্বোধ্য মনে-হল বিভাসের।

বাড়ির কাছাকাছি আসতেই গাছের ভিড়ে অন্ধকার ঘন হয়ে এল। সাইকেল থেকে নেমে হেঁটে অগ্রসর হল। আগে টর্চলাইট ছাড়া অন্ধকারে চলতে পারত না। এখন চেনা হয়ে গিয়েছে রাস্তা। কোথায় উঁচুনীচু সব টের পায়। তবু এই গ্রীষ্মের সময় সাপ-খোপের ভয় থাকে। আলোটা সঙ্গে রাখা দরকার।

কিন্তু সাইকেল থেকে বিভাস নেমেছে অন্য কারণে। রান্নাঘরের জানালার কাছে সে এক মুহূর্ত উৎকর্ণ হয়ে দাঁড়াল। জানালা বন্ধ। আলো আছে কি না বোঝা যায় না। ভিতরে কোনো সাড়া শব্দও নেই। সমস্ত বাড়ি প্রদক্ষিণ করে, বাগানে ঢুকল সে। ঘরের দিকে না গিয়ে বাড়ির ভিতরে যাবার দরজার দিকে লক্ষ্য করল। উঠোনের কোথাও হয়তো আলো আছে। খোলা দরজা দিয়ে অস্পষ্টভাবে ভিতরটা দেখা যায়। সামনেই একটা গাছের গায়ে সাইকেলটা হেলান দিয়ে রেখে পায়ে পায়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। এত সকালে বিভাস কোনদিন আসে না। কোনো দরকারে যদি বা কখনো এসেছে, দেখেছে হয়তো বিদ্যুৎ রান্নায় ব্যস্ত। কিংবা সে আর পদ্ম বসে গল্প করছে।

কিন্তু দরজার সামনে এসেও কোনো সাড়া শব্দ পেল না। দোতলার সিঁড়ির কাছে একটু কমানো একটি হ্যারিকেন জ্বলছে। রান্নাঘরের দরজা বন্ধ। ওপরের দিকেও আলোর আভাস চোখে পড়ে না। গোটা বাড়িটা নিঝুম। এর মধ্যেই এতটা নিঝুম হওয়ার কথা নয়।

বিভাস আস্তে ডাকল, বুনো।

ডেকেই উৎকণ্ঠিত হয়ে ভাবল, বুনোই হয়তো এসে উপস্থিত হবে। কিন্তু

বুনো কিংবা যে জন্যে বুনোকে ডাকা, তাদের কারুরই কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। বিভাস আরও দুবার ডাকল। বাড়িটা যেন মৃত। বিদ্যুৎ না থাক, অন্তত পদ্মর সাড়া পাওয়া উচিত ছিল।

হঠাৎ মনে হল, বাগানের দিকে দরজা যখন খোলা রয়েছে, দুজনেই পুকুর ঘাটে যায়নি তো। প্রায়ই তো যায়। বিভাস ফিরে এল। পুকুর ঘাটের দিকে লক্ষ্য করে কয়েক পা যেতে যেতেই হতাশ হয়ে উঠল সে। সেখানে আলোর কোনো আভাস নেই। কথাবার্তা কিংবা জলের শব্দ শোনা যায় না একটুও।

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল সে। অল্প অল্প বাতাস বইতে সুরু করেছে। জোনাকী জ্বলছে, ঝিঁ ঝিঁ ডাকছে। আর সমস্ত পৃথিবীটা যেন স্তব্ধ নিথর।

বিভাস নিজের ঘরের দিকে পা বাড়াল। কাছে এসে টর্চলাইট জ্বালতেই চমকে উঠল সে। তার ঘরের বারান্দায় কে যেন বসে। মুখের ওপর আলো ফেলতেই একটা হাত চোখের ওপর ঢাকা পড়ল। কথা শোনা গেল, সরান্ ওটা, চোখে লাগছে।

বিদ্যুৎ। বিভাস সঙ্গে সঙ্গে আলো নিবিয়ে দিল। তার হতাশ মনে একটি চকিত খুশি ঝিলিক দিয়ে উঠল্। বিদ্যুৎ যে তারই ঘরের বারান্দায় বসে আছে, এটুকু একেবারেই আশা করতে পারেনি। সে শিকল খুলে ঘরে ঢুকে আলো জ্বালাল আগে।

বিদ্যুৎ বাইরে থেকে বলল, সাত তাড়াতাড়ি আলো জ্বালালেন কেন?

বিভাস ভিতর থেকে বলল, অন্ধকার তাই—

অন্ধকার তো ভালো। আলোটা ভিতরেই রাখুন।

বিভাস ঘরের বাইরে বারান্দায় এসে দাঁড়াল এবং সেই মুহূর্তে তার মনে হল, বিদ্যুৎ চুপ করে থাকতে চাইছে যেন।

বিভাস বলল, কিছু জিজ্ঞেস করলেন না।

—কিসের?

—এই কেনা-কাটা দলিলপত্র কার জমি—?

—সে খবর তো অনেক আগেই পেয়েছি। আপনি পয়ারপুরে থাকতেই বোধহয় আঁচনায় খবর এসে গেছে। ওঁর মুখে শুনেছি সব।

অর্থাৎ তাপসের মুখে। কিন্তু তবু বিদ্যুৎ নীরব। সবই কি শুনেছে বিদ্যুৎ। আর কিছু তার জানবার নেই?

বিভাস বিমর্ষ হয়ে উঠল। যে ব্যগ্রতা নিয়ে সে ছুটে এসেছিল, সেটা হঠাৎ থিতিয়ে ছড়িয়ে, মনটা ভার হয়ে উঠতে লাগল। একে অভিমান বলে কি না কে জানে? কিন্তু বিদ্যুৎ না শুনতে চাইলে, ইচ্ছে না থাকলে, জোর করে শোনানো যায় না। সে হঠাৎ বলল, আপনাকে ভাল দেখতে পাচ্ছি নে।

বিদ্যুতের গলা শোনা গেল, ও ? তা হলে ঘরেই চলুন। তাছাড়া একেবারে অন্ধকারে থাকলে, কেউ দেখে আবার কী ভাববে।

বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকল। বিভাস ঢুকল পিছনে পিছনে। বিদ্যুৎ তাকাল বিভাসের দিকে। না, কোথাও কোনো পরিবর্তন নেই বিদ্যুতের। অল্প ঘোমটা টানা থাকলেও বোঝা যাচ্ছে চুল বেঁধেছে বিকেলে। সিঁথিতে তাজা সিঁদুর, কপালে কোনো টিপ নেই, ঈষৎ হাসি, যেটা তার মুখের বৈশিষ্ট্য এবং ব্যক্তিত্ব স্বরূপই বলা চলে, সবই ঠিক আছে। কেবল মনে হয়, চোখ দুটি যেন বেশি ধারালো দেখাচ্ছে।

বিদ্যুৎ সহজ ভাবেই বলল, কী বলছেন ?

বিভাস বলল, না বলছি আপনি একলা এই অন্ধকারে বসে আছেন।

বিদ্যুৎ তার সেই স্বাভাবিক হাসি নিয়েই বলল, এখন দোকলা কোথায় পাব বলুন। ও তো এ সময়ে রাসুর পাল্লায় পড়েছে।

বিভাস জানে, এ সময়ে তাপস রাসুর সঙ্গে তাড়ি খেতে যায়। প্রায় কৈশোর থেকেই নাকি তাপস এ অভ্যাস আয়ত্ত করেছে। তারকেশ্বরও অবশ্য প্রায় নিয়মিত পান করেন। তবু তাপসকে নাকি আগে এই নিয়ে মারধোর করতেন। এখন আর কিছুই বলেন না। এমন কথাও কোনদিন শোনা যায়নি, তারকেশ্বরের মদ তাপস চুরি করেছে। যদিও সেটা খুব অস্বাভাবিক ছিল না। তাছাড়া, মাতাল বলতে যা বোঝায়, তাপসকে সেরকম অবস্থায় কখনো দেখেনি বিভাস।

সে তাড়াতাড়ি বলল, না, তাপসবাবুর কথা বলছি না। আমি—।

—ও, ঠাকুরঝির কথা বলছেন আপনি ?

ঈষৎ ঘাড় বাঁকানো বিদ্যুতের ভ্রূ জোড়া যেন তড়িৎলতার মতো ঝিলিক দিয়ে উঠল। চোখের ধারে মর্মস্পর্শী তীক্ষ্ণতা। ঠোঁটে হাসিটুকু ছিলই। সব মিলিয়ে বিদ্যুৎকে যেন হঠাৎ অচেনা মনে হল। বলল, সে জন্যেই বুঝি দরজার কাছে গিয়ে আস্তে আস্তে বুনোকে ডাকছিলেন ?

ঠাট্টা করছে বুঝি বিদ্যুৎ। বিভাস বলল, না না, আমি—।

তার আগেই বিদ্যুৎ বলে উঠল, কিন্তু ঠাকুরঝি তো সন্ধ্যে হতে না হতেই আজ শুয়ে পড়েছে। বিভাস অবাক হয়ে বলল, কেন ?

বিদ্যুৎ বলল, তার যেন আজ কী হয়েছে। দুপুর থেকে আমার কাছে ঠাকুরঝিকে আর পাচ্ছি নে। দুপুরে খেতে বসে খেতে পারল না। গা নাকি টিস্‌টিস্ করছিল। সারা দুপুর নতুন বাড়ির সেই চিলেকোঠায় গিয়ে একলা কাটিয়েছে। বিকেলে চুল বেঁধেছে, কিন্তু গা ধোয়নি। মুখখানি যেন কেমনই দেখাচ্ছিল বটে !

বিদ্যুৎ কথা বলছে, কিন্তু ঘাড় বাঁকানো সেই ভঙ্গি এবং বিভাসের প্রতি স্থির নিবদ্ধ চোখের দৃষ্টি যেন আরও তীব্র তীক্ষ্ম হয়ে উঠেছে।

বিভাস কিছু বুঝে উঠতে পারল না। দুপুরবেলার কথা তার মনে পড়ল এবং সহসা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত বিমর্ষ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

বিদ্যুৎ বলল, ভয় পাবার মতো কিছু নয়। মনে হল, কিছুতে বোধহয় কেটেছে, তারই তাড়সে—।

বিদ্যুতের ঠোঁটের কোণে রুদ্ধ হাসির মতো একটা কিছু যেন তার কথা শেষ করতে দিল না।

বিভাস ভীত হয়ে উঠল। সে বিশ্বাস করতে পারল না বিদ্যুৎ হাসছে। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, কেটেছে মানে, বিষাক্ত কিছু—সাপটাপ—?

বিদ্যুৎ বলল, সে রকম কিছু নয়।

—তা হলে?

—কেন, ওষুধ দেবেন নাকি?

বিদ্যুৎ কি ঠাট্টা করছে! ঠিক যেন বুঝে উঠতে পারছে না বিভাস। অথচ বিদ্যুতের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকা যাচ্ছে না। বিভাস কি কোনো অপরাধ করেছে। বিদ্যুৎ যেন তার চোখ থেকে তীক্ষ্ম তীর বিভাসের বুকের মধ্যে একটু একটু করে বিঁধছে। প্রায় ছোটবউদির মতোই মনে হচ্ছে বিদ্যুৎকে। বিদ্যুৎকে দেখলে মাঝে মাঝে ছোটবউদিকে মনে পড়ে যায়। কিন্তু দুজনের মধ্যে যে অনেক তফাৎ, বিভাস তা জানে। এখন, এই মুহূর্তের বিদ্যুৎকে তার অচেনাই লাগছে।

বিভাস বলল, তা—ওষুধ—মানে এ সময়ে দিনকাল তো ভাল নয়।

বিদ্যুৎ বলল, হ্যাঁ এসময়ে বড্ড সাপখোপ বিছে বেরোয়।

বলতে বলতে বিদ্যুতের শরীরটা একবার কেঁপে উঠল। আঁচলটা সে প্রায় মুখের কাছে টেনে নিয়ে এল। আবার বলল, ঠাকুরঝির সেরকম কিছু হয়নি। কিছুতে কাটলে যেমন যন্ত্রণায় ছটফটিয়ে মরে, তা নয়। তবে সেই কেমন নেশা নেশা হয় না? মাতালের মতো—?

কথা শেষ করবার আগেই বিদ্যুৎ মুখে আঁচল চাপল। পরিষ্কার বোঝা গেল, তার রুদ্ধ হাসি নিঃশব্দে ফেটে পড়ছে। বিভাসের দিকে আর একবার তাকিয়ে বিদ্যুৎ পিছন ফিরে জানালার দিকে সরে গেল।

বাতাস একটু জোরে এল বুঝি। বাগানের গাছে গাছে হালকা সাঁই সাঁই শব্দ শোনা গেল। ঘরের মধ্যে হ্যারিকেনের শিখাটা বারেক কেঁপে উঠল।

বিভাস আড়ষ্ট স্তব্ধ। কী একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিতে যেন অন্ধকার থেকে চকিতে একবার বিভাসের বুকে গুপ্তির মতো খোঁচা দিয়ে গেল। বোঝা না বোঝা একটা অবস্থার মধ্যেও। দুপুর আর পদ্ম তার চোখের সামনে ভেসে উঠল এবং সহসা ধিক্কারের আঘাতে, কোনো কথা বলতে পারল না সে। পিছন ফেরা বিদ্যুতের দিকেই তাকিয়ে রইল। বিদ্যুতের ঘোমটা ঘাড়ের নিচে ভেঙে পড়েছে। তার শ্যাম গ্রীবায় সোনার বিছে চিকচিক করছে।

ঘরে দুটি মানুষ। দুটি ছায়া অকম্পিত। তাদের নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত শোনা যায় না। সময় যেন শ্বাসরুদ্ধ হয়ে ছটফটিয়ে মরছে। আর বিভাসের বুকের ভিতরটা ঝড়ে মথিত হচ্ছে। কথা! সেই কথাটা যেন কী, যা সে বলতে চাইছে। যা তার ভিতরের অন্ধকার আবর্তিত হচ্ছে, উচ্চারিত হতে চাইছে। কিন্তু মুখে ফুটছে না।

বিদ্যুৎ ফিরল। আস্তে আস্তে ফিরে ঘোমটা টানতে টানতে দরজার দিকে পায়ে পায়ে যেতে লাগল। এবং দরজা অবধি যাবার আগেই হঠাৎ দাঁড়িয়ে বিভাসের দিকে চোখ তুলে হাসি ছুঁড়ে দিল!

বিভাস অবাক হল। সে ভেবেছিল বিদ্যুৎ গম্ভীর হয়ে গিয়েছে।

হাসতে হাসতেই বিদ্যুৎ বলল, দুপুরে নাকি জামার বোতাম লাগাতেও ভুলে গিয়েছিলেন।

আর বিভাস মনে মনে বলল, হ্যাঁ, তখন পদ্ম বোতাম লাগিয়ে দিয়েছিল।

বিদ্যুৎ আবার বলল, আর পানটা তো মুখে দিতেই ভুলে গিয়েছিলেন, সে তো আমি রান্নাঘরের জানালা দিয়েই দেখলাম।

বিভাস মনে মনে বলল, হ্যাঁ, তখন আমার মুখের মধ্যে আগুনের স্বাদ, আর আমার বুকেও আগুন, আর তবু সেই ত্রিভুজের আঙিনায় একটা কী যেন অপরাধের ছায়ায় প্রাণ আচ্ছন্ন।...

বিদ্যুৎ হঠাৎ বলে উঠল, মার খুব ইচ্ছে, আপনার সঙ্গে ঠাকুরঝির বিয়ে হয়।

সহসা সমস্ত ভাবনাটা ছিঁড়ে গিয়ে, বিস্ময়ে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে উঠল বিভাস। বলল, আপনার শাশুড়ি?

বিদ্যুতের হাসি এবার সরব হল একটু। বলল, হ্যাঁ। শ্বশুরমশাই কী বলবেন জানিনে অবিশ্যি। আমারও কিন্তু খুব ইচ্ছে, তাই হোক। বাধা কী? পালটি ঘর—।

বিভাসের হঠাৎ মনে হল, বিদ্যুৎ অত্যন্ত নিষ্ঠুর, ভয়ংকরী। পরমুহূর্তেই তার মন সমস্ত চিন্তা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ভাবনাগুলি সব ঘুমিয়ে পড়তে লাগল। সে শুধু বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে রইল। বিদ্যুতের চোখের দিকে কালো টানা যে চোখ প্রতিমার চোখের মতো ধারালো মনে হচ্ছিল কিছুক্ষণ আগে। আসলে একটি আশ্চর্য স্নিগ্ধতা, স্নেহে গভীর। আর আধপাকা পুঁই মেটুলির রসের মতো ঈষদোজ্জ্বল ঠোঁট, ছবির প্রতিমার মতো যেন তাতে একটা কোন্ দূর জগতের হাসি, বিষণ্ণ, না কি করুণ। কিংবা তার অনুদ্ধত অথচ পরিপূর্ণ বুক যেন সত্যি করুণ, বিষণ্ণ স্নেহে আতুর এবং সাহসের উচ্ছ্বাস আবর্তিত গভীরে। আর দূরে, বহু দূরে, ধরা ছোঁয়ার বাইরে এই মূর্তির কাছেই যেন প্রতিটি দিন ক্ষয় করে করে যাত্রা সুরু হয়েছিল...

বিভাসের মনে হল বিদ্যুতের গলা তার কানে এল, কথা বলছেন না কেন ? আমাদের কাছে থাকতে চান না বুঝি ?

আর বিদ্যুৎ হাসছে। একটা অসহ্য কষ্ট হচ্ছে, মানুষকে বোবায় পেলে যেমন হয়। দুঃস্বপ্নের কষ্ট, অথচ চোখ যেন তৃষ্ণার্ত হয়ে পান করছে, মুগ্ধ সম্মোহিত অপলক চোখ বিদ্যুৎকে দেখছে।

আবার কানে এল বিভাসের, আর কি উপায় আছে। আমাদের আর কিছু তো নেই, তাই ঠাকুরঝিকে দিয়েই আটকাবো, বাঁধবো আপনাকে।

বলতে বলতেই, হাসতে হাসতে বিদ্যুৎ দরজার বাইরে, অন্ধকারে চলে গেল। বিভাস প্রায় শ্বাসরুদ্ধ গলায় তাড়াতাড়ি ডাকল, শুনুন।

—বলুন।

আবার দরজার সামনের আলোয় জেগে উঠল বিদ্যুৎ।

বিভাস কোনোরকমে একবার উচ্চারণ করল, আপনি…

একটু থেমে আবার পরমুহূর্তেই বলল, মানুষ নিজেকে ঠিক চেনে না।

বিদ্যুতের মুখ গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, জানি।

বিভাস থেমে থেমে বলল, আর আমি…আপনাকে সত্যি বলছি, একটা অতি সামান্য…খুব সাধারণ…।

বিভাসের মুখে আর কথা যোগাল না। বিদ্যুৎ হাসবার চেষ্টা করে বলল, সকলেই।…আচ্ছা, এখন যাচ্ছি।

বিদ্যুৎ আবার হারিয়ে গেল অন্ধকারে। বিভাসের ব্যগ্র গলার স্বর যেন গভীর তলা থেকে সহসা উত্থিত হল, কিন্তু শুনুন।…

কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। বিভাস দরজার কাছে এসে দাঁড়াল। বাগানে গাঢ় অন্ধকার। জোনাকীগুলি আরো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই ছোট রক্তাভ চাঁদের টুকরোটা বোধহয় পশ্চিমের অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে।

নিশ্চল হয়ে রইল বিভাস। কোথায় গেল সেই আবেগ, ছুটে আসার উচ্ছ্বাস। অচিনা শুধুই কর্মস্থল। ভুলতে চেয়েছিল, সে গৃহহীন, আত্মীয় বান্ধবহীন নিতান্ত একা এই সংসারে। আর এই মুহূর্তেই, এখন সে ইচ্ছে একটা বাষ্পের মতো যেন উপে গেল। সেই একই একাকীত্ব চারদিক থেকে আরও গভীরভাবে ঘিরে এল। একাকীত্ব আরও নিষ্ঠুর। কারণ সব কিছুর ঊর্ধ্বে সেই ত্রিভুজের একটি আঙিনা ছিল, আজ যেন সেটাও বেঁকে চুরে এলো-মেলো হয়ে যাচ্ছে। রূপান্তর ঘটতে যাচ্ছে। আর যেন সমস্ত জীবনের পরিবর্তনের সূচনা করছে। কেমন একটা ভয় করছে, শেষ যেটুকু তাকে একেবারে নিঃস্ব হতে দেয়নি, এবার তাই দেউলিয়া করে দেবে।

আশ্চর্য, একটা দিনের সকাল দুপুর সন্ধ্যায় কত তফাৎ। তবু সরে দাঁড়াবার জায়গা নেই। পথ বদলের উপায় নেই আর। যে-অপরিচিত অন্ধকার থেকে পথ নির্দেশের সংকেত আসছে, তাকে অস্বীকার করে আর

পালানো যায় না।

লোকে অনেক কিছু ব্যাখ্যা করে। কিন্তু তারকেশ্বর বিদ্যুৎ পদ্মকে ব্যাখ্যা করে কিছু বোঝাবার নেই বিভাসের। অন্যায় অনেকে করছে এই সংসারে। তারকেশ্বরের সঙ্গেই যেন বিরোধ বাঁধছে। নিষ্পাপ প্রাণ এবং যৌবন অনেক মেয়ের আছে। পদ্মকেই বিভাস প্রত্যাখ্যান করতে পারল না। বিভাস কেন অনুভব করছে, বিদ্যুৎ তার জীবনের দুর্জ্ঞেয় কেন্দ্রে বসে আছে। কী ব্যাখ্যা তার?

অথচ এর মধ্যে কত উচিৎ অনুচিতের প্রশ্ন রয়েছে। কিন্তু উচিত অনুচিত সব কি অঙ্কের মতো গুণে গেঁথে বলে দেওয়া যায়। এ সবই তো স্বতোৎসারিত। উদ্ভবের কোনো সাবধান সংকেত ছিল না। পরিণতি অজানা।

তবু এখন কষ্ট হচ্ছে। নিজেকে অসহায় মনে হচ্ছে। দরজার কাছ থেকে ফিরে এসে বাতি নিবিয়ে দিল বিভাস। দরজা বন্ধ করে, আবার সাইকেল নিয়ে ফিরে চলল ডিসপেন্সারির দিকে।

বাজারে পৌঁছবার আগেই, পথের ওপরে দুটি ছায়া দেখা গেল। বিভাস টর্চের বোতাম টিপল। খালি গা, কাপড় হাঁটুর ওপরে তোলা লোক দুটি দাঁড়িয়ে পড়ল। একজন জিজ্ঞেস করল, কম্পাউন্ডারবাবু নাকি?

গলার স্বর উৎকণ্ঠিত ব্যগ্র।

—হ্যাঁ।

বিভাস সাইকেল থেকে নামল। দেখে চেনা চেনা মনে হল। দুজনের গলাতেই কণ্ঠী। একজন প্রৌঢ়, একজন যুবক।

প্রৌঢ় প্রায় বিভাসের হাতের কাছে হাত নিয়ে এসে বলল, আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম। ডাক্তারবাবু তো শুনলাম কেষ্টপুর গেছেন, আপনাকে একবারটি যেতে হবে বাবু।

—কোথায়?

—বাউলে পাড়ায়। আমার মেয়ের অবস্থা বড় খারাপ।

বিভাস আর দাঁড়াল না। বাজারের দিকে চলতে চলতে বলল, কী হয়েছে?

প্রৌঢ় একটু থতিয়ে গেল। একবার শব্দ শোনা গেল মাত্র, আজ্ঞে—।

যুবক বলল, বল কম্পাউন্ডারবাবুকে।

প্রৌঢ়র গলার স্বর সরু আর রুদ্ধ শোনাল, আজ্ঞে বাবু, মেয়ের বড় রক্ত ভাঙছে। পোয়াতি ছিল।

—ক মাস?

—তিন চার মাস হবে।

বিভাসের ভ্রু কুঁচকে উঠল। সন্দেহে কুটিল হয়ে উঠল তার দৃষ্টি। কিন্তু রাস্তায় সে কিছু বলল না।

ডিসপেন্সারিতে এসে দেখা গেল, ভিড় নেই। রাসুর ঘরে লোকজন রয়েছে। তাপস তীর্থের কাকের মতো বসে রয়েছে। রাসুর আদায়ীকৃত নগদ কড়ির তহবিলের জন্যে নয়। তার কাজ না মিটলে নেশা করতে যাওয়া চলবে না।

বিভাস ডিসপেন্সারিতে ঢুকে, দুজনকেই ভালো করে দেখল। দুজনেই ভয়ার্ত শূন্য দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

বিভাস যুবকটিকে দেখিয়ে বলল, এ কে ?

—আজ্ঞে এটি আমার ছেলে।

—ও। মেয়ের বিয়ে হয়েছে ?

—হ্যাঁ বাবু, মেয়ে আমার আইবুড়ো নয়।

—জামাই কোথায় ?

—এখানেই আছে, বাড়িতে।

বিভাসের মন একটু শান্ত হল। কিন্তু, এসব রোগে তার হাত দেবার কোনো অধিকার নেই। সে ডাক্তার নয়। এরকম ক্ষেত্রে স্বয়ং তারকেশ্বরও হাসপাতালের ডাক্তারের সাহায্য নেন। ধাত্রীর প্রয়োজন হয়।

বিভাস বলল, কিন্তু আমি তো যেতে পারব না। ডাক্তারবাবু সদরে গেছেন, এলেই পাঠিয়ে দেব।

প্রৌঢ় খপ্ করে বিভাসের হাত ধরে প্রায় কেঁদে উঠল, দোহাই কম্পাউণ্ডারবাবু চলেন। একবারটি চলেন।

—আহা শুনুন, আমি তো ডাক্তার নই। আমি গিয়ে কী করব ?

যুবকের চোখ দুটি ছল্ছল্ করছিল। ধরা গলায় বলল, একবারটি চলেন। যে অবস্থায় দেখে এসেছি, আর বোধহয় নাই। আমার ওই একটি মাত্তর বোন। প্রৌঢ় বলে উঠল, আমরা শুনেছি বাবু, আপনি সব জানেন।

—ভুল শুনেছেন। আমাকে ডাক্তারবাবু যে রুগী দেখতে অনুমতি দেন, তাকেই দেখতে যাই।

প্রৌঢ় হঠাৎ বিভাসের পায়ের কাছে উপুর হয়ে পড়ল।—বাবু একবারটি কাছে গিয়ে দাঁড়াবেন চলেন।

বিভাস জানে, না গেলে এরা তাকে অবিশ্বাস করবে। গিয়েও সে কিছু করতে পারবে না। একমাত্র তার উপস্থিতি আবহাওয়ার পরিবর্তন করতে পারে। রুগীকে দেখে সে মন্তব্য করতে পারে। এ রকম অনেকবার তাকে করতে হয়েছে। এবং তার অভিজ্ঞতার সীমার মধ্যে হলে, ওষুধও দিয়েছে। এক্ষেত্রে তা করা যাবে না। একমাত্র উপস্থিত হওয়া যায়।

সে কোনো জবাব না দিয়ে তারকেশ্বরের উদ্দেশে মোটামুটি রুগীর বিষয় লিখে একটা চিরকুট পাশের ঘরে রাসুর হাতে দিল। বলল, এটা দেবেন ডাক্তারবাবু এলে। আমি বাউলপাড়া যাচ্ছি।

রাসু চোখ তুলে একবার উচ্চারণ করল বাউলপাড়ায় ?

বিভাস জানে, রাসুর চোখে কিসের সন্দেহ। কারণ সে জানে। সন্ধ্যার পর বাউলপাড়ায় এক কারণেই লোকে যাতায়াত করে। বিভাস কোনো জবাব না দিয়ে, ওষুধের বাক্স ভর্ত্তি করল। তারকেশ্বরের বিধি অনুযায়ী ওষুধপত্র নিল সে।

প্রায়ান্ধকার মাটির ঘর। একটি তক্তাপোষের ওপর মেয়েটি শোয়ানো ছিল। কেরোসিনের ডিবে জ্বলছে। তার কালি এবং ধোঁয়াতেই বোধহয় অন্ধকার শ্বাসরোধী ভারী হয়ে উঠেছে।

তাড়াতাড়ি আর একটি আলো এল। কয়েকজন স্ত্রীলোক আর একজন মাত্র পুরুষ আগে থেকেই ছিল। পুরুষটির বয়স বেশি নয়। চব্বিশ পঁচিশের মধ্যেই। ফর্সা রং, চোখদুটি লাল। বিভাসের দিকে একবার তাকিয়ে চোখ নামিয়ে নিল।

বিভাস রুগীর সামনে এসে থমকে গেল। পাতলা কাঁথায় ঢাকা প্রায় একটি শিশুর মুখ জেগে রয়েছে। রক্তশূন্য ফ্যাকাশে সাদা ছোট একটি মুখ প্রায় নিথর ছবির মতো। সিঁথিতে অল্প সিঁদুরের দাগ। চোখ দুটি বোজা। মনে হয় মেয়েটি বেঁচে নেই।

বিভাস বলে উঠল, ছেলেমানুষ বলে মনে হচ্ছে।

কে একজন মেয়েমানুষ বলে উঠল, ষোল বছর।

বিভাস কপালে হাত দিল। হাত যেন পুড়ে গেল তার। চোখের পাতা তুলে দেখল, দৃষ্টিহীন নিশ্চল অচৈতন্য অবস্থা। বিভাস হাত গুটিয়ে নিল। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে লক্ষ্য করে অনুমান করল, ষোল বছর নয়। আরও কম। তবে শরীরের কাঠামো খুব ছোট নয়, স্বাস্থ্যও ভালোই।

বিভাস গম্ভীর হয়ে উঠল। ভ্রূকুটি তীক্ষ্ম চোখে প্রৌঢ়ের দিকে তাকিয়ে বলল, ওর এরকম হল কেমন করে ?

প্রৌঢ় থতিয়ে গেল। সহসা কথা বলতে পারল না।

বিভাস বলল, সুন্দর স্বাস্থ্যবতী মেয়ে। দেখে মনে হচ্ছে কোনো রোগ বিরোগ ছিল না। এ মেয়ের তিন চার মাসের গর্ভ নষ্ট হবে কেন ?

কতকটা আন্দাজ এবং কতকটা সন্দেহবশতঃ বলল বিভাস।

প্রৌঢ়ের মাথা নত। একবার সে সেই ফর্সা লোকটির দিকে তাকাল। সকলেই চুপচাপ। মেয়েদের অধিকাংশেরই ঘোমটায় মুখ ঢাকা। যেন নরকের ছায়াচারিণী প্রেত সব।

বিভাস তৎক্ষণাৎ বুঝল, তার আন্দাজ ভুল নয়, সন্দেহ মিথ্যে নয়। একটা কিছু ঘটেছে। সে দৃঢ় গলায় বলল, এ মেয়ের সারা জীবন ধরে ছেলে হলেও শরীর টসকাবার কথা নয়।

কথাটা শেষ হতে পেল না। মেয়ে গলায় কে যেন ফুঁপিয়ে উঠল। পরে ফিসফিসে রুদ্ধ গলা শোনা গেল, সত্যি বলেছেন বাবু। মেয়ের আমার নই বাছুরের জান ছিল।

বিভাস প্রৌঢ়কে জিজ্ঞেস করল, উনি কে?

—আজ্ঞে আমার পরিবার।

—আপনার জামাই আছে বলছিলেন কোথায়?

—এই যে!

সেই ফর্সা যুবকটিকে দেখিয়ে দিল এবং এতক্ষণে লক্ষ্য করল বিভাস, যুবকের লম্বা লম্বা চুল। হাতে সোনার তাগা। গলায় সোনার কণ্ঠি। বিভাসের দিকে একবার তাকাবার চেষ্টা করে আবার চোখ নামিয়ে নিল।

বিভাস জানে, সব কথা জিজ্ঞেস করেই বের করে নিতে হবে। কিন্তু তার আগেই সে শান্ত দৃঢ় গলায় বলল, তাড়াতাড়ি গাড়ি তৈরি করুন। খড় দিয়ে বিছানা পেতে, যতটা পারা যায় নরম করে গাড়ি সাজান। মেয়ে বাঁচাতে চান তো হাসপাতালে নিয়ে চলে যান।...আর একজন একটু জল দিন, আমি দুটো ইনজেকশন দিয়ে দিচ্ছি ততক্ষণে। যা ইনজেকশন দিচ্ছি, লিখে দেব, হাসপাতালের ডাক্তারবাবুকে দেখাবেন।

সহসা চাপা কান্নার শব্দ উঠল। প্রৌঢ় স্বয়ং বিভাসের পায়ের কাছে ভেঙে পড়ল। একটা ছুটোছুটি পড়ে গেল চারদিকে।

বিভাস এক্ষেত্রে তারকেশ্বরের অনুকরণে প্রথমে কোরামিন, তারপরে পেনিসিলিন দেওয়া স্থির করল। যদিও তার সন্দেহ, হাসপাতাল অবধি এ মেয়ে টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। সে বলল, এরকম করে তো কোনো লাভ নেই। মেয়ে যাতে বাঁচে, তার চেষ্টা করুন!

একটু চুপ করে, সিরিঞ্জ পরিষ্কার করতে করতে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল, কতদিন বিয়ে হয়েছে?

মেয়ের মা কেঁদে বলে উঠল, এই তো গো বাবু, গত বোশেখে।

—গত বৈশাখে?

বিভাস ফিরে তাকাল মায়ের দিকে। বলল, তবে যে শুনেছি, মেয়ের প্রায় চার মাস—

মা হঠাৎ কপাল চাপড়ে, আঁচলে মুখ ঢাকল। বিভাস চকিতে একবার জামাইকে দেখে জিজ্ঞেস করল, জামাইয়ের বাড়ি কোথায়?

—আজ্ঞে পয়ারপুরে।

—হুঁ।

বোঝা গেল, যুবকের যাতায়াত ছিল বাউলপাড়ায়। তারই পরিণতি এই সব।

বিভাস কাঁথা সরিয়ে হাত বার করে মেয়ের নাড়ি দেখল। ঘামে ভিজে

উঠেছে সে। ইনজেকশন দিতে ভয় হচ্ছে। হয়তো তার হাতের ওপরেই মেয়েটি শেষ নিশ্বাস ফেলবে। কিন্তু উপায় নেই। তাকেই সব থেকে বেশি নির্বিকার থাকতে হবে। এটা সে অভিজ্ঞতা দিয়ে আয়ত্ত করেছে।

এ্যাম্পিউল ভেঙে সিরিঞ্জের ওষুধ টেনে নিতে নিতে হঠাৎ আবার জিজ্ঞেস করল বিভাস, জামাইয়ের আরও বউ টউ আছে নাকি?

সহসা কোনো জবাব পাওয়া গেল না।

প্রৌঢ়ের দিকে ফিরে তাকাল বিভাস।

প্রৌঢ় বলল, আছে বাবু, আমার মেয়ে দ্বিতীয় পক্ষ।

বিভাসের চোখের সামনে সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে উঠল। এখন আইন এবং অপরাধের প্রশ্ন তুলে লাভ নেই। আইনকে সকলেই ভয় পায়। নিজের উপকারের প্রয়োজনেও সহসা কেউ আইনের দ্বারস্থ হতে চায় না। অন্ততঃ এসব ক্ষেত্রে।

বিভাস জিজ্ঞেস করল, কিন্তু মেয়ের এই সর্বনাশ করার ওষুধটি কে দিয়েছে? আর তার দরকারই বা হল কেন? বিয়ে যখন হয়েই ছিল?

কেউ কোনো কথা বলল না।

বিভাস সকলের দিকে একবার দেখে, জামাইয়ের দিকে ফিরে তাকাল। সে তেমনি মাথা নত, প্রস্তরবৎ। জানে বিভাস, ওই সোনার তাগা আর সোনার কণ্ঠিওয়ালার এসব ভাবভঙ্গি সবই দুঃসময়ের ভাণ। উদ্ধার পেলেই নতুন রক্তের তৃষ্ণায় উল্লসিত হয়ে উঠবে আবার।

মেয়ের মা বলে উঠল, বাবু না চাওয়া বস্তুর এই হাল হয়। যাদের কাছে মেয়ে আমার বিষবিক্ষো তার ফলও তাদের কাছে বিষ।

বিভাস তুলোয় স্পিরিট মাখিয়ে ইনজেক্সন দেবার উদ্যোগ করল। বোঝা গেল, ছেলেটি অন্টবাম বাপের ছেলে। দ্বিতীয় পক্ষে বাধ্য হয়েই বিয়ে করতে হয়েছিল। কিন্তু ঘরে তোলবার পরোয়ানা পাওয়া যায়নি। সন্তান উৎপাদনের অধিকারও সেখান থেকে স্বীকার করা হয়নি।

প্রৌঢ়কে বলল বিভাস, মেয়েকে ধরুন।

মনে মনে শক্তিসঞ্চয় করে, হাত অকম্পিত রেখে বিভাস্ ইনজেকশন দিল। বলল, তাড়াতাড়ি মাথায় একজন হাওয়া দিন।

নাড়ি ধরে বসল সে। একবারও মনে হল না, সারাটি দিন কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত তার কেমন কেটেছে। আঙুলের ডগায় শুধু স্পন্দনের সংখ্যায় সে ডুবে যাচ্ছে। ঘড়ি নেই তার। মেয়েটির মুখের দিকে স্থির চোখ রেখে সময়ের পরিমাপ করার চেষ্টা করছে।...হঠাৎ তার চোখের সামনে পদ্ম ভেসে উঠল। পদ্ম নিঃশব্দে হাসছে। আর, দূরের কোথায় একটা কোন কোন আঁধারে বিদ্যুৎ চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। অস্পষ্ট ছায়া ছায়া। কিন্তু অপলক দুটি চোখ স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দেখতে দেখতে বিদ্যুৎ ছোটবউদি

।...

—গাড়ি সাজানো হয়েছে!

বাইরের থেকে কার মোটা চাপা গলা শোনা গেল। ঘর থেকে কে যেন চুপিচুপি বলল, চুপ।

বিভাস দেখল, মেয়েটির ভ্রূ কুঁচকে উঠছে। নাসারন্ধ্র ঈষৎ স্ফীত। জ্ঞান সে কোনো সময়েই হারায়নি। মাঝে মাঝে ঘোর নেমে আসছে। কারণ, ক্রমেই শক্তি ক্ষয়ের দিকে। সেফটিকের সব লক্ষণই প্রায় পরিস্ফুট। দুর্বল মেয়ে হলে এতক্ষণ টিকত না।

বিভাস জানে কোনো অশিক্ষিত ধুরন্ধর মেয়েমানুষ ওষুধ প্রয়োগ করেছে। আরও কয়েকটি ক্ষেত্রে এ ঘটনা দেখেছে সে। স্ত্রী-অঙ্গে কোনো বিষাক্ত ওষুধ প্রয়োগ করে দীর্ঘ সময় ফেলে রেখেছে। তারপরে তলপেটে চাপ দিয়ে, হাত দিয়ে মুক্ত করার ভয়াবহ মূঢ় চেষ্টা করেছে। হত্যা করারই সামিল। কিন্তু কিছুতেই তার নাম বের করা যাবে না। কারণ, অনুরোধে পড়েই সে আসে। তার কোনো দোষ এরা দেখতে পায় না।

এখন যা করে, হাসপাতাল। যদি পথে মেয়েটি বেঁচে থাকে।

বিভাস পেনিসিলিন ইনজেকশন দিয়ে বাক্স বন্ধ করল। আরও কিছুক্ষণ বসে রইল। বলল, খুব আস্তে আস্তে তুলে দিন গাড়িতে। গাড়ি একটুখানি খানা খন্দ দেখে চালাতে বলবেন। আর মেয়েমানুষ কেউ সঙ্গে যান। জল একেবারেই দেবেন না। দুধ সঙ্গে নিন।

আবার কান্নাকাটি পড়ল। মেয়েটি ক্ষীণস্বরে ডাকল, মা।

মা প্রায় লুটিয়ে পড়ল মেয়ের মুখের ওপর।—কী মা।

মেয়ে বলল, তুই আমার হাত ধর।

মা মেয়ের হাত ধরল। বলল, এই যে ধরে রেখেছি মা।

কিন্তু তার শরীর কাঁপতে লাগল থর থর করে। প্রতিবেশী কয়েকজন এগিয়ে এল মেয়েকে তুলতে।

মা হঠাৎ ডুকরে উঠল।

বিভাস বলে উঠল, উঁহু, ওরকম করবেন না। মেয়ে তো ভালো হয়ে যাচ্ছে। ওর সঙ্গে আপনি হাসপাতালে যান।

আস্তে আস্তে তুলে মেয়েকে বাইরে নিয়ে যাওয়া হল। বিভাস দেখল মেয়েটি তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে। অবাক হল, মেয়েটির চোখে ভয় নেই। গলায় কোনো আতঙ্ক বা যন্ত্রণার চিৎকার নেই। সে অবিচলিতভাবে হাসপাতালে চলেছে।

হঠাৎ জামাইটি কোমরের কষির কাছ থেকে খুলে, তিনটি দশ টাকার নোট বাড়িয়ে ধরল বিভাসের কাছে। আর সেই মুহূর্তেই প্রৌঢ়ও পাঁচটি টাকা নিয়ে এসে দাঁড়াল।

বিভাস টাকা পাঁচটি নিল। কারণ তারকেশ্বরের ওষুধের দাম তুলতে হবে। এই প্রথম সে ঘৃণায় ফেটে পড়ল। যদিও জানে, হাসপাতালও এ অপরাধীর সাজা দিতে হিমসিম খেয়ে যাবে। তবু সে জামাইটির লাল ভাবলেশহীন চোখের দিকে চোখ রেখে বলল, তোমার কত টাকা আছে পরে আমি দেখব। আগে মেয়েটির একটা কিছু ব্যবস্থা হোক।

অপরাধীর মতো মাথা নীচু করে রইল জামাই।

বিভাসের মনে হল, বিবেক বুদ্ধিহীন একটি জড়পদার্থ। সে বাইরে এসে দাঁড়াল। মেয়েটিকে তোলা হয়েছে। দুধ বুঝি জবাল দেওয়া হচ্ছে।

মা এসে সামনে দাঁড়াল। হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফিসফিস করে বলল, বাবু, তখন কত বারণ করেছি। বলেছি, ওরে ওকে দেখে ভুলিসনে ও মায়াবী পুরুষ। সতীনের ঘরে জবলে মরবি। কিন্তু, মেয়েকে যে তখন আবার পোড়া ভালবাসার কালে পেয়েছে। শুনলে না, শুনলে না। বললে, 'মা' ওর কাছে আমাকে মরতে দে…

মেয়েটিকে যাত্রা করিয়ে দিয়ে বিভাস মাঝে মাঝে টর্চ জেবলে অন্ধকারে এগিয়ে চলেছে। সাইকেল আনেনি। নদী পারের হাঙ্গামা আছে।…কিন্তু মেয়েটা এমন মূর্খ কেন যে, ওকে ভালবাসার 'কালে' খায়। সে খাওয়া কেমন। একেবারে মরণের মতো? এত সাধ! ওই ছোট ছবির মতো মুখটিতে এমন মৃত্যু ভয়হীন দুঃসাহস কোথায় লুকিয়েছিল?

বিভাসের মনে হল তার বুকের মধ্যে নিঃশবাস আটকে কেমন ব্যথার মতো লাগছে। জোরে নিঃশবাস ফেলল সে। তারপর থমকে দাঁড়াল। গলা শুনেই বুঝেছে, ঈশানের বাড়ি পেরিয়ে যাচ্ছে সে।

কানে এল ঈশান বলছে, এসেছেন যখন আর একটু বসেন। নদীর ওপারে পেঁাছে দিয়ে আসব আপনাকে।

জবাবে মোটা নীচু গলা শোনা গেল, তা দিয়ে আসবে। সে জন্যে নয়। মনটা মাঝে মাঝে এমন কেন করে, বলতে পার ঈশেন? বয়স তো হল আমার, না কি?

ঈশান শ্লেষ্মা জড়িত গলায় হেসে উঠল। বলল, আর এক ছিলিম সাজি আগে, বসেন।

গাঁজা তৈরির কথা বলছে ঈশান। কিন্তু অন্য গলাও চেনা চেনা লাগছে যেন। অপর গলায় শোনা গেল, তোমার এ ধোঁয়া খেয়েও আমার শান্তি হয় না ঈশেন। তোমায় যা জিজ্ঞেস করছি, তাই বল আগে।

জগদীশ চক্রবর্তীর গলা! অবিশ্যি ঈশানের সঙ্গে ওঁর সখ্যতার কথা বিভাস জানত। কিন্তু উনিও নেশা করেন জানা ছিল না। আর বোঝা যাচ্ছে, ঈশানই ধরিয়েছে এই নেশা।

ঈশান বলল, আমি কি সব জানি ঠাকুর। তবে আপনার যে ঘোরে

ঘোরেই কাটে কি না। মাঝে মাঝে চেতন হলে টের পান।

—কী সেটা? আমার তো এখন বয়স হয়েছে। রক্তেরও তেজ নেই।

—এই দ্যাখেন, বয়সের কথা কে বলছে। —আমি প্রাণের কথা বলছি।

—প্রাণের কথা?

—হ্যাঁ, জ্বরের মতন ঘোরে থাকেন, মাঝে মাঝে চেতন হলে ব্যথাটা টের পান।

—হুঁ।

একটু চুপচাপ। বিভাস পা বাড়াতে গেল। কিন্তু জগদীশের গলা শুনে একটা অপ্রতিরোধী কৌতূহলে থেমে পড়ল আবার।

জগদীশ বললেন, তা হলে বুঝলে ঈশেন, বেন্দাবনেই চলে যাই।

—বেন্দাবনে?

—হ্যাঁ।

ঈশান গুন্‌গুনিয়ে গেয়ে উঠল,

গয়া যাবে কাশী যাবে যাবে বৃন্দাবনে
সে যে হায় বসে আছে প্রাণের মাঝখানে।

জগদীশ বললেন, অ!

ঈশান বলল, হ্যাঁ।

বলে আবার গাইল,

যত দিন দেহ চলে, অনাগলে
বাজিবে সে পলে পলে
থুয়ে তুই যাবি কোথা কোনখানে

বিভাস পা চালিয়ে দিল। খেয়া মাঝিকে ডেকে নদী পার হয়ে, সোজা বাড়ি চলে এল। এসে দেখল, তারকেশ্বরও ফিরে এসেছেন।

রাত্রি তা হলে অনেক হয়েছে।

॥ বারো ॥

মধ্যাহ্নের পর সূর্য যেমন ঢলে যায়, ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়ে আসে, আসতে আসতে ঢেকে ফেলে এবং অন্ধকার ঘনায়। তেমনি একটা কী যেন ক্রমেই ঘনিয়ে আসছে। ঘিরে ধরছে বিভাসকে। তাই যেন মনে হয় বিভাসের।

কয়েক দিন আগে ভুবনেশ্বরীর কথাগুলি মনে পড়ে। বলেছিলেন, তোমার মতো ছেলেও যে শহর ছেড়ে গাঁয়ে এসে থাকে, এমন আর দেখিনি বাবা।

অথচ আশ্চর্য এই একটা জায়গায় শহরে গ্রামে তফাৎ কোথায়, বিভাস আবিষ্কার করতে পারেনি। দুর্ভাগ্য যন্ত্রণা আর অবিচারের আবর্ত এখানেও প্রতিমুহূর্তেই বেগে পাক খাচ্ছে। দৃশ্যত শুধু পটের তফাৎ। সে যে মনে করেছিল, শহরের ঘূর্ণাবর্তে পড়ে ভয় ব্যথা উৎকণ্ঠায় স্নায়ু ছিঁড়ে পড়তে চাইছিল—অন্যায় লোভ হতাশা আর অবিশ্বাসে দিক্‌বিদিক ছুটে মরতে

হচ্ছিল, সব ছেড়ে এখানে এই ব্যাপ্তিতে, বিস্তারে, নির্জনতায় এই সব মানুষের মধ্যে ডুব দিয়ে শান্তিতে সে একদিন শেষ পরিণতিতে যাবে, কিন্তু তা হল না।

যদিও জীবন যাপনের জন্যে, কাজের পদ্ধতিতে দিনকে এখানে মন্থর মনে হয়, চিত্তে তার লেশ নেই। এখানে ব্যাঙ্ক, শেয়ার মার্কেট, অফিস, আদালত সব মিলিয়ে মানুষ ও যানবাহনের বেগে চলা নেই। কিন্তু সারা দেশটা যেখানে ধাক্কা লেগে অস্থির উত্তরঙ্গতায় চলকাচ্ছে, গ্রামগুলি তা থেকে বাদ পড়েনি। এখানেও সেই উত্তরঙ্গ অস্থিরতা। একই আবর্তে ঘুরছে। স্নায়ুর টানে এখানেও ব্যক্তি আর সমাজ কাঁপছে থর থর করে।

শহর আর শহরতলীর মানুষ হিসেবে একদা গ্রামকে চিনতে তার ভুল হয়েছিল। ভুবনেশ্বরীও সেই ভুল করেছিলেন। কিন্তু সে কথা ভুবনেশ্বরীকে বোঝাবার নয়। ভুবনেশ্বরীও অন্য চিন্তা থেকে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, বিভাস যেন অন্তর্যামী প্রেরিত। নইলে আই-এ পাশ ভদ্র ব্রাহ্মণ বংশের ছেলেকে এই দূরে গ্রামের এক ডাক্তারের কম্পাউন্ডার হিসেবে কেমন করে পাওয়া যায়। মাতৃহারা ভাইয়েদের দ্বারা বিতাড়িত অথচ সৎ।

বিভাস মনে মনে হেসেছিল। ইচ্ছে করেছিল বলে, আমি সেই এক তল্লাটের কুকুরের মতো। যে টিকতে না পেরে শুধু বাঁচবার জন্যেই আর এক তল্লাটে পালিয়ে এসেছে।

কিন্তু কিছুই বলেনি সে। ভুবনেশ্বরী স্পষ্ট না হলেও অস্পষ্ট করেও মনোভাব অব্যক্ত রাখেননি। বংশ সংসার সম্পর্কে নানান কথা জিজ্ঞেস করেছিলেন। তারপরে হঠাৎ বলে উঠেছিলেন, কিন্তু এত কথারই বা কী দরকার বল তো বাবা। তোমাকে দেখছি, যা দেখছি তাই আমার আসল।

বিভাস একটি কথাও বলেনি। আর ভুবনেশ্বরীকেও সে এত কথা আর কোনদিন বলতে শোনেনি। যদিও আগেই বিদ্যুৎ এ কথার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছিল।

বিভাসের চোখে ভাসছিল তারকেশ্বরের মুখ। তিনি ক্রমেই গম্ভীর হয়ে উঠছিলেন। কথা বলার অবসর অবিশ্যি কমই পাওয়া যায় এখন। কারণ, বর্ষা যাচ্ছে, চাষের সময়। সেই রোয়ানীরা এসেছে। বিভাস নানাভাবে ব্যস্ত। তাছাড়া সামনের ফাল্গুনেই তারকেশ্বরেরও পঞ্চায়েৎ নির্বাচন। গ্রাম পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের পর অঞ্চল প্রধানের নির্বাচন। আগেকার প্রেসিডেণ্টের মতোই যাকে বলা যায়। ইউনিয়ন বোর্ডের মতোই, যদিও পঞ্চায়েৎ অনেকখানি গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে নির্বাচিত হয়।

গ্রাম পঞ্চায়েতের নিজের বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিরা নির্বাচিত হতে না পারলে, গ্রাম প্রধানেরা গোলমাল করতে পারে। কারণ গ্রাম প্রধানেরাই অঞ্চল প্রধানকে নির্বাচিত করে। তাছাড়া, এবার যোগেশ ঘোষাল পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের মূল প্রতিপক্ষ। এটাও অভাবিত তারকেশ্বরের পক্ষে। লোকে চিরদিন জেনে এসেছে, ঘোষাল তাঁরই লোক। এবং ঘোষালও সদলেই নামছেন প্রায়। চুপ

করে বসে নেই।

তাছাড়া কো-অপারেটিভ ব্যাংক খোলার জন্যেও বিশেষ ভাবিত। চেষ্টা চলছে। তবে চারদিকে সংশয় ও সন্দেহের ছায়া দেখে, পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের আগে এ বিষয়ে সাহস পাচ্ছেন না তারকেশ্বর। এ বিষয়ে অনাদি মুখুজ্জেই প্রধান পরামর্শদাতা। পথদ্রষ্টাও বটে। কারণ অন্ধি সন্ধি পথের সন্ধান তারকেশ্বরের জানার কথা নয়। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের পর তাই, অনাদি মুখুজ্জের সঙ্গেই তাঁর দিল্লী যাবার কথা হয়েছে। কো-অপারেটিভের দরুণ, প্রথম কিস্তিতেই অন্তত গভর্ণমেণ্টের কাছ থেকে এক লক্ষ টাকার স্বীকৃতি না পেলে, কাজে নামবেন না। অবশ্যই সে স্বীকৃতি কোনো আইনানুগ ব্যাপার নয়। আশ্বাস মাত্র। যে-আশ্বাসই আসল।

এখনো অবিশ্বাসের পর্যায়ে আসেনি। তাই বিভাসের সামনেই নানান আলোচনায় সে এসব জানতে পেরেছে।

কিন্তু জনকের জমিতে আমনের রোয়ার সময় আসন্ন। আষাঢ় শেষ হয়ে এল। আউশ কাটা হয়ে গিয়েছে। সেই নিয়েই তারকেশ্বরের তামাটে কপালে প্রথম মেঘ সঞ্চার করেছিল। ভ্রূকুটি বিদ্যুৎ হেনেছিল।

প্রথম সক্‌না খবর দিয়েছিল বিভাসকে, জনকের ঘর দখলের ব্যবস্থা হচ্ছে। একটি আদিবাসী দম্পতীকে বসাবার মনস্থ করেছিলেন আর ঢেঁকি ঘরে এক ভূমিহীন লেঠেল প্রকৃতির লোককে আস্তানা দিতে চেয়েছিলেন তারকেশ্বর।

সক্‌নাকে বলে রেখেছিল বিভাস। সক্‌নাই তো এ বিষয়ে সকলের আগে খবর পাবে। সে যেন বিভাসকে খবর দেয়। বিভাস জানত, তারকেশ্বরের এ পোষা লোকটির প্রাণে কোথায় যেন জনকের জন্যে একটু জায়গা ছিল। কে জানে, তার বউ বুঁচীর সঙ্গ গুণে কি না?

রেজেস্ট্রি করার তিনদিন পরেই জনককে উচ্ছেদের জন্য সক্‌নাকে নির্দেশ দিয়েছিলেন তারকেশ্বর। বিভাস গিয়ে দাঁড়িয়েছিল তারকেশ্বরের সামনে। সকালবেলা তখনও তারকেশ্বর বাড়ি থেকে বার হননি, বৈঠকখানায় বসেছিলেন। সেই একই চেয়ারে। যেখানে ওঁর দিকে চোখ পড়বার আগেই, পিছনের কাঁচে ঢাকা কঙ্কালটা দেখা যায়।

অবাক হয়ে বলেছিলেন, কী হয়েছে?

বিভাস প্রথমটা কথা বলতে পারেনি। এক মুহূর্ত মাথা নীচু করেছিল। তারপরে বলেছিল, একটা কথা শুনে ছুটে এসেছি।

কী বল তো?

তারকেশ্বরের গলায় রীতিমতো বিস্ময়। কিন্তু সন্দেহের আভাস ছিল না।

বিভাসের নিঃশ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে এসেছিল। কোনোরকমে বলে ফেলেছিল, জনককে আপনি আরও কিছুদিন থাকতে দিন।

—কেন?

এই সোজা প্রশ্নের সামনে বিভাস কথা বলতে পারেনি। তারকেশ্বরও অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন। তারপরে বলেছিলেন, তুমি জান, ও আমার শত্রু।

—আর তা সত্যবাদীতার জন্যে। অন্যায়ের প্রতিবাদের জন্যে। মনে মনে উচ্চারণ করেছিল বিভাস। কিন্তু মুখ খোলেনি।

তারকেশ্বর আবার বলেছিলেন, তুমি দেখছি অসম্ভব নরম। এ সংসারকে চিনতে এখনো অনেক বাকী। ভাইয়েদের হাতে শিক্ষা পেয়েই তো তোমার বোঝা উচিত ছিল।

কিন্তু দাদাদের সঙ্গে জনকের কোনো তুলনাই হতে পারে না, সেকথা তারকেশ্বরকে বলে কোনো লাভ ছিল না।

তিনি বলেছিলেন, কিন্তু ফসল যা রয়েছে—।

বিভাস বলে উঠেছিল, ওটা ও খরচ করে যখন করেছে, ওকেই ছেড়ে দিন।

—কী বললে?

তারকেশ্বর নিজেই চমকে গিয়েছিলেন। এবং পরমুহূর্তেই তাঁর মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, এ বিষয়ে জনককে তুমি কিছু বলেছ নাকি?

—হ্যাঁ।

—কবে?

—রেজিস্ট্রির দিনই।

—হুঁ।

অনেকক্ষণ চুপচাপ। বিভাস আস্তে আস্তে মুখ তুলেছিল। তারকেশ্বরের তীক্ষ্ণ অনুসন্ধিৎসু চোখে চোখ পড়েছিল তার। বিভাস নীচু গলায় বলেছিল, আপনার কাছে আমি কখনো কিছু চাইনি।…

—তাই এটাই চাইলে! যাকে এক মুহূর্ত আমি এ গাঁয়ের সীমানায় সইতে পারি না। যাকে তাড়াবার জন্যেই আমি কেলোদত্তর কাছে নতি স্বীকার করেছি।

তা ঠিক। এক মহাজন আর এক মহাজনের শত্রুই হয়। জনক সে হিসেবেই একদা কেলোদত্তর কাছে গিয়ে জুটেছিল। কিন্তু তারই ভাগ্যগুণে, দুই মহাজনের আবার মিলনও হয়েছিল।

তারপরেও তারকেশ্বর অনেকক্ষণ চুপ করেছিলেন। একবার বলেছিলেন, সক্না কোথায়?

বিভাস বলেছিল, তাকে আমি অপেক্ষা করতে বলে এসেছি।

তারকেশ্বর উঠে দরজার দিকে যেতে যেতে রুক্ষ গম্ভীর গলায় বলেছিলেন, এসব বিষয়ে আমার সঙ্গে কথা না বলে আর কখনো তুমি কারুর সঙ্গে কথা বলবে না।

বলে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। বিভাস তেমনি দাঁড়িয়েছিল। মনে হচ্ছিল, ঝড় এবং প্লাবনের পর শেষ এক টুকরো মাটির ওপর সে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যেন

শেষ আশ্বাসের মতো।

তারকেশ্বর বোধহয় তাঁর জীবনে সেই প্রথম ইচ্ছার বিরুদ্ধে কথা রেখেছিলেন। যদিও তখনো পুরোপুরি বিশ্বাস করতে পারেনি।

অথচ, তবু বিভাস শেষ সত্যি কথাটা বলতে পারেনি। বলতে পারেনি, জনকের উচ্ছেদ অন্যায়। জনকের মতো মানুষ বলেই আরও অন্যায়। তাকে সে তাড়াতে পারবে না।

ঘরের এক কোণ থেকে বুনো উঠে এসেছিল। আর পিছন থেকে পদ্ম বলে উঠেছিল, কে এই সব করতে বলেছিল আপনাকে। জানেন না বাবা এসব একদম পছন্দ করেন না।

সেই দুপুরের পর প্রথম পদ্মকে দেখেছিল বিভাস।

বিভাস ফিরে তাকিয়েছিল। ভ্রূ কুঁচকে উঠেছিল তার। কিন্তু পরমুহূর্তেই মনে পড়েছিল, পদ্মর কোনো দোষ নেই। পদ্ম সেভাবে কোনদিন চিন্তা করতে শেখেনি। সে এতক্ষণ লুকিয়ে সব শুনেছে, ভেবেছে বিভাসই অন্যায় করেছে। সে রিলিফ জানে না, কৃষিঋণ জানে না। যামতার মদ খাওয়া বোঝে না, সম্পত্তির নেশা জানে না। সে জানে না জনসাধারণের অর্থ আত্মসাৎ করার মানে কি? সে জানে বাহির এবং বাহিরের পুরুষ মাত্রেই জটিল। সেই জটিলতার মধ্যে প্রবেশের অধিকার তার নেই। প্রয়োজন নেই। সে চায়, তার বাবা আর বিভাসের মাঝখানটা থাকবে নির্ঝঞ্ঝাট নিরবচ্ছিন্ন সম্পর্কের গাঢ়তা।

সে জানে না, এই বিভাসকে দেখে কেন তার প্রাণে বেগ আসে। উচ্ছ্বাস বাধা মানতে চায় না। সবটুকু দাবী সীমাহীন হয়ে ওঠে।

আশ্চর্য। বিভাসকে যদি একটুও না চেনে, না বোঝে, তবে এমন হয় কী করে?

কিন্তু পদ্ম একা? বিদ্যুৎ কোথায়? ভাবছিল বিভাস। বুঝতে পারছিল না, বিদ্যুৎ দরজার বাইরে দাঁড়িয়েছিল কি না।

বিভাস বলেছিল, জনকের কোনো দোষ নেই।

—না থাক্, তাতে আপনার কী? বাবা বলেছে, ও বাবার শত্রু।

বিভাস বলেছিল, ওঁর শত্রু হলেও ন্যায় অন্যায় তো আছে।

পদ্ম হঠাৎ মুখখানি গম্ভীর করে বলেছিল, আপনি ওকে বাবার হাত থেকে বাঁচাতে পারবেন?

বিভাস হঠাৎ জবাব দিতে পারেনি। পদ্ম বলেছিল, তবে করুন গে ঝগড়া। আমি জানি নে কী হবে।

আসলে পদ্মর ভিতরে ব্যর্থ আশা উঁকি দিচ্ছিল। দুশ্চিন্তা হচ্ছিল তার। সে ফিরে গিয়েছিল।

সেই থেকে গম্ভীর হয়ে ছিলেন তারকেশ্বর।

এখন রাত্রি গভীর। প্রথম বর্ষণের পালা চলেছে। প্রথম রাত্রি থেকেই নিরন্তর বৃষ্টি পড়ছে। এই বাগানের গাছের ভিড়ে, বৃষ্টি যেন সরাসরি মাটিতে পড়ে না। গাছের পাতা থেকে বেয়ে বেয়ে পড়ে। তার একটা বিচিত্র শব্দ হয়। যেন সন্তর্পণে টুপটাপ করে জল ফেলছে কেউ। আর ছোট ছোট গাছগুলির পাতায় পাতায় ঝাপটা লাগে। বুঝি ছপ্‌ ছপ্‌ করে ব্যাং চলে যায়। বিভাসের মনে হয়, কে যেন আসে। কে যেন যায়। কিন্তু ঘরের দরজা তো নিথর নিঃশব্দই থাকে। মাঝে মাঝে বাতাসে শিয়রের জানালাটা নড়ে ওঠে। অস্ফুট একটা শব্দ ওঠে, আঃ! আঃ! আঃ!

কে আসবে? কে যাবে? কাকে প্রত্যাশা করে বিভাস?

পদ্ম কদিন আসছিল রোজ দুপুরে। সেও যেন আবছা আবছা মনে পড়ে বিভাসের। কয়েকদিন হল, আর তাকে দেখা যাচ্ছে না। এটাও আন্দাজ কিনা বিভাসের, কে জানে!

তারকেশ্বরের সঙ্গে সেই কথাবার্তার দুদিন পরে, ভোরবেলা বিদ্যুৎ এসেছিল। কয়েকদিনের হাসি এবং নিয়ত বিদ্রূপের পরিবর্তে, বিদ্যুতের চোখে তখন সেই স্নিগ্ধতা ছিল। সদ্য ঘুম ভাঙা বিভাস দরজা খুলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

বিদ্যুৎ বলেছিল, ঘুম ভাঙল?

—হ্যাঁ।

দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়িয়েছিল বিভাস। বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকে জানালা দিয়ে বাইরের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করেছিল, অসুবিধে করলাম না কি?

—কেন?

বিভাস তখনো বুঝে উঠতে পারছিল না কিছু।

কিন্তু বিদ্যুৎ আর ও প্রসঙ্গে কিছু বলেনি। সামনে ফিরে বলেছিল, জনকের বিষয় ঠাকুরঝির কাছে শুনলাম। কই একথা আমাকে বলেননি তো।

বিভাসের বুকের মধ্যে হঠাৎ কী রকম করে উঠেছিল বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে। বিদ্যুতের তখনো বাসি চুল, বাসি কাপড়। বিদ্রূপ নয়, অভিযোগ এবং অভিমানও নয়। মুগ্ধ প্রসন্ন আনন্দের একটা ঝঙ্কার যেন টলটল করছিল।

বিভাস বলেছিল, সেদিন পয়ারপুর থেকে ফিরে তো আপনাকেই সব বলতে এসেছিলাম। আপনি যে সব শুনলেন না।

লজ্জায় এবং আনন্দেই যেন বিদ্যুৎ দৃষ্টি একবার নত করেছিল। আবার তাকিয়েছিল।

বিভাস বলেছিল, জনককে আমি তার ঘরে থাকতে বলেছি, ফসলও তুলে নিতে বলেছি। আর আমি কিছু ভাবতে পারিনি। তাছাড়া, আপনি যে বলেছিলেন, কারুর যেন সর্বনাশ না হয়। সেদিনের কথাই আপনাকে বলতে

এসেছিলাম।

—ও!

অস্ফুট একটা শব্দ করেই চুপ করে গিয়েছিল বিদ্যুৎ। কিন্তু সহসা তার চোখ ছলছলিয়ে উঠেছিল। শুধু হেসে সে তাকিয়েছিল। যেন কী একটা খুশির স্রোত তার প্রাণের ভিতরে বইছিল।

বিভাসের মনে হয়েছিল, তার বুকের ভিতর থেকে ব্যথিত আবেগ একটা নাম উচ্চারণ করে ফুটে বেরুতে চাইছিল। সেই বিদ্যুৎকে সে যেন কোনদিন দেখেনি। একটা অস্থির বেগ তার ভিতরে কাঁপছিল।

বিদ্যুৎ বলেছিল, এত অবাক লাগল, আর এত আনন্দ হল, কিন্তু—

হাসির মধ্যেই শঙ্কার ছায়া পড়েছিল বিদ্যুতের মুখে।—কিন্তু বড় ভয় লাগছে। এর পরে?

বিদ্যুতের ভিতর বাহির সেই ভোরে একাকার হয়ে গিয়েছিল। তাই তার সবই সহজ নতুন হয়ে উঠেছিল। কিন্তু বিভাসের তা হয়নি। তাই কথা বলতে তার একটু সময় লেগেছিল। বলেছিল, পরে? আজ পর্যন্ত, এই ভোর পর্যন্ত যা হল, যা পাওয়া গেল, আগে তো তার কিছুই জানতাম না। পরশু যেমন করে ডাক্তারবাবুর সঙ্গে কথা বলেছিলাম, এমন ভাবে আগে তো কখনো বলতে হয়নি। এর পরে যা হবে, তাই হবে। আমি তো এই আমি, একে তো ছাড়তে পারব না।

বিদ্যুৎ হঠাৎ বলেছিল, আমিও কিন্তু আছি। তবে, ভয় পাবেন না যেন।

বিদ্যুৎ হেসে উঠেছিল। আর পরমুহূর্তেই তার চোখ ফেটে জল এসে পড়েছিল। প্রায় চুপি চুপি বলেছিল, কিন্তু দোহাই, ভুল বুঝবেন না যেন। মেয়েমানুষ তো। ঘরে থেকে থেকে মনটা কেমন বেড়া বাঁধা ছোট হয়ে যায়। তাই—।

বিভাসের মুখ থেকে বেরিয়ে গিয়েছিল, না—না।

বিদ্যুৎ তেমনিভাবে বলেছিল, হ্যাঁ, আমি জানি যে। কিন্তু আপনি… আপনি আর ঠাকুরঝি, দুজনেই আমার আপন · খুব…আর আমার স্বামী, যাকে রক্ষা করবার কেউ নেই…সবই মিলেমিশে কেমন যেন…আঃ! কী বলছি জানিনে।

গলার স্বর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বিদ্যুতের। বিভাসের গলা দিয়ে সমস্ত শক্তি দিয়েও অপ্রতিরোধ্য ভাবে উচ্চারিত হয়েছিল, বিদ্যুৎ!

বিদ্যুতের কান্নার বেগটা তখনো থামেনি। সে চোখ মুছছিল জোরে জোরে। তারপর লাল চোখ দুটি তুলে বলেছিল, যাই এখন। সকলের ঘুম ভাঙল বোধহয়।

বলে চলে যাবার সময় বিভাসের সামনেই থমকে দাঁড়িয়েছিল। মুখ তুলে বলেছিল, কী?

বিভাস রুদ্ধ গলায় বলেছিল, কী জানি! কিছু যে বলতে পারছি নে!

বিদ্যুৎ হেসে একটি হাত তুলে বিভাসের কপাল স্পর্শ করেছিল। বিভাসের একটি হাত ধরেছিল একবার। আবার বলেছিল, যাচ্ছি।

টুপটাপ বৃষ্টি পড়ছে। বিভাসের চোখ জ্বালা করে উঠল। বুকের মধ্যে নিঃশ্বাস আটকে রয়েছে যেন।

এ নিরন্তর বৃষ্টি থামবে না বুঝি। ব্যাং ডাকছে পুকুরে। ঝিঁঝিঁর স্বর মোটা, গম্ভীর আর একটানা বাজছে। সব ভিজছে; গোটা পৃথিবীটা ভিজছে আর একটা মেঘমেদুর ঠাণ্ডায় চুপ করে একলা বসে যেন চোখ মেলে রয়েছে।

কিন্তু ঘুম আসে না। কপালে একবার হাত দিল বিভাস। তারপরে ঠোঁটে এবং পদ্মর কথা হঠাৎ মনে পড়ল। আর পরমুহূর্তেই পাশ ফিরে সে মনে মনে বলল, যুক্তিহীন নিষ্ঠুর মনের কোনো দেবতা আছে কি? অন্ধকারের এই দেহের অচিনপুরে কি যে খুঁজে ফিরি!

চুপি চুপি সকুনা এসে খবর দিয়ে গেল, জনক মাঠে লাঙল চালিয়ে দিয়েছে। সকুনার খবর দেবার উদ্দেশ্য, তারকেশ্বরের কাছ থেকে যখন জনকের মাঠে লাঙল দেবার নির্দেশ আসবে, তখন সে কী করবে, কী বলবে?

জনকের মাঠে লাঙল দেবার কথা বিভাসের জানাই ছিল। সময় বয়ে যাচ্ছে। আর দেরি করার উপায় ছিল না। বিভাস কয়েকদিন তারকেশ্বরের মুখোমুখি হবার চেষ্টা করেছে। লাঙল দেবার আগেই যাতে একটা কথাবার্তা হয়ে যায়। কিন্তু অস্বীকার করার উপায় নেই, বিভাস তা পারল না।

সকুনাকে বলল সে, আমার তো বলার কিছু নেই সকুনা।

সকুনা অনেকক্ষণ গালে হাত দিয়ে চুপ করে বসে রইল। এমন অবস্থা সকুনার কোনদিন দেখা যায়নি। মুখে তার দুশ্চিন্তার ছায়া। সেই ছুটো-ছুটি হাসাহাসি দাপাদাপি নেই।

সে বলল, আপনি আমার সব গোলমাল করে দিলেন কমপনডরবাবু।

—কেন সকুনা?

—আমি ডাক্তারবাবুর চেলা। তাঁর কথা মেনে চলি, আমি তাঁর গোলামের গোলাম। এই আঁচনাতে কোন্ পশুপক্ষীটি কী করছে, কী বলছে, সব সংবাদ আমি তাঁকে দিই। এই পেথম আপনি আমার মতি বের্‌ভোম করলেন।

বিভাস বলল, আমি তোমাকে অন্যায় কিছু করতে বলিনি সকুনা।

—তা জানি কমপনডরবাবু। আমি গাঁয়ের চৌকিদার, আমি এত দিন ন্যায় জানতাম না, অন্যায় জানতাম না। হুকুম তালিম করতে জানতাম। ডাক্তারবাবুর কাছে কথা গোপন করা, এই আমার নতুন হাতেখড়ি, মাইরি করে বলছি বাবু।

—একবার ভেবে দেখো সক্‌না, কেন এমনটা হল।

—দেখেছি। রোজ বুচীর সঙ্গে আমার কথা হয় কমপনডরবাবু। আমরা দুজনেই বলা কওয়া করেছি, কমপনডরবাবুর জায়গা এটা নয়। ওয়াঁর মতন লোক কেন এখানে টিকতে পারবে। বাবু!

সক্‌নার গলার স্বর গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, সত্যি বলছি, জনকের ওপর আমার কোনো আকোচ নাই। বরং গাঁয়ের মেলাই ভেড়ার পালের মধ্যে ওকে বরাবর এ্যাট্‌টা মানুষ বলে জানি।

ছেলেবেলা থেকে এগাঁয়ে আমরা মানুষ। একসঙ্গে তামুক খেতে বিড়ি খেতে শিখেছি। আমরা বন্ধু মানুষ। কিন্তু দ্যাখেন, কোথা থেকে কী হয়ে গেল। জীবনটা বড় আশ্চর্য, বোঝলেন কমপনডরবাবু। এখন এই জনকের পেছুতে আমাকে ফেউয়ের মতন ঘুরতে হয়। তা কী বলব, ওকে আমি খরচের খাতায় ফেলে রেখেছি। নইলে মনকে বুঝ দিতে পারি না। এমন জ্বালা করেছেন আপনি।

—আমি।

—হ্যাঁ বাবু আপনি। আপনার জন্যে বড় চিন্তা হয়।

বিভাস হেসে বলল, আমাকেও খরচের খাতায় ফেলে রাখ সক্‌না।

—না বাবু অমন কথা বলবেন না।

বলেও সক্‌না অনেকক্ষণ চুপ করে বসে রইল। বাগানের ঘর থেকে দূরের মেঘাচ্ছন্ন আকাশের দিকে তাকিয়ে সে যেন দুঃস্বপ্ন দেখতে লাগল।

এক সময়ে উঠে দাঁড়িয়ে বলল, আমি যেচে বলে আর গণ্ডগোল লাগাব না। জিজ্ঞেস করলে বলব, জনককে বলতে গেছলাম, তা সে বললে, 'কমপনডরবাবু আমাকে ভাগে চাষ করতে দিয়েছেন।'

—ভাগে?

—হ্যাঁ, ভাগে দেয় না জমি? আপনার জমি আপনি ভাগে দিলে, চাষী চাষ করবে, আধাআধি বখরা আপনাকে দেবে।

বিভাস বলল, কিন্তু আমি তো তা দিইনি।

সক্‌না বলল, এ্যাটটা কিছু বলতে হবে তো। আর তাছাড়া জনককে বা এমনি সব দেবেন কেন বাবু? সবেরই নিয়ম কানুন আছে তো। এই তো আউশের চল্লিশ মণ ফসল তুলল। আপনি তো কিছুই পান নাই। বাবু, আমি নিজে চাষী, তা সত্যি বলছি, চাষাদের আবার ধরা বাঁধার মধ্যে রাখতে হয়। নইলে তারা ঠিক থাকে না।

বিভাস বলল, আমি সুদ ছাড়া ধার দিয়েছি জনককে। যেদিনে টাকা দেবে, সেদিনেই তার সব খালাস।

সক্‌না হাসল। বলল, কমপনডরবাবু, এ সোমসারের এ নিয়ম নয়।

—সক্‌না, জীবনের সব কিছু কি সব সময়ে নিয়ম মেনে চলে?

সক্না বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপর হঠাৎ নীচু গলায় বলল, তা বটে। শুনেছি, নতুন নিয়মও নাকি তৈরি হয়।

বলে, তারকেশ্বরের প্রকাণ্ড বাড়িটার দিকে একবার তাকিয়ে, লাঠিটা কাঁধে ফেলে চলে গেল।

তারকেশ্বরের গাম্ভীর্যে কোথাও ফাটল ধরল না। বরং গাম্ভীর্যের ওপরে একটা পাথরের কাঠিন্য নেমে আসছে। কথাবার্তাও প্রায় বন্ধ হয়ে এল। ডিসপেন্সারি থেকে হয় তিনি আগে বাড়ি চলে আসেন। নয়তো বিভাসকে আগে পাঠিয়ে দিয়ে, নিজে অনেক পরে আসেন।

সক্নার কাছেই জানা গিয়েছে, জনকের জমিতে আমন চাষের বিষয় কিছুই জিজ্ঞেস করেননি, সক্নার জীবনে এ ঘটনা প্রথম, তারকেশ্বর তাকেও এ-বিষয়ে কোনো খোঁজখবর করতে বলেননি। সক্না অস্বস্তিতে ভুগছে।

শ্রাবণ মাস। আঁচনা এখন জলে ডুবে রয়েছে বলা যায়।

মাঝে হঠাৎ একদিন রটে গেল, যোগেশ ঘোষালের দল নেদোর খালের বাঁধ ভেঙে দিতে যাচ্ছেন। কিছুদিন আগেই যেমন পয়ারপুরের রথের মেলায় লোক ছুটেছিল, তেমনি করেই সবাই নেদোতে ছুটেছিল।

বিভাস অবাক না হয়ে পারেনি। সদরে কাজে গিয়ে ঘোষালের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছিল। তখন এ বিষয়ে কোনো কথাই হয়নি। তাই, কৌতূহল বশত বিভাসও নেদোতে গিয়েছিল।

দেখা গেল, খালের বাঁধ ভাঙা নয়, বাঁধ ভাঙার সভা। টোকা আর ছাতায় সভা প্রায় ঢাকা পড়ে গিয়েছিল। বৃষ্টি মাথায় করে যে সভায় এত লোক আসতে পারে, সে ধারণা আগে বিভাসের ছিল না।

প্রধান বক্তা ছিল দিবানাথ চৌধুরী। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল যোগেশ ঘোষালের বাড়িতে। বয়সে যুবক। ইতিহাসে এম. এ.। সদর কেষ্টপুরেই কোনো এক স্কুলে শিক্ষকতা করে।

এই সমগ্র অঞ্চলে, দিবানাথকে সবাই গৃহত্যাগী রাজপুত্র বলে। উগ্র ক্ষত্রিয় বংশের ছেলে। ওর বাবাও এক রূপকথারই চরিত্র। শোনা যায় ধনকুবের। বাড়ির দেওয়ালগুলিও নাকি পুরনো নবাবী আমলের মোহরে গাঁথা। ধর্মে পরম বৈষ্ণব। হাতে জপের মালা ছাড়া চলেন না। নামাবলী গায়ে থাকে সর্বক্ষণ। বাংলা দেশের সকল বৈষ্ণব সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। তাঁর দান নেই, এমন বৈষ্ণব সংস্থা নেই। এখন নাকি আক্ষেপ করে বলেন, লেখাপড়া শিখতে দিয়ে একমাত্র ছেলেটিকে হারালাম।

যদিও দিবানাথ সরাসরি কোনো রাজনৈতিক দলের মধ্যে নেই, তবু রাজনৈতিক ব্যক্তি হিসেবেই তার পরিচয়। বাপের সঙ্গে মতবিরোধের ফলে তাকে ঘর ছেড়ে আসতে হয়েছে, সদর কেষ্টপুরেই তার আস্তানা।

সভার মাঝখানেই ঈশান আবিষ্কার করেছিল বিভাসকে। এবং অনেকেই হঠাৎ তার দিকে তাকিয়ে অবাক হয়েছিল। কারুর কারুর চোখে সন্দেহও দেখা দিয়েছিল। সভার শ্রোতাদের এক অংশ ভেবেছিল, তারকেশ্বরের অনুচর হিসেবে সে বুঝি গোয়েন্দাবৃত্তি করতে এসেছে।

শেষ পর্যন্ত সভামঞ্চে গিয়ে বসতে হয়েছিল বিভাসকে। দিবানাথ অনুরোধ করেছিল, তাকে কিছু বলতে। বিভাস কোনদিন বক্তৃতা দেয়নি। ওসব তার অজানা ছিল।

এবারেও সকনাই খবর দিল, বিভাসের নেদোর সভায় যাওয়ার খবরটা রটে গিয়েছে। মানুষ রটাতে ভালবাসে। যা তাদের মন চায়, মনের ভিতরের অপরিচিত ইচ্ছাগুলিও ঘটনা হয়ে বেরিয়ে পড়ে। সে হিসেবে সাধারণ মানুষও এক রকমের শিল্পী। এমন কথাও রটল, বিভাস নেদোর সভায় বক্তৃতা দিয়েছে।

কিন্তু তারকেশ্বরের বিশেষ কোনো ভাবান্তর দেখা গেল না। দেখা সাক্ষাৎটাও প্রায় বন্ধ হয়ে গেল।

ভাদ্র মাসের মেঘ ও রৌদ্রের খেলা সুরু হল আকাশ জুড়ে। পৃথিবীর দক্ষিণাংশে আলো উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সূর্য তার অয়নবিন্দু থেকে দক্ষিণে যাত্রা সুরু করেছে।

আকাশ যেন অনেক বড় হয়ে গেল। পৃথিবী গম্ভীর হয়ে উঠল। এই বুঝি অয়নান্ত মুহূর্ত। এর পরেই আকাশ ছোট হয়ে আসবে। পৃথিবী শীতার্ত হয়ে কুয়াশা মুড়ি দেবে।

বিভাসের মনে হয়, বুকের ভিতরে একটা অসীম শূন্যতা যেন থমথম করছে। দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় একটা কী আবছায়া যেন ঘিরে আসছে চারদিক থেকে।

সে এখন রোজ একলাই খেতে যায়, ভুবনেশ্বরী রোজ এসে বসেন। আগে তাঁর নিয়মিত উপস্থিতি ছিল না। এত কথা বলতে আর কখনো শোনা যায়নি।

তাপস প্রায়ই গল্প করে, বউ কী বলেছে। দিনে কী বলেছে, রাত্রে কী বলেছে। বলে, বউ রোজ রাত্রে জানালা খুলে অন্ধকারে তাকিয়ে থাকে। আমি যদি জিজ্ঞেস করি, অন্ধকারে কী দেখছ?

বলে, 'কিছু দেখতে পাই না।'

আমি বলি, তবে মিছিমিছি কেন দেখছ?

বলে, 'দেখতে পাই না বলে।'

তাপস হ্যা হ্যা করে হেসে ওঠে। বলে, বউটা পাগল, না কম্পাউণ্ডারবাবু?

বিভাস বলে, বোধহয়।

তাপস আবার বলে, আপনার কথা রোজ বলে।

বিভাস চুপ করে থাকে। তাপস বলে, বাবার সঙ্গে যে আপনার ঝগড়া চলছে, বউ তা জানে। তাই ওর খালি ভয় কখন কী ঘটে।

তাপস কথা বলতে বলতে মাঝে মাঝে গম্ভীর এবং অন্যমনস্ক হয়ে যায়। বলে কম্পাউন্ডারবাবু, বউ না অনেক দূরে অবধি স্কুলে পড়েছিল। ও রোজ গীতা পড়ে। আমি লেখাপড়া জানি না, আমি হাবা, আর—

তাপসেরও গলার স্বরটা যেন কেমন ঘড়ঘড়ে শোনায়। বলে, আর আমার তো কখনো ছেলেপিলেও হবে না। আচ্ছা কম্পাউন্ডারবাবু, কেন হবে না?

তাপসের দুই চোখে বিস্মিত ব্যথিত প্রশ্ন। শিশুর মতো হা মুখে জিভটা বেরিয়ে থাকে। গজ চোখের চাহনি দেখে বোঝা যায় না, কোনদিকে তাকিয়ে আছে।

বিভাস যেন খুব ধীরে ধীরে নিশ্বাস ফেলে বলে, আপনি কলকাতায় গিয়ে একবার কোনো বড় ডাক্তারকে দেখিয়ে আসুন।

—কেন? আমার তো কোনো অসুখ নেই। আমি, আমি তো···সবাই যা বলে···বউকে···মানে আমি ব্যাটা ছেলে···।

বক্তব্য বলতে গিয়ে লজ্জায় তাপসের মুখ, গলার শিরগুলি স্ফীত হয়ে ওঠে। আর বিভাস তার বক্তব্যের অর্থ বুঝতে পেরে যুগপৎ লজ্জায় এবং অপরিচিত অনুভূতিতে রুদ্ধশ্বাস বোবা হয়ে যায়। সে যেন বসে থাকতে পারে না।

তাড়াতাড়ি বলে বিভাস, না, না, তাপসবাবু, অসুখটা অন্য জিনিষ। ওটা ডাক্তারকে না দেখালে বোঝা যায় না।

তাপস অবাক হয়ে তাকিয়ে বলে, অ। আর রাসুরা যা বলে···আমি নাকি—

বিভাস তাড়াতাড়ি বাধা দিয়ে বলে, ওসব রাসুদের কথায় কানদেবেন না।

তাপস থামে। কিন্তু বিভাসের সমগ্র অনুভূতির মধ্যে একটা প্রবল কম্পন দীর্ঘ সময় ধরে ঝন্‌ঝনিয়ে বাজতে থাকে।

হঠাৎ একদিন দুপুরে প্রায় ঝড়ের বেগে বিদ্যুৎ ঘরে ঢুকল।

বিভাস চুপচাপ শুয়েছিল। উঠে বসল তাড়াতাড়ি।—কী ব্যাপার!

বিদ্যুৎ গম্ভীর মুখে বলল, কী নয়, তাই শুনি। আপনার সঙ্গে নাকি ঠাকুরঝির বেশ কয়েকদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই?

এ কথা বিভাসের কয়েকদিন ধরে মনে হচ্ছিল। কিছু দিন ধরে পদ্মকে দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু সে চিন্তা তার চেতনার মধ্যে কখনো কখনো তরঙ্গায়িত হয়ে উঠেছে। প্রত্যক্ষ ভাবে কিছু ভাবেনি। উদয়াস্তের কোথায় একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে, সেটা ধরা পড়েনি।

বিভাস বলল, হ্যাঁ, ওকে যেন দেখছিনে কদিন। কেন বলুন তো।

বিদ্যুৎ বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে বলল, কেন আবার কী। হঠাৎ দেখছি, বাড়িটা নিঝুম, হাসি টাসি শোনা যাচ্ছে না। ঠাকুরঝির দিকে

তাকিয়ে দেখি, সে কখনো চিলে কোঠায়, কখনো বৈঠকখানা বাড়ির ছোট বাগানে। একেবারে চুপচাপ। তারপরে দেখছি, খাওয়া দাওয়া মাথায় উঠেছে। চোখের কোণ বসা। চেপে ধরলাম। কিছুতেই কিছু বলবে না। জিজ্ঞেস করলাম, বিভাসবাবু কিছু বলেছেন নাকি? বললে, তার সঙ্গে আমার দেখা সাক্ষাৎ নেই। বলতে বলতেই, দেখলাম ঠাকুরঝির চোখে জল। কেন? কী হয়েছে আপনাদের?

বিভাস বলল, কই, কিছু হয়েছে বলে তো মনে পড়ছে না।

—তবে?

বিভাস ভ্রূ কুঁচকে এক মুহূর্ত ভেবে বলল, জানিনে ডাক্তারবাবুর ব্যাপারে আমার ওপর রাগ হয়েছে কি না।

বিদ্যুৎ দৃঢ় গলায় বলল, ঠাকুরঝি তো সে মেয়ে নয়।

বলতে বলতে বিদ্যুতের মুখ আরও গম্ভীর হয়ে উঠল। অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে দু এক পা জানালার কাছে সরে গেল সে। বাইরে আকাশটা তার দরজা খোলা-বন্ধ করছে। আর পৃথিবীতে আলো ছায়া লুকোচুরি খেলছে।

বিদ্যুৎ মুখ ফিরিয়ে বলল, এমন করে কোনো মেয়েকে আমি মরতে দেখিনি। বিভাস বিস্মিত হয়ে বলল, মরতে?

বিদ্যুৎ বলল, তা মরতেই তো। যার কাছে জীবন মরণ সব সঁপে দেওয়া যায়। নিজের জন্যে যে কিছুই রাখে না…

বিভাসের মনে পড়ে গেল বাউলপাড়ার সেই মেয়েটির কথা, 'মা আমাকে ওর কাছে গিয়ে মরতে দে।' মেয়েটি বাঁচেনি। হাসপাতালে গিয়ে যখন পৌঁছেছিল, তখনও প্রাণ ছিল। ডাক্তার আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু বাঁচাতে পারেননি।

পদ্মর মুখখানি বিভাসের মনে পড়ল। ব্যথা ও মমতায় মনের মধ্যে কেমন টলটলিয়ে উঠল।

বিদ্যুৎ বলল, সংসারে দেখেছি, অনেকে নিজের জন্যে একটু কিছু ধরে রেখে দেয়। কিন্তু ঠাকুরঝি একটু কিছু রাখেনি। আপনি বোঝেন না?

বিদ্যুৎ ফিরে তাকাল। বিভাস দেখল, বিদ্যুতের তীক্ষ্ণ চোখ একটুও নত হল না। বিভাস বলল, সবটা হয়তো ঠিক বুঝে উঠতে পারিনে।

বিদ্যুৎ বলল, বোঝা উচিত।

বিভাসের মুখ অসহায় হয়ে উঠল।

বাইরে গাঢ় ছায়া দেখে বোধহয় যেন মেঘ ঘনিয়ে আসছে।

বিদ্যুৎ আবার বলল, জানিনে ভবিষ্যতে কী আছে। কিন্তু যতক্ষণ সামনে আছেন, ঠাকুরঝিকে আপনি কাঁদাবেন না।

—আমি কাঁদাতে চাইনি।

—তবু আপনার দায় থেকে যায়।

বলে বিদ্যুৎ চোখ নত করল। আবার তাকাল। চোখাচোখী করে হেসে ফেলল। বলল, প্রেম করছেন আপনারা, দূতীয়ালী করব আমি?

বলে খিলখিল করে হেসে উঠল বিদ্যুৎ। স্খলিত ঘোমটা টেনে দিল এবং পরমুহূর্তেই গম্ভীর হয়ে বলল, কিছু মনে করবেন না যেন।

বিভাস স্তব্ধ, আড়ষ্ট। তার সমস্ত মুখটা সহসা অন্ধকারে ছেয়ে গেল।

বাইরে রোদ উঠল। ছায়াকে ধরবার জন্যে যেন ছুটে এল।

বিদ্যুৎ বলল, যাচ্ছি। মনে রাখবেন কথাটা। মানে নালিশটা।

চলে গেল বিদ্যুৎ। বারান্দা থেকে মুখ ফিরিয়ে একবার হেসে গেল।

এক এক সময় বিভাসের মনে হতে লাগল, তারকেশ্বর তাকে যেন আঁচনা ত্যাগ করবার নিঃশব্দ নির্দেশ দিচ্ছেন। অধিকাংশ জায়গায় রুগী দেখতে একলাই যান। সাহায্যের প্রয়োজন হলেও বলেন না। প্রেসক্রিপশন লিখে ফেলে রাখেন টেবিলের ওপরে। কচ্চিৎ কখনো দু একটা কথা বলেন। ইউনিয়ন বোর্ডের কাজ বা অন্যান্য বিষয় একেবারেই আলোচনা করেন না।

তারকেশ্বর না থাকলে রাসু মাঝে মাঝে হাঁ করে তাকিয়ে থাকে বিভাসের দিকে। তার অভ্যেসটা বরাবরই যে রকম। আঁচনায় এসে প্রথম প্রথম অস্বস্তি হত। তারপরে সয়ে গিয়েছিল। ইদানিং আবার অস্বস্তি লাগছে। মনে হয়, এই আঁচনায় কোথায় যেন একটা অদৃশ্য নরক আছে। রাসুর মধ্যে সেই নরকটা মাঝে মাঝে ভর করে।

বিভাস জিজ্ঞেস করে, কী দেখছেন বলুন তো তাকিয়ে তাকিয়ে।

রাসু ওর সেই মোটা গলাটা বার করে বলে, আপনাকে!

—কেন?

—ভাবছিলাম, আপনার কী রাশি, আর কী লগ্ন।

—কী হবে জেনে?

—একবার দেখতাম বিচার করে।

বলে সে চুপ করে যায়। বিভাস খালি বলে, তবু জেনে রাখবেন আমি ফেরেববাজ নই। রাসু বলে, তা কী জানি! ফেরেববাজেরও তো রকমফের আছে। তবে হ্যাঁ, আপনার সাহস আছে।

—আছে বুঝি?

—খু-উ-ব! বাব্বা! আপনি যদি এ গাঁয়ের ছেলে হতেন, তা হলে—।

একটা নিঃশ্বাস টেনে বলে, তা হয়তো লেখাপড়ার জন্যে শহরেই থাকতেন বরাবর। গাঁয়ে আসতেনই না।

বিভাস বুঝতে পারে, কুগ্রহের অশুভ ছায়া আগে রাসুই দেখতে পায়। সে যুদ্ধক্ষেত্রের ঘোড়ার মতো। বিপদের গন্ধ যারা আগেই পায়। কারণ সে আঁচনার অদৃশ্য গভীরের মানুষ। সে ভয় দেখাতে চায় কিংবা সাবধান করতে চায়

বিভাসকে। কিন্তু তার কোনোটাই এখন আর বিভাসের চিন্তার আয়ত্তে নেই।

সকুনা একদিন বলেছিল, রাসু শালার কাছে একটু সাবধানে থাকবেন। বছরে একদিন নাকি ঢোরা সাপেরও বিষ গজায়।

কে জানে, রাসুই কোনো বিপদ বহন করে আনছে কি না?

দুদিন ধরে তারকেশ্বর সদরে রয়েছেন। অনাদি মুখুজ্জের বাড়িতেই রয়েছেন। আজ তৃতীয় দিন। সংবাদ নিয়ে এল সকনা, আরও দুদিন দেরি হবে ফিরতে।

এদিকে বুঝি বেশ বৃষ্টিই নেমেছে। নব আগন্তুক আশ্বিনের জন্যে কিছুই বোধহয় থাকবে না আকাশে। প্রবল ধারা দেখে, কারুর কারুর চোখে শঙ্কার ছায়া দেখা দিয়েছে। গতিক নাকি সুবিধের নয়। আঁচনার নদী ভীষণ গর্জাচ্ছে। বাণ হয়ে যেতে পারে। যদিও মতদ্বৈধ আছে অনেক।

এ সময়েই রুগীর সংখ্যা সাধারণতঃ বাড়ে। কিন্তু বর্ষায় কেউ বেরোতে পারে না। বিকালে বিভাস ভিজতে ভিজতে ডিসপেন্সারিতে এসে অনেকক্ষণ ধরে বসে রইল। তারকেশ্বর নেই। রাসুর রান্না খাওয়া ঘুচে গিয়েছে। সারাদিন স্থানীয় চোলাই খেয়ে পড়ে আছে।

সন্ধ্যার আগেই বিভাস বাড়ির দিকে পা বাড়াল। কারণ, একবার রাসু উঠতে পারলে, তার কথা আর থামবে না।

বাড়ি প্রদক্ষিণ করে, বাগানের কাছে আসতেই, পদ্মর সঙ্গে মুখোমুখী দেখা হয়ে গেল। পদ্ম বাগানের দরজায়, খিলানের তলায় বৃষ্টি থেকে মাথা বাঁচিয়ে দাঁড়িয়েছিল। বিভাসকে দেখামাত্র ফিরতে উদ্যত হচ্ছিল পদ্ম।

বিভাস ডাকল, পদ্ম, শোন!

পদ্ম দাঁড়াল। কিন্তু পিছন ফিরে রইল। পদ্মর মতো মেয়ের পক্ষে এ ভঙ্গি বড় করুণ। এ শুধু অভিমান নয়। একটা ব্যথা যেন আড়ষ্ট করে রেখেছে। সে যেন তন্ময় হয়ে বাগানের দিকে তাকিয়েছিল।

বিভাস কদিন ধরেই পদ্মর দেখা পাবার চেষ্টা করছিল। খেতে বসে বিদ্যুৎকেও বলেছিল, পদ্মকে দেখতে পাচ্ছিনে।

বিদ্যুৎ জবাব দিয়েছিল, খুঁজে নিতে হবে।

এখন দেখা পেয়ে সে বলল, তোমাকে তো দেখতেই পাইনে। বাগানের ঘরে একবার আসবে না কি?

পদ্মর গলা শোনা গেল, কেন?

প্রশ্নটা যেন বিভাসকে একটু নাড়া দিয়ে দিল। বলল, কথা ছিল।

মুখ না ফিরিয়েই পদ্ম একটু অপেক্ষা করে বলল, চলুন, যাচ্ছি।

বিভাস গিয়ে দরজা খুলে, ঘরে ঢোকবার আগে পিছন ফিরে দেখল, পদ্ম এসে পড়েছে। বিভাস ডাকল, ঘরে এস।

পদ্ম চোখ তুলে তাকাল। সত্যি, পদ্মকে রুক্ষ অসুস্থই দেখাচ্ছে যেন।

ও এমন গম্ভীর হলে অবাক লাগে, ভাবনাও হয়। পদ্ম বলল, যাচ্ছি। আপনি আগে ভেতরে গিয়ে ভেজা জামা কাপড় ছাড়ুন।

আরও অবাক হল বিভাস। এ বিষয়ে পদ্মর দৃষ্টি এড়ায় না। সে ঘরে গিয়ে জামা কাপড় বদলাল। তারপরে ডাকল, এস।

পদ্ম যেন সহজভাবেই এল। চৌকির কাছে দাঁড়িয়ে বলল, বলুন।

বিভাস কাছে এসে দাঁড়াল। বলল, আমার দিকে তাকাচ্ছ না যে?

পদ্ম বলল, কী হবে তাকিয়ে?

এ সেই পদ্মর গলা নয়, এ যেন সে পদ্ম নয় যে ধমক দেয়, ভেংচায়, কথায় কথায় হাসে, উপহাস করে।

বিভাস বলল, আমার ওপর রাগ করেছ?

পদ্ম মাথা নেড়ে জানাল, না।

—তবে?

পদ্ম মুখ না তুলে বলল, আপনার ভাল না লাগলে কী করব?

—কে বলেছে আমার ভাল লাগে না?

—দেখতে পাই।

—কেমন করে?

পদ্মর আর জবাব পাওয়া গেল না। শরীরটা থর্‌থর্‌ করে কাঁপতে লাগল।

বিভাস ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম সহসা জানু পেতে চৌকিতে মুখ গুঁজল। বিভাসের বুকের মধ্যে তীরবিদ্ধ একটা ব্যথা টনটনিয়ে উঠল। সেও জানু পেতে পাশে বসে, পদ্মর পিঠে হাত রাখল। বলল, পদ্ম, সব হয়তো বুঝতে পারিনি। আমায় একটু বল।

পদ্ম কোনো জবাব দিতে পারল না। বিভাস তাকে আকর্ষণ করল। পদ্ম বিভাসের দিকে ফিরে কান্না রোধ করার জন্যে নিঃশ্বাস বন্ধ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আপনার কোনো দোষ নেই। আমার কষ্ট হয়।

বলতে বলতে পদ্মর গলা আবার বন্ধ হয়ে এল।

বিভাস বলল, এখন তোমাকে দেখে আমারও কষ্ট হচ্ছে?

পদ্ম মাথা নেড়ে বলল, না না, তা কেন হবে। আপনি তো ফিরে তাকিয়ে দেখেননি। আমি কেবল ঘুরে গেছি। দেখা হলেও কথা বলেননি। আপনি কী যেন ভাবেন। আপনার দোষ নেই। কেবল…

—কী পদ্ম?

—আমার আর কিছু ভাল লাগে না।

অত্যন্ত অসহায় শোনাল পদ্মর গলা। বলল, আমাকে আপনার ভাল না লাগলে কী করবেন।

বিভাস দু'হাতে পদ্মর মুখ তুলে ধরল। কান্নায় পদ্মর ফর্সা মুখ রক্তাভ দেখাচ্ছে। চোখও লাল। আবাঁধা রুক্ষ চুল কপালে এসে পড়েছে। কয়েক

মুহূর্ত নিরীক্ষণ করে বিভাস নীচু স্বরে বলল, লাগে পদ্ম।

পদ্মর চোখে বড় বড় ফোঁটায় জল জমে উঠল।

বিভাস পদ্মর মুখ কাছে টেনে চুম্বন করল। পদ্মর মুখ আরও লাল হয়ে উঠল। চোখের কোণে জমা জল গাল বেয়ে পড়ল।

বিভাস ডাকল, পদ্ম।

পদ্ম চোখ তুলল। বিভাসের চোখের দিকে তাকিয়ে, তার একটা হাত ধরল আলগোছে। আঁচল দিয়ে চোখ মুছল।

বিভাস বলল, পদ্ম রাগ করো না যেন।

পদ্ম বলল, রাগ করিনে।

ছায়ার কোলে দীপ্ত শিখার মতো পদ্মর মুখে একটু হাসি দেখা গেল। চোখ নামিয়ে নিল সে। তারপর আস্তে আস্তে বিভাসের হাতটা টেনে নিয়ে নিজের মুখটা ঢেকে দিল।

বিভাস হাত টেনে নিয়ে পদ্মর চিবুক তুলে ধরে তার রক্তোষ্ঠ আবার চুম্বন করল।

পদ্মর চোখ রৌদ্র চকিত হয়ে উঠল।

বিভাস বলল, পদ্ম বুঝি ভবিষ্যতের কথা ভাবো।

পদ্ম বলল, না। তুমি ভেবো।

॥ তেরো ॥

বিভাস খেয়ে দেয়ে, বিশ্রাম করে অনেকক্ষণ ডিসপেন্সারিতে এসেছে। কিন্তু তারকেশ্বর এখনো আসেনি। এদিকে বেলা চলে গেল। রুগীরা এসে ভিড় করছে। যাদের ওষুধ দিয়ে দেবার কথা, তাদের বিদায় করেছে বিভাস। যারা ডাক্তারকে দেখাতে এসেছে, তাদের বসে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

এখন জলে টান ধরেছে। মাটি শুকিয়ে উঠছে। রাস্তা শক্ত হচ্ছে আবার। আঁচনার বাজারে সকাল সন্ধ্যায় আবার লোকজনের আনাগোনা বাড়ছে। পুজোর সময় থেকেই বাড়ছে। মুদী দোকান, খাবারের দোকান দু'একটা খুলে বসছে আবার। এতদিন পাড়ার ছোটখাটো মুদীখানাতেই লোকের চলছিল। এখন আর চলে না। কারণ, প্রকৃতির সঙ্গে সবই বাঁধা। এই শুকনো দিনে ঘরে বসে থাকতেও ইচ্ছে করে না। কাছে পিঠের খাল-বিলের মাছ, সামান্য তরি-তরকারি রোজই বসতে আরম্ভ করেছে দু'বেলা।

পুজোর সময় কাদা পাঁকের মধ্যে কয়েকদিন খুব ভিড় গেছে। মাঝে একটু ভাঁটা পড়েছিল। আবার সুরু হয়েছে। আসলে বর্ষার পরে, জীবন যেন নতুন করে আরম্ভ হয়। গ্রীষ্মের সময়ে এখানে পুরোপুরি পশ্চিমের আবহাওয়া। শুকনো ঝড়ো বাতাস। যাকে বলে লু। তারপরে বর্ষা। বর্ষার ঝোঁক শরৎ পর্যন্তই চলে। হেমন্ত শীত বসন্তকালে যত চলা-ফেরা হাঁক-ডাক ব্যস্ততা।

এ সময়ে মনে হয়, স্কুলটাও বেশ ভাল চলে। শিক্ষক এবং ছাত্রেরা সকলেই নিয়মিত আসে। ঘণ্টা বাজে, হল্লা শোনা যায় ছাত্রদের। আঁচনাকে একটু জমজমাট মনে হয় সব দিক দিয়ে। তারকেশ্বরের বাগানে না আসুক, গ্রামে পাখীরা আসতে আরম্ভ করেছে বিদেশ থেকে।

এখন রোদের রং সোনার মতো দেখায়। গাছগুলির যেন পূর্ণ যৌবন! মাঠে মাঠে শস্য। সব দেখে শুনে বিভাসের মনে হয়, গান ধরি, 'আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালবাসি।'

রাসু বাতি জ্বালিয়ে দিল। ধূপদানে ছোবড়া জ্বালিয়ে ধুনো দিয়ে, ধোঁয়া ওড়ালো। আর ধূপদানটা নিয়ে ডাক্তারখানায় ও পাশের মহাজনী ঘরে ঘুরে ঘুরে বলল, জয় হরি, হরি হরি বল মন, বোল হরি!...

—কই গো কমপন্ডরবাবু, ডাক্তারবাবু আসবেন কখন?

বিভাস মনে মনে বলল, হয়তো আসবেন না। কারণ কয়েকদিন ধরে দেখা যাচ্ছে, তারকেশ্বর প্রায় একেবারেই বেরোচ্ছেন না। কদিন ধরেই কেবল বন্দুক নিয়ে বাগানের আশেপাশে ঘুরছেন। পানের মাত্রাও বাড়িয়েছেন।

বিভাসের মনে হয়, সমস্ত পৃথিবীটা যেন ক্রমেই আরও থমথমিয়ে উঠছে।

বাতি জ্বলে যাবার একটু পরেই বুনো এসে বলল, কম্পাণ্ডরবাবু, কর্তায় শরীর খারাপ। আপনাকে ডেকেছেন।

বিভাস তাড়াতাড়ি উঠল। বলল, জ্বর টর হয়েছে নাকি? ওষুধপত্র কিছু নিয়ে যেতে বলেছেন?

বুনো হেসে বলল, সে সব কথা আমাকে বলেননি। বললেন, একবার কম্পাণ্ডরবাবুকে ডেকে দে।

বিভাস বলল, ও! উনি কি উপরে আছেন?

—না, বাইরের বাড়িতে।

বিভাসের ভ্রু জোড়া কুঁচকে উঠল দূর সন্ধানী চিন্তায়। কে একজন বলে উঠল, হয়েছে। খোদ ধন্বন্তরী আজ কাৎ হয়েছেন। আমাদের ব্যবস্থা আর তা হলে হবে না। কম্পাউণ্ডারবাবু একটু দেখে দেন না।

বিভাস বলল, আপনারা একটু বরং বসুন, আমি দেখা করে এসে দেখব।

টর্চলাইট নিয়ে বেরিয়ে যাবার মুখে বুনোকে খুঁজল বিভাস। কিন্তু সে যেন হাওয়ায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

বাড়ির একটি অংশ চক্র দিয়ে, সামনের দিকে যেতে হয়। বিভাস দেখল, গোটা বাড়িটা অন্ধকার, স্তব্ধ। রোজই তাই থাকে। তবু, আজ থম্‌থমে লাগছে বাড়িটা। কোথায় কোন্ দরজায় যেন শব্দ হল। বিভাস একবার থামল। কিন্তু আর কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। পা বাড়াতেই আবার থম্‌কে গেল। কি যেন পড়ে গেল ঝন্‌ঝন্ করে। বোধহয় বাড়ির মধ্যে কারুর হাত থেকে থালা বাটি পড়ে গিয়েছে।

বাড়ির সামনের দিকে এসে, গেট ঠেলে উঠোন পেরোবার আগেই দেখল বিভাস, বাইরের ঘরে আলো জ্বলছে। ঘরটি বিভাসের পরিচিত। বাইরের ঘর না বলে এটাকে তারকেশ্বরের খাস ঘর বললেই ভাল হয়। এটা রায়বাড়ির সেই পুরনো অংশ।

ঘরে ঢোকবার আগেই নাকে গন্ধ গেল বিভাসের। তারকেশ্বরের অসুখ বলল বুনো। কিন্তু উনি সমানে পান করে চলেছেন। অসুখের কথাটা তা হলে সত্যি নয়। সে ঘরে ঢুকল।

একটি মাত্র কেরোসিনের গম্বুজ ধরনের চিমনীর আলো জ্বলছে টেবিলের ওপর। টেবিলের সামনেই চেয়ারে বসে আছেন তারকেশ্বর, মদের বোতল আর গেলাস সামনেই। পয়েন্ট টু রাইফেলটার অংশবিশেষ খোলা রয়েছে টেবিলের ওপরে। উনি টের পাননি বিভাস এসেছে। আলোর দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন। মুখটা লাল টকটকে আর মস্ত বড় দেখাচ্ছে। এ সেই সিংহ মূর্তি। শক্ত কোঁচকানো ছোট ছোট ধূসর চুলগুলি কেশরের কথা মনে পড়িয়ে দেয়।

এ ঘরটি বিশেষ ঘর। নানান রকমের গদী আঁটা চেয়ার টেবিল দিয়ে সাজানো। বড় আয়না দেয়ালে। আলমারির ভিতরে বৈয়ামের মধ্যে সাপের কঙ্কাল। আর মানুষের কঙ্কালটা তাঁর পিছনেই। তারকেশ্বরের ছায়া পড়েছে কঙ্কালটার গায়ে। ঘরের মেঝেতে তেমন আলো পড়েনি। কিন্তু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, গুটি আটেক দেশী কুকুর শুয়ে আছে এখানে ওখানে। এরা তারকেশ্বরের সেই শিকারের কুকুর। আলো তেমন জোরালো নয়। ঘরের অন্ধকার ঘোচেনি। বরং একটি অস্পষ্ট-আলো-আঁধারের সৃষ্টি করেছে। চাকর বুনো নিশ্চয় এতক্ষণে উপস্থিত হয়েছে। আছে এঘরেই কোনো এক কোণে বসে। দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। ডাকা মাত্র সাড়া দেবে।

তারকেশ্বরকে দেখা মাত্র একটা অশুভ চিন্তা চেপে ধরল বিভাসকে। এ আর এক তারকেশ্বর। এবং এ তারকেশ্বরকেও কিছু চেনা আছে বিভাসের। এ বোধহয় সেই কেউটে, যে আগেই ফুঁসে ওঠে। আগে হাত তোলা যার জীবন ধর্ম। জ্যৈষ্ঠ মাস থেকেই শত্রুর ছায়া দেখে যিনি ফুলছিলেন।

বিভাস দরজার কাছ থেকেই বলল, আমাকে ডেকেছেন নাকি?

তারকেশ্বর মুখ তুললেন না। যেন জানেন, বিভাস এসেছে। বললেন, হ্যাঁ। এস, বস। বুনো!

—আজ্ঞে।

যা ভাবা গিয়েছিল, তাই। বুনো উঠে এল ঘরের এক পাশ থেকে। তারকেশ্বর বললেন, তুই এবার যা।

বুনো একবার বিভাসের দিকে তাকিয়ে দরজা দিয়ে অদৃশ্য হল। তারকেশ্বর চোখ তুললেন বিভাসের দিকে। লাল ঝকঝকে চোখ, দু'খণ্ড অঙ্গারের মতো। কিন্তু ক্ষিপ্ততা কিংবা ক্রোধের লেশ মাত্র নেই। একটা

চেয়ার দেখিয়ে বললেন, ওখানে বস।

বিভাস বসল। তারকেশ্বর গেলাসে চুমুক দিয়ে, মুখটা উঁচু দিকে তুললেন। যেন কড়ি বরগা দেখছেন। সেই ভাবেই বললেন, ভেবেছিলাম, তোমাকেই বলব বন্দুক টন্দুকগুলো পরিষ্কার করতে। কাল একটু কালি-কেউটের বিলে যাব ভাবছি।

সেটা অস্বাভাবিক নয়। মরসুমে উনি শিকারে গিয়ে থাকেন। বিভাসও গেছে কয়েকবার সঙ্গে। বিভাস বলল, আমাকে বললেন না কেন, পরিষ্কার করে রাখতাম।

তারকেশ্বর বললেন, বলতাম। কিন্তু লজ্জা করল হে।

বিভাসের দিকে তাকালেন। বিভাসের অস্বস্তি হল যেন চোখে চোখ রাখতে। কিন্তু লজ্জা? এ কথাটা প্রথম শুনল সে। তারকেশ্বর নিঃশব্দে হেসে উঠে বললেন, তারকেশ্বর রায়ের নাকি জামাই হতে চলেছ তুমি! তাই, ফাই-ফরমায়েস করতে লজ্জা করল।

বিভাস মুখ নামিয়ে নিল। তারকেশ্বর বললেন, তুমি জানতে এ কথা?

বিভাস বলল, জানতাম।

—কে বলেছে?

বিভাস চোখ তুলে তাকাল। তারকেশ্বর তাকিয়ে আছেন। বললেন, তুমি নির্ভয়ে বল। বাইরের কেউ?

—না।

—তবে? বাড়ির কেউ?

—হ্যাঁ।

—কে?

বিভাস ভুবনেশ্বরীর কথাটা বলবে কি না বুঝতে পারল না। যদিও মনে হচ্ছে, এখন সব দ্বিধা-দ্বন্দ্বের সময় চলে গিয়েছে, তারকেশ্বরের সঙ্গে খোলা-খুলি কথা বলাই ভাল। তার আগেই তারকেশ্বর বললেন, পদ্মর মা বলেছে?

—হ্যাঁ।

তারকেশ্বর আবার হেসে উঠলেন। বললেন, তোমার সঙ্গে যে বাড়ির লোকদের এত ভাব হয়ে গেছে, আমি সে খবরও জানতাম না। আমাকেও অবিশ্যি সে-ই বলেছে। এ বিষয়ে তোমার কী মত?

বিভাস বলল, এটা আমি আশা করতে পারিনে।

—কোন দিক দিয়ে? আমার মেয়ে বলে?

—না। পদ্মকে বিয়ে করার কথা আমি ঠিক ভাবিনি।

—কিন্তু তুমি জান, মেয়ের মা যখন ভাবছে, তখন তার মধ্যে বিশেষ একটা কিছু আছে। সে হয়তো কিছু বুঝেছে।

ইঙ্গিতটা পরিষ্কার। বিভাস বলল, উনি আমাকে খুব স্নেহ করেন।

—তাই কি জামাই করে রাখতে চান ?

হেসে উঠলেন তারকেশ্বর। —তোমার কিংবা পদ্মর কি কোনো ইচ্ছেই নেই ?

বিদ্যুতের কথা মনে পড়ল বিভাসের। পদ্মর কথা আরও বেশি করে মনে পড়ল।

তাছাড়া, তারকেশ্বরকে যতোই ভয় করা যাবে, ততই সব অন্ধকারে থেকে যাবে। পরিষ্কার করে বলাই ভালো। সে বলল, আমার ইচ্ছের কোনো দাম আছে বলে মনে করিনে। আপনাদের সকলের ইচ্ছেই সব।

তারকেশ্বর বললেন, আমি তো কিছুই জানতাম না। আজই শুনলাম জানলাম যে, বাড়ির সকলেরই ইচ্ছে আছে। এ বিষয়ে আমার কি ইচ্ছে হতে পারে, তুমি বলতে পার ?

বিভাসের আত্মসম্মানে লাগল এবার। ওঁর কথাটা বিভাসের মুখ থেকেই শুনতে চান। বিভাসকেই সাবধান করতে চান বোধহয়। সে বলল, আমি জানিনে।

তারকেশ্বর কিন্তু রেগে উঠলেন না। চুপ করে গেলাসে চুমুক দিলেন। বললেন, খাবে নাকি একটু ? জিনিষটা বিদেশের।

প্রথম আহ্বান। বিভাস বলল, কখনো খাইনি।

—প্রতিজ্ঞা আছে না-কি কিছু ?

—না, কোনো ইচ্ছেই হয় না।

—থাক তা হলে। আচ্ছা, জগদীশের ওখানে তোমার যাতায়াত আছে ? জগদীশ চক্রবর্তী।

বিভাস তাকাল চোখ তুলে। বলল, মাঝে মাঝে দেখা হয়।

—উঁ। কিন্তু সদরে তুমি যে যোগেশ ঘোষালের ওখানে যাও, এটা তো আমি জানতাম না।

তারকেশ্বর যেন ব্যাধের মতো আচমকা তীর ছুঁড়লেন। এবার বিভাসও যেন কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করল ভিতরে ভিতরে। ঘোষালের প্রতি একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ রয়েছে বিভাসের। এবং ঘোষালকে সে অনেক বড় মানুষ মনে করে। বলল, হ্যাঁ, কয়েকবার গেছি।

—আর নেদোর খালের ব্যাপারে তার ওপর আমি অবিচার করেছি কিংবা অন্যায়ভাবে তাকে গ্রামছাড়া করেছি, এ কথা তুমি ভাব ?

বিভাস চুপ করে রইল। তারকেশ্বর বললেন, সে কথা বলবার সাহস তোমার কেন হয়নি, বুঝলাম না। তবু তোমার মুখ থেকেই সরাসরি জানতে পারতাম। তাছাড়া পঞ্চায়েত ইলেক্‌শনে তলে তলে তুমি ঘোষালের দলকে সাহায্য করছ শুনলাম।

কথাগুলি নিছক মিথ্যে নয়। তাই বিভাস হঠাৎ মুখ খুলতে পারল না। সৎ এবং সত্যি কথাও অনেক সময় থিতিয়ে যায়। সে মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে,

তারকেশ্বরের বিদায় নেওয়া উচিত। কারণ তারকেশ্বর ক্ষমতালিপ্সু। লোভী, স্বৈরাচারী। দেশের ভালমন্দতে তাঁর কিছুই যায় আসে না এবং সে সব অনুভূতি আদপেই আছে কি না সন্দেহ।

তারকেশ্বর আবার বললেন, তুমি যে রীতিমত জনপ্রিয় লোক, এটা আমার জানা ছিল না। প্রায় সব জায়গাতেই তোমার কথা শুনতে পাচ্ছি ইদানিং। পয়ারপুর, নেদো, আঁচনা সব জায়গাতেই শুনেছি, 'ছেলেটি ভাল।' আমার থেকে বেশি জানল কী করে লোকে, তাইতেই অবাক হচ্ছি। তুমি কি আণ্ডার-গ্রাউণ্ড ওয়ার্ক করছ নাকি বিভাস?

বেশ একটা হাসির তারল্য তারকেশ্বরের গলায়।

বিভাস বলল, আণ্ডারগ্রাউণ্ড ওয়ার্ক কী করব বলুন। আমি যা করেছি, আপনি তো সবই জানেন। গ্রামে গ্রামে ঘুরে আমি কোনদিন কোনো কাজ করিনি, আপনার বিষয়ে বলেও বেড়াইনি। আমি নিজে জানিনে, কবে থেকে আমি জনপ্রিয় হলাম।

—আরে সেটা তো আরো গ্রেটম্যানের ব্যাপার হে! তুমি জান না, কিন্তু লোকে তোমাকে নিয়ে লাফালাফি করছে। সেটা তো খুবই ভাল কথা। কিন্তু কো-অপারেটিভ সম্পর্কে লোকজনকে তুমি একটু ভুল বুঝিয়েছ।

—আমি?

—হ্যাঁ। তুমি তাদের মেম্বার হতে বারণ করেছ।

বিভাস বলল, এটা সত্যি নয়। আমাকে যারা জিজ্ঞেস করেছে, তাদের আমি বিচার বুদ্ধি দিয়ে কাজ করতে বলেছি।

তারকেশ্বরের সঙ্গে চোখাচোখি হল বিভাসের। তারকেশ্বর বললেন, যাতে তারা না ঠকে।

বিভাস চুপ করে রইল। তারকেশ্বরও গেলাসে শেষ চুমুক দিয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে রইলেন। শুধু কুকুরগুলির গা-চাটা এবং চুলকানোর অস্পষ্ট শব্দ শোনা যেতে লাগল।

হঠাৎ তারকেশ্বর বললেন, চল তা হলে খেতে যাওয়া যাক।

বিভাস বলল, একবার ডিসপেন্সারিতে যাব ভাবছিলাম। কয়েকটি লোককে বসিয়ে রেখে এসেছি।

তারকেশ্বর বললেন, ও! আচ্ছা, যাও। সাইড্ হ্যামারটা তো তুমি ভালই চালাতে পার। কালকে যাবে তো বিলে?

—আপনি যদি বলেন।

—নিশ্চয়। আমি তো তোমাকে ছাড়া আজকাল যেতেই পারি না। আচ্ছা, তুমি ঘুরে এস।

বিভাস বেরিয়ে এল ঘর থেকে। কিন্তু অস্বস্তি শুধু নয়, তার নিঃশ্বাস

প্রশ্বাস পর্যন্ত অসহজ হয়ে উঠল। সারাটা পথ টর্চলাইটটা অনির্বান রেখেও তার পদক্ষেপ অসমান ভাবে পড়তে লাগল। কেন? সে কি ভয় পাচ্ছে? মনে হচ্ছে, দূরের সেই আবছায়া শক্ত এবং বিরাট লোহার মতো কিছু যেন ঘিরে আসছে তাকে চারদিক থেকে। একটা অদৃশ্য ফাঁদের মতো কঠিন ফাঁদ, নিশ্চিন্ত এবং স্থির লক্ষ্যে; অচিনপুরের অদৃশ্য থেকে বিভাসের প্রাণকে কেন্দ্র করে এগিয়ে আসছে। এই অচিনপুরেই সে মৃত্যুর হাত থেকে দ্বিতীয় জন্মলাভ করেছিল। সেই জন্মকালের দু বছর পূর্ণ হওয়ার মুখেই একটা অশুভ স্পন্দন যেন বাজছে কোথায়। এটা বোধহয় ভয়েরই একটা রূপ।

তারকেশ্বর যদি ক্রুদ্ধ হতেন, ক্ষেপে উঠতেন, তাহলে কোনো ভাবনা ছিলনা। কিন্তু উনি তা করেননি। একটা কৌতূকোচ্ছল হাসির তরলতায় ভাসছিলেন আর বিভাসকে নিয়ে খেলছিলেন। বিভাসের সম্পর্কে সব খবরই যে উনি রাখেন সেটাই শুধু জানিয়েছিলেন। ওঁর প্রতিক্রিয়ার কিছুই বোঝা যায়নি। শত্রু বলে ঘোষণা করেননি বিভাসকে অথচ বিভাস নিশ্চিন্ত হতে পারছে না।

ডিসপেন্সারিতে এসে দেখল, লোক কটি এখনো বসে আছে।

বিভাস এখন মোটাগুটি রুগী দেখতে শিখেছে। প্রেস্‌ক্রিপশনও করতে পারে। তারকেশ্বর তার ওপর নির্ভর করে ছেড়ে দিতেন বলেই দায়িত্ববোধে সে শিখেছে। মিথ্যে নয়, তারকেশ্বর তাকে শিখিয়েছেন এসব। তারকেশ্বর তাকে বিশ্বাস করতেন। এবং এত বিশ্বাস বোধহয় আজকাল আর কাউকে করতেন না। তাই তার প্রায় সবকিছুই বিভাসের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। তবু বিরোধ ধূঁইয়ে উঠল কেন? অথচ বিভাস বিশ্বস্ত থাকতে চেয়েছিল। মানুষের মনের কলকব্জায় একি বিচিত্র জটিলতা। এ যেন বিভাসের নিজেরই বিরোধ।

এ কি সেই ত্রয়ীকে নিয়ে বিরোধের মতো। যখন সে ভাবছে, পদ্ম তার ঘনিষ্ঠ, তাকে ভালবাসে। তার ওপর পদ্মর দাবী স্বাভাবিক এবং পদ্মর যৌবনের স্বভাব ও আবেগে সে ভেসে যায়। পদ্মর সহজ সম্পূর্ণের একটি আশ্চর্য শক্তি আছে, আর সে শক্তির কাছে বিভাসের দ্বিধা টেকে না। ঠিক তখনি, বিদ্যুতের দিকে তাকিয়ে একটা উলটো স্রোত বহে, মনে মনে তখন সে আর বিশ্বস্ততা রক্ষা করতে পারে না। মনে হয়, সংসারের প্রাত্যহিকতার উর্দ্ধে, কোনো এক দূর গভীরে গিয়ে যেন তারা দুজনে মুখোমুখি হয়। সেখানে দাবি নেই, কথা অর্থহীন। শুধু দুজনের চোখের দরজার পারাপার করে, চেতনার এক আশ্চর্য জগতে দুজনে মৌন স্থির। আনন্দ সেখানে আছে কিনা জানা যায় না। ব্যথা কতখানি মাপা যায় না। কিন্তু একটা চাপা আবেগ কোথায় যেন থর থর করে। মানুষের নিজের মধ্যে এ কি আশ্চর্য দ্বন্দ্বের খেলা।

মনোযোগ দিয়ে রুগীদের দেখতে পারল না বিভাস। কোনরকমে প্রাথমিক পাট সেরে, ওষুধ দিল। রাসুর ঘরে লোক নেই। সে একলাই রয়েছে। বিভাস ওষুধের আলমারিতে তালা বন্ধ করেছে দেখে রাসু বলল, চলে যাবেন নাকি

এখন ?

বিভাস জানে রাসু তাকে অনেকক্ষণ থেকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছে। সে বলল, হ্যাঁ।

—কর্তার তাহলে সত্যি খুব অসুখ নাকি ?

—না।

বলেই আবার তাড়াতাড়ি বলল, হ্যাঁ, একটু ইয়েই হয়ে আছেন।

রাসু দোআঁসলা গলায় বলল, তবে শুনলাম কাল রাত পোহালেই কালি-কেউটের বিলে শিকারে যাওয়া হচ্ছে ?

বিভাস জবাব দিল না। রাসু চুপ করে বিভাসকে কয়েক মুহূর্ত দেখে আবার, খুব চিন্তায় পড়েছেন মনে হচ্ছে।

বিভাস বুঝতে পারছিল, রাসু আজকের ব্যাপারটা আন্দাজ করেছে। অনেকদিন আগে থাকতেই এই দিনটাকে সে আসন্ন বলে আন্দাজ করেছে।

সে বলে উঠল, তা হতে পারে। আমি তো আপনাকে বলেছি, আমি ফেরেব্বাজ হতে চাইনি।

রাসু একই রকম গলায় বলল, রাগ করছেন কেন ?

রুগীদের কাছে পাওয়া টাকা পকেটে নিল বিভাস। কোনো জবাব দিল না। বেরিয়ে পড়বার আগে সে আর একবার চারদিকে দেখে নিল। যদিও রাত্রে রাসুই থাকবে এ ঘরে। তবু ডিসপেন্সারির যাবতীয় জিনিষ সাবধানে তুলে রাখবার নির্দেশ কখনো সে অমান্য করেনি।

রাসু আবার বলে উঠল, শুনেছি কুকুরেরা অসুখের গন্ধ পায়। আমি যেন কি রকম একটা খারাপ খারাপ গন্ধ পাচ্ছি। মাইরি!

বিভাস বলল, ভয় দেখাচ্ছেন ?

রাসু তার ভাবলেশহীন চোখ দুটি তুলে ধরল বিভাসের ওপর। হ্যারি-কেনের আলোয় রাসুর কপাল নাক আর গর্তে ঢোকানো চোখ অদ্ভুত দেখাচ্ছে। তার গলা অবধি বিভাসের গায়ের ছায়া পড়েছে। সে তার মোটা গম্ভীর গলায় বলল, আপনাকে আমি মিছে বলব না কম্পাউণ্ডারবাবু। তবে আপনি গোঁদো পিঁপড়ে না লাল পিঁপড়ে, আমি বুঝতে পারছি না।

বিভাস রাসুর গায়ের অন্ধকার ছেড়ে সরে দাঁড়াল। বলল, বুঝতে পারলাম না।

রাসু বলল, গোঁদো পিঁপড়ে দেখেছেন তো ? কালো কালো পিঁপড়ে। কামড়ায় না। আর লাল পিঁপড়ে কামড়ায়। কিন্তু লাল পিঁপড়েদের ঝাঁকে যদি গোঁদোরা এসে যায় তবে লালগুলোন পালিয়ে যায়।

লোকটাকে সাংঘাতিক শয়তান বলে মনে হয়। তবু রাগ করতে পারা যায় না। রাসুর কথার অন্তর্নিহিত অর্থ বুঝেও বিভাস কিছু বলল না। সে বেরিয়ে যেতে গেল।

রাসু বলে উঠল, দেখুন কম্পাউণ্ডারবাবু, এখানে আপনি একদিন ভেসে-ভেসে এসেছিলেন, কেমন না? তাই বলছি, যদি ভয় পেয়ে থাকেন, তা'লে আবার ভেসে চলে যান। আজই, এই রাত্রেই। আর মিনিট সাতেক বাদেই গাড়ি আসবে। একদিন যেমন এসেছিলেন, তেমনি চলে যান।

বিভাস বারান্দার ওপরে দাঁড়িয়ে পড়ল। বলল, ভয় পাব কেন? আমি কি কোনো অন্যায় করেছি?

রাসু বলল, আমাকে সে কথা জিজ্ঞেস করবেন না। নিজেকে করুন। আর ন্যায় অন্যায়ে কী যায় আসে?

—কিছুই যায় আসে না? আমি শুধু শুধু কুকুরের মতো পালিয়ে যাব? তা আমি পারব না।

—তা হলে থাকুন। থাকতে পারলে তো ভালই। লোকে তো তাই চায়। থাকতে পারলে আপনাকে লোকেরা ভাল বলবে। চলে গেলে খারাপ বলবে। আমি বলছিলাম, যদি ভয় পেয়ে থাকেন—

—আমি ভয় পাইনি রাসুবাবু।

বিভাস নেমে এল। বাজারের সন্ধ্যাকালীন অল্প কলরব এখন নীরব হয়ে গেছে। অন্ধকারে দু' একটা বলদহীন গোরুর গাড়ি ঘাড় গুঁজে পড়ে আছে এদিকে। ওদিকে দূরে একটা শব্দ হচ্ছে ট্রেনের। শেষ গাড়িটা আসছে। এ ব্রাঞ্চ লাইনে, শেষ ডাউনটা প্রায় ফাঁকাই যায়।

বিভাস এগিয়ে এল। গাড়িটা এসে পড়ল। দাঁড়িয়ে পড়ল বিভাস। স্টেশনে একটি লোক নেই। সত্যি চলে গেলে কেউ ডেকেও জিজ্ঞাসা করবে না। আর কি বা সম্পর্ক এই আচনার সঙ্গে? এ দেশের ভাল মন্দে বিভাসের কি যায় আসে? মাঝখান থেকে নিজের ভিতরে বিরোধ ওকে কেবলি এক অনির্দিষ্ট অজানিত সংশয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে চলেছে।

ঘণ্টা বাজল। গার্ড হুইসল দিল। বিভাস ভাবল, কিন্তু না, চলে যাবার কথা আজ আর ভাবা যায় না।

গাড়িটা চলে গেল। নিঝুমতা আরো গভীর হল। সত্যি কি ভয় পাবার কিছু আছে? এত ভয় নিয়ে কি বাঁচা যায়! কিসের ভয়? মানুষের কিসের ভয় সব থেকে প্রবল? মৃত্যু তো! নিজের ছায়াকে কেউ এড়িয়ে চলতে পারে নাকি? ওটাই তো নিশ্চিত এবং অমোঘ। একেবারে অপ্রতিরোধ্য। জন্মদিন থেকে সঙ্গে আছে। কর-কুষ্ঠির সকল ভবিষ্যৎবাণীর মধ্যে একটি তো নিশ্চয় বলা যায়। মৃত্যু অবধারিত। আজ অথবা দুদিন বাদে। রোগে অথবা অপঘাতে। তাকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও পালানো যায় না। তবে কিসের ভয়?

আজ আর সেই পথে পথে ঘুরে নির্জীবের মতো মরা সম্ভব নয়।

একেবারে বাগানের ঘরে সে এল। ঘরের শিকল খোলবার আগেই দেখল, তার

পিছনে পিছনে আর একটি মূর্তি এগিয়ে এল। অন্ধকারেও চিনতে অসুবিধে হল না বিভাসের। বিদ্যুৎ এসেছে, আর বিদ্যুৎকে দেখতে গিয়েই, চোখে পড়ল বার-বাড়িতে আলো জ্বলছে এখনো।তারকেশ্বর রয়েছেন তাহলে ওখানে!

বিদ্যুৎ বারান্দায় উঠে, বিভাসের কাছে এসে পড়ল। একটি অস্পষ্ট অবয়ব। কিন্তু একটি প্রত্যক্ষ গন্ধ আছে। চুপি চুপি দ্রুত বলল, শুনুন। আমি দাঁড়াব না, চলে যাব এখুনি।

বিভাস মুখোমুখি হল বিদ্যুতের। অন্ধকার হলেও, কল্পনায় সে স্পষ্ট দেখতে পেল বিদ্যুতের চকিত ত্রস্ত চাউনি। ঘোমটা নেই, সারা দেহে একটি অস্থিরতা থমকানো। বিদ্যুৎ বলল, শ্বশুরমশাই কি খুব রেগে আছেন?

বিভাস বলল, বুঝতে পারিনি।

বিদ্যুৎ বলল, আমি জানি রেগে আছেন। কিন্তু আপনাকে যদি অপমান করেন।

—হয়তো তাই আমার কপালে আছে। কিন্তু আর মেনে নিতে পারব না।

—কোনরকম বিপদ আপদ এলে যেন বোকা হয়ে যাবেন না। আপনার তো আবার সে গুণে ঘাট নেই।

বোকা হব কেন?

—হন তো দেখি। হলে জানবেন খুব ভুল হবে।

বিদ্যুতের গলা সহসা উত্তেজিত দৃঢ় শোনাল। বলল, উনি যাই করুন আর যাই বলুন, আপনি আপনার মতো থাকবেন। একটা কিছু মতলব নিশ্চয় করছেন উনি মনে মনে। যাই করুন, আপনি টলবেন না। আমি চললাম।

বিদ্যুৎ যেতে উদ্যত হল। বিভাস ডাকল, শুনুন।

—বলুন। তাড়াতাড়ি বলুন। আমাকে গিয়ে এখুনি আপনাদের খাবার বাড়তে হবে। উনি আপনার জন্যেই বসে আছেন আজ। তাছাড়া ঠাকুরঝি আসবে আপনার কাছে।

বিভাস চুপ করে রইল। বিদ্যুৎও। অন্ধকারেও দুজনে যেন দুজনার চোখ দেখতে পেল। বিভাসের হাত দুটির ভিতরে শিরে যেন কাঁপছে, অথচ অবশ মনে হচ্ছে। বিদ্যুৎ বলল, যাচ্ছি।

অন্ধকারে মিলিয়ে গেল সে। বিভাস দাঁড়িয়ে রইল চুপ করে। তারপর ঘরের শিকল আর না খুলে, একেবারে বারবাড়িতে এসে উপস্থিত হল। দেখল, এর মধ্যেই উঠোনে দুটি গোরুর গাড়ি এসে পড়েছে। বলদ চারটে এক কোণে বাঁধা। জনা-তিনেক আদিবাসী গাড়ির তলায় আশ্রয় নিয়েছে। আগামী-কালের যাত্রার আয়োজন সবই প্রস্তুত।

ঘরে ঢুকল বিভাস। দেখল, তারকেশ্বর ইতিমধ্যে পয়েণ্ট টু রাইফেলটার পার্টস জুড়ে, বুকের ওপর চেপে ধরে ন্যাকড়া দিয়ে ঘষছেন। বিভাসকে দেখে বললেন, এসে গেছ? চল খেতে যাওয়া যাক। তোমার জন্যেই বসে আছি।

বনো, খাবার দে।

ইতিমধ্যে নতুন করে মদ ঢালা হয়ে গিয়েছে গেলাসে। কবার ঢালা হয়েছে, কে জানে। কিন্তু তারকেশ্বর স্থির, একটু টলছেন না। উঠে দাঁড়ালেন। কুকুরগুলি সঙ্গে সঙ্গে উঠল। তারকেশ্বর হেসে বললেন, এখনও সময় হয়নি রে। ঘুমো, ঘুমো, ঘুমিয়েনে।

বিভাসের দিকে ফিরে বললেন, আমরা ভোরবেলাই বেরুব।

॥ চৌদ্দ ॥

ঘুমিয়ে পড়েছিল বিভাস। দরজায় টোকা পড়ল। ঘুম ভেঙে উৎকর্ণ হল সে। বনো ডাকছে নিশ্চয়। ভোর হয়ে এল বোধহয়। বিভাস তবু চুপ করে রইল। কারুর গলার স্বর শোনা যাচ্ছে না। আবার টক্ টক্ শব্দ হল। বিভাস উঠে দরজার কাছে এল। জিজ্ঞেস করল, কে?

খুব একটা চাপা শব্দ পাওয়া গেল, খুলুন।

বিভাস দরজা খুলল। প্রায় ঝড়ের বেগে পদ্ম ঢুকে দরজা বন্ধ করল আগে। তারপরে একেবারে বিভাসের বুকে এসে আশ্রয় নিল। চুপি চুপি প্রায় উৎকণ্ঠিত কান্নায় ভেঙে পড়ল পদ্ম। বলল, তুমি বাবার সঙ্গে যেতে পারবে না।

বিভাস এক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয়ে রইল। বলল, কেন পদ্ম?

দু'হাতে আরো কঠিন করে আঁকড়ে ধরে বলল পদ্ম, না তুমি যেতে পারবে না। বাবা যেন কেমন হয়ে গেছে, আমার মনটা একটুও ভাল লাগছে না, তুমি যেতে পারবে না।

পদ্ম এই প্রথম বিভাসকে তুমি বলছে। কিন্তু মনে হচ্ছে যেন বরাবরই বলে এসেছে। এত সহজ শোনাচ্ছে। আর এই একটা অশুভ রাত্রি, নানান ভয় ও সংশয়ে যেন কণ্টকিত। তবু এই দেহলগ্ন পদ্ম যেন একটু ভীরু পাখীর মতো এসে তার অনুভূতি উষ্ণতা আনন্দ ও করুণাকে জাগিয়ে তুলল। পদ্মর মাথায় হাত রেখে বলল সে, আমি যে তোমার বাবাকে বলেছি যাব বলে।

বিভাসের বুকের ওপরেই বারে বারে মাথাটা ঘষতে লাগল পদ্ম। —না, না, তুমি যেতে পারবে না। কাল দুপুরে আমার বিয়ের কথা মা বলার পর থেকেই বাবা কী রকম করছে। মা পর্যন্ত ভয়ে কীরকম সিটিয়ে রয়েছে, আমি সারা রাত ঘুমোতে পারিনি এখানে আসব বলে। তুমি যা হোক একটা কিছু বলে যাওয়া বন্ধ রাখ। কালি-কেউটেতে তুমি যেতে পারবে না।

বিভাস পদ্মকে নিয়ে এসে বসল। চিবুক তুলে ধরে বলল, কেন এ কথা বলছ? উনি কি আমাকে মেরে ফেলবেন?

পদ্ম বলল, তাও হয়তো পারে!

বিভাসের বুকের ভিতরে চিকুর হানার মতো চমকে উঠল একবার। তার-

পরে বলল, এত সহজ নয় পদ্ম। তাছাড়া, তুমি বুঝতে পারছ না, একবার যদি উনি ভেবে বসেন, আমি ভয় পেয়েছি, তাহলে আমার সঙ্গে কুকুরের মতো ব্যবহার করবেন। সে সুযোগ আমি দিতে চাইনে। আমি যাব।

—না না, ওগো না। তোমার পায়ে পড়ি, তুমি যেওনা।

পদ্মর মতো সাবলীল শক্ত মেয়ে ভয়ে যেন কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেল। বলল, তুমি বলগে, রুগীদের তুমি দেখবে। বাবা একলা যাক।

বিভাস এবার হেসে ফেলল। পদ্মকে তুলে বসিয়ে দু'হাতে মুখখানি ধরে বলল, তোমার বাবাকে দেখছি তুমি একটুও চেনো না। এখন যদি আমি না যেতে চাই, তা হলেই ওঁর কাছে আমাকে নতিস্বীকার করতে হবে। আর এ নতিস্বীকারের মানে তুমি বোঝ পদ্ম ?

কান্নায় পদ্মর গলার স্বর বুজে গেল। সে মাথা নাড়ল।

পদ্মকে বুকের আরো কাছে টেনে নিল বিভাস। বলল, শোন পদ্ম, এ রকম কেঁদো না। একটু চুপ কর।

পদ্ম শান্ত হবার চেষ্টা করল। বিভাস বলল, শোন. আমি নতিস্বীকার করলে যদি উনি আমার উপর তুষ্ট হতেন, আমি করতাম। কিন্তু উনি তা হবেন না। তারপরেও আমাকে এই আঁচনায় থাকতে হলে, ওঁর পায়ের তলায় পড়ে থাকতে হবে। নইলে যেমন ভাসতে ভাসতে এসেছিলাম, তেমনি চলে যেতে হবে। তুমি তো জান, উনি যদি আমাকে শত্রু ভেবে থাকেন, তাহলে আমি এমনিতেও গেছি, অমনিতেও গেছি। তার চেয়ে ওঁর মুখোমুখী দাঁড়ানোই ভাল!

—তুমি পারবে না।

—পারব।

—কেউ পারেনি। তোমাকে বাবা দেশ ছাড়া করে ছাড়বে। নয়তো আর কিছু করবে।

—তবেই বল, এ মানুষের কাছে নত হয়ে আমার কী লাভ ?

—তুমি আগের মতো হয়ে যাও। বাবা তোমাকে যে চোখে আগে দেখত, তুমি সে রকম হও আবার।

—সেটা বোধহয় আর সম্ভব নয়। আর হলে সেটা ওঁর ওপরেই নির্ভর করছে।

পদ্ম হঠাৎ আঁচল তুলে চোখ মুছল। ভাল ভাবে বসে বলল, খালি তো আমার বিষয় নয়। আরো অনেক ব্যাপারে নাকি বাবার সঙ্গে তোমার গোলমাল লেগেছে, সে সব তুমি কেন করতে গেছ ?

বিভাস বলল, ইচ্ছে করে কিছুই করিনি। পদ্ম. আমি তো মানুষ। এক-জনের অন্যায়ের বোঝা আর কত দিন আমি বইব ?

—তবে আমার কি হবে ?

বলতে বলতে পদ্ম ফুঁপিয়ে উঠল আবার, আমি কী করব এখন ?

এত অসহায় কোনদিন মনে হয়নি পদ্মকে। বিভাস তাকে আবার কাছে টেনে নিয়ে বলল, এত ভয় পেয়ো না পদ্ম।

পদ্মর কান্না বাধা মানল না। বিভাসের নিজেকেও অসহায় মনে হল। আর পদ্মর কান্না ক্রমেই তার বুকে একটা কষ্টের সৃষ্টি করতে লাগল। কারণ, এই পদ্মর মধ্যে কোথাও ফাঁকি নেই। এ হল সেই নিষ্কলুষ মেয়ে, যে এখুনি বিভাসের স্বার্থে এক কথায় ঘর ছেড়ে যেতে পারে। যে-কোনো বিপদের ঝুঁকি নিতে পারে। মরতেও পারে! আবার বিভাসের সঙ্গে পাঁচ বছর সংসার করবার পর আবিষ্কার করতে পারে ও কোনদিনই ভালবাসেনি বিভাসকে। ও হল এমনি এক সাধারণ সত্যের নিষ্ঠায় মহৎ। সংসারে যেটা সচরাচর ঘটে।

বিভাস ওকে আরো নিবিড় করে নিল কাছে। আর এ সময়েই বুনো ডাকল, কম্পাউন্ডরবাবু, অ কম্পাউন্ডরবাবু। জাগেন নাকি? এবার উঠতে হয়, বেরুবার সময় হল।

বিভাস জবাব দিল ভিতর থেকে, তুমি যাও, আমি যাচ্ছি।

বুনো চলে যেতে যেতে বলল, সব পস্তুত কিন্তুন। আপনি এলেই হয়।

ওরা দুজনেই একটু সময় চুপ করে বসে রইল। তারপর বিভাস যেন সুপ্তোত্থিতের মতো হঠাৎ পদ্মকে চুম্বন করতে লাগল। আর বারে বারে বলতে লাগল, আমি তোমাকে ভালবাসি পদ্ম। তুমি বিশ্বাস কর, আমি তোমাকে ভালবাসি।

পদ্ম তাতে উচ্ছসিত হয়ে উঠল না। অসংবৃত হল না। এবং শান্ত ভাবে বলল, জানি।

স্থির অবিচলিত চিরবিশ্বাসের মতো বলল পদ্ম। বিভাসের সেই মুহূর্তে আবার বিপরীত বলে উঠতে ইচ্ছে করল, না না পদ্ম, মিথ্যে কথা, ভালবাসিনে।

পদ্ম বলল, বাতি জেলে দিই, দাও।

—থাক আমি জ্বালছি।

—না, আমি জ্বালছি।

দেশলাই দিয়ে বাতি জ্বালল পদ্ম। বলল, কী পরবে জামাকাপড় পরে নাও।

—কেউ এসে পড়বে পদ্ম।

—কেউ আসবে না। তুমি বেরিয়ে যাবার পর আমি বেরুব।

বিভাস জামা-কাপড় পরে তৈরি হল। টর্চ লাইটটা হাতে নিল। পদ্ম আলো নিভিয়ে দিল আবার। বিভাসের কাছে দাঁড়াল।

কালিকেউটের বিলের জঙ্গল এখনো ভেজা। কোথাও কোথাও সামান্য জল আছে। কোথাও কোথাও পাঁক। কালীপুর গ্রামের শেষ প্রান্তে, লোকালয়ের বাইরে আস্তানা পাতা হল। মস্তবড় ঝুরি নামা বটের তলায় বুনো রান্নাবান্নার আয়োজনে রইল। আর সকলেই বেরিয়ে পড়ল। আদিবাসী তিনজন টাঙি

নিয়েছে। কুকুরগুলি আছে সঙ্গে। ওরা নিমেষে অদৃশ্য হল জঙ্গলের মধ্যে। বিভাসের হাতে ইটালিয়ান সাইড্‌হ্যামার। তাছাড়া আরো দুটি বন্দুক এনেছেন তারকেশ্বর, একটি দোনলা আর একটি পয়েণ্ট টু রাইফেল।

আকাশ একেবারে নির্মেঘ। পাখীদের ডাকাডাকিতে চারিদিক মুখর। পলিমাটির পোকা আর অল্প জলে ছোট ছোট মাছ। মহাভোজের আসর। পশু এবং পাখীদের এক অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ডার এখন কালীপুরের এই বিলাঞ্চল। একটা সীমা পর্যন্ত ধান ক্ষেত প্রসারিত। তারপরে থেমে গেছে। কালচে সবুজ জলো ঘাস মানুষের কোমর অবধি যেন লক্‌লক্‌ করছে। বিলের জল নেমে গেছে অনেক দূরে।

কাদাখোঁচারা উড়ছে। দলবদ্ধ বটে তবে জোড়ায় জোড়ায় ঘুরতেই ভালবাসে। দলবদ্ধ হয়ে এক সঙ্গে শত শত উড়ছে বাগেড়িরা। ছোট ছোট চড়াইয়ের মত দেখতে বলে, অনেকে বন-চড়াই বলে। এখানে-ওখানে হিজল গাছ। কয়েকটা বেশ বয়স্ক গাছ। আর আছে পিটুলী গাছ। দূর থেকে গাছ-গুলিকে ঝাড়ালো আর বেঁটে মনে হয়। বর্ষাকালে যখন চারদিকে জল থৈ থৈ করে, তখন সাপেরা আশ্রয় নেয় এইসব গাছে।

এবার নিয়ে বারচারেক হল বোধহয় বিভাসের বিলে আসা। কিংবা বার-পাঁচেক। এখন বিলের জল বহু দূরে সরে গেছে। নেমে গেছে। তারপর একে-বারেই শুকিয়ে যাবে। নেদোর খালের একটা মুখ উত্তরদিক থেকে এসে বিলেই পড়েছে। যদি পূর্বাঞ্চলে মুক্তি পেত, তবে নেদোর খাল দিয়ে বিলেও বারোমাস জল থাকত। জল থাকলে, মাছ থাকত। কিন্তু নেদোর খাল—।

বিভাস তারকেশ্বরের দিকে তাকিয়ে দেখল। বন্দুকটা কাঁধের ওপর দু' হাতে ধরে চলেছেন। বেশ বোঝা যায়, চোখে ঘুমের জড়িমা। প্রায় উদ্দেশ্যহীন ভাবেই চলেছেন এখন। শিকারের তীক্ষ্ণ দীপ্তি নেই। তেমন উদ্দীপনাও নেই। কিন্তু মুখটা ফুলে আছে। চোখ যদিও আধবোজা, সমস্ত শরীরে ও মুখের ভাবলেশহীনতায় একটা থমথমানি।

একটা হিজল গাছের গোড়ায় দাঁড়ালেন তারকেশ্বর। কালকের মতো আজ আর তরল নন। হাসছেন না। বিভাসকে তাকিয়ে দেখছেনও না। মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি বেরিয়ে পড়েছে। আপন মনেই বললেন, এখন পাখী মারব না। খরা মেরেও লাভ নেই। মিছিমিছি শব্দাশব্দি করে, এখন থেকেই সাবধান করে দিয়ে লাভ নেই।

বিভাস শুনল। কিন্তু কিছু বলার নেই।

গাছে হেলান দিয়ে হঠাৎ বললেন, জনককে তুমি তোমার জমি থেকে উচ্ছেদ করতে চাও না, না?

বিভাস প্রায় চমকেই গেছল। বলল, গরীব কিষাণ···।

হুঁ। আমন ধান ওকেই দিয়ে দেবে বলেছ?

বিভাসের আবার অস্বস্তি আরম্ভ হল। তারকেশ্বর দূর জঙ্গলের দিকেই তাকিয়ে আছেন আধবোজা চোখে। বিভাস বলল, আমি ওকে আমার ঋণ শোধ করে দিতে বলেছি।

একটু চুপচাপ। বললেন, তুমি জান বোধহয় জনক গুণ্ডা প্রকৃতির লোক। ভয়ংকর দাঙ্গাবাজ।

বিভাস জানে, কৃষকদের ওপরে যারা জুলুম করে, জনককে তারা ভয় করে। নির্বিবাদে সব কিছু মেনে নেবার পাত্র সে নয়। সত্যকে সে অবিকৃত রূপেই বলে। যারা সহ্য করতে পারে না, যাদের গায়ে লাগে কিংবা যারা অপমান করে, তাদের প্রতি বশংবদ সে হয় না। এ পরিচয় অনেকবারই পাওয়া গেছে।

বিভাস বলল, হ্যাঁ, একটু রগচটা লোক।

তারকেশ্বর একইভাবে বললেন, তুমি বোধহয় জান না, সে আমাকে যা খুশি তাই বলে। আর আমার লোকের গায়ে হাত তোলে।

জানে বিভাস। কিন্তু সে উল্টো গাইল। বলল, কিন্তু আপনাকে মান্যও করে। এক কথায় বাস্তু জমির বিক্রী-কবালা লিখে দিল।

তারকেশ্বর হাসলেন।—শালুক চিনেছে গোপাল ঠাকুর! রাতারাতি জেলে যাবার ভয় থাকলে, সকলেই ওরকম মান্য করে। নইলে জনক আমাকে কাঁচাকলা দেখিয়ে দিত।

তারকেশ্বরকেও কাঁচকলা দেখাতে পারে, এটা একটা মস্ত কথা। কিন্তু রাতারাতি জেলে পাঠাবার ব্যবস্থা তারকেশ্বরের দলেরাই করেছিল। জনককে দেশ ছাড়া করতে চেয়েছিল তারা। এবং সেটা আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনের আগেই। কারণ, জনকের আরও কতকগুলি দোষ আছে। এ অঞ্চলে যে দু'একবার কৃষক জমায়েত হয়েছে, সেটা জনকের জন্যেই। মহাজন আর ছদ্মবেশী জমিদারদের বিরুদ্ধে কয়েকবার যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে জনকের নেতৃত্বেই। আর একজন উপদেষ্টা নেতা অবশ্য আছেন। সেই দিবানাথ চৌধুরি। মোটা লেন্সের চশমা চোখে রোগা রোগা গড়ন কিন্তু শক্ত মানুষটি। কথা এমনিতে কমই বলে।

অতএব জনকের অপরাধ অনেক। তারকেশ্বর আধশোয়ার মতো বসে পড়লেন গাছতলার উঁচু শক্ত মাটিতে। বললেন, আমি জনককে থাকতে দিতে চাইনে এখানে। এ তল্লাটে।

হঠাৎ কুকুরের ডাক শোনা গেল। একবার ডেকেই থেমে গেল। বিভাস বলে উঠল, গ্রাম থেকে ওকে তাড়িয়ে দেবার অধিকার কি কারুর আছে।

তারকেশ্বর ফিরে তাকালেন এবার বিভাসের দিকে। তীক্ষ্ণ শ্লেষপূর্ণ হাসির ঝিলিক হেনে বললেন, তুমি ওকে গাঁয়ে রাখতে চাইলেও তাড়াবার উপায় আছে।

ঠিক সেই মুহূর্তেই একটা গরগর শব্দ শোনা গেল। একটা দূরের রেখা ধরে জঙ্গল কেঁপে উঠল। তীর বেগে একটা কুকুর এসে উপস্থিত হল তারকে-

রের পায়ের কাছে। কুকুরটার মুখে একটি ধবধবে সাদা খরগোস। ঈষৎ রক্তের দাগ লেগেছে। কিন্তু খরগোসটা মরেনি। তারকেশ্বর কুকুরের মুখ থেকে আহত জীবটিকে নিজের হাতে নিলেন। খরগোসটা সঙ্গে সঙ্গে মুক্তির জন্যে ছটফটিয়ে উঠল। তারকেশ্বর সেটাকে চেপে ধরে, কুকুরটার ঘাড়ে পিঠে হাত বুলিয়ে দিলেন। খরগোসটার কাঁধের কাছে চামড়া একটু ছিঁড়ে গেছে। খুব সাবধানে এনেছে কুকুরটা। অথচ এই কুকুরগুলি সারাদিন পড়ে পড়ে ঘুমোয় বাড়িতে। তখন দেখে বোঝা যায় না, জানোয়ারগুলি রীতিমতো শিক্ষিত শিকারী।

তারকেশ্বর ছুঁড়ে ফেললেন খরগোসটাকে। মুহূর্তে কুকুরটা ঝাঁপিয়ে পড়ল জঙ্গলের মধ্যে আর গরগরানির সঙ্গে মট্‌মট্‌ শব্দ শোনা গেল। বিভাস বুঝল, খরগোসটার পাঁজরায় দাঁত বসল। আদর করে কুকুরটাকে খেতে দিলেন তারকেশ্বর। পুরস্কার।

প্রায় ঘনায়মান সন্ধ্যায় তারকেশ্বরের ঘুম ভাঙল। দুপুরে খেয়ে উনি খড় বিছানো গোরুর গাড়ির মধ্যে শুয়েছিলেন। সামনের দিকে ঠেকো দিয়ে গাড়ি দাঁড় করানো ছিল। বিভাসকেও সেই ভাবেই আর একটা গাড়িতে বিশ্রাম নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু বিভাস শুতে পারেনি। সে ঘুরে ঘুরে বেড়িয়েছে। বন্দুকটা অবশ্য কাঁধে রেখেছিল। বুনো বলেছিল, 'বেশি দূর যাবেন না কমপণ্ডরবাবু। তেষ্টা পেলে জল খেতে পাবেন না এ বিল জঙ্গলে।'

তখন আর একজন আদিবাসী বলে উঠেছিল, 'হুঁ, ইখ্যানে জল তিষ্টায় মানুষ মারা যায়, আর উয়ারা জলের লেগে কেন্দে কেন্দে জঙ্গলে ঘোরে।'

আর একজন বলেছিল, 'আর মানুষকে ডেক্যা ডেক্যা লিয়ে যায়, হুই দূরে। মানুষ আর ফিরে না।'

জেল নয়, পাঁচিল নেই। তবু যেন চারদিকে পাষান, ভয়ের প্রাচীর দিয়ে ঘেরা। মানুষ নিজেই এগুলি তৈরি করেছে, বিশ্বাস করেছে এবং প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় মরেছে।

বন্দুক হাতে থাকলে একটা শিকারের প্রবৃত্তি আসে। বিভাস উড়ন্ত পাখী মেরেছে। একবার একটা গর্ভবতী শুকরীকে পাশ থেকে গুলি করে মেরেছিল। আফশোস্‌ হয়েছিল বিভাসের। আজও সারা দুপুর বিকেলে বহু পাখী তার চোখের সামনে উড়ল। ডাকাডাকি করল। কিন্তু সে বন্দুক তুলল না। শুধু রাতের রান্নার জন্যে আদিবাসীরা ফাঁদ পেতে অনেকগুলি বাগেড়ি ধরেছে। কচি ছোট ছোট পাখীগুলি, আস্ত একটাই এক টুকরো মাংস। কেবল গরম্‌ জল থেকে তুলে, ছাল ছাড়িয়ে ভেজে নিলেই হল।

শেষ বিকেলে বুনোর ডাকে যখন বটতলার আস্তানায় ফিরল বিভাস, তারকেশ্বর তখন বোতলের ছিপি খুলে গলায় ঢালছেন। ওঁর গাল যেন রক্তে ফেটে পড়ছে। আর চোখ দুটি ভীষণ দপ্‌দপ্‌ করছে! মুখখানি বড় আর

আগুনের মতো ঝক্‌ঝক্‌ করছে।

দেখতে দেখতে সন্ধ্যা নামল। ঘুমন্ত কুকুরগুলি চকিত হয়ে উঠল। বুনোকে রেখে বেরিয়ে পড়ল সবাই। আদিবাসী তিনজন টাঙি নিয়ে কুকুরদের সঙ্গে অদৃশ্য হল। হাতে টর্চলাইট। তারকেশ্বরের কাছেও একটা আছে।

জঙ্গলে আবৃত-গুঁড়ি একটা প্রকাণ্ড হিজলের তলায় বিভাসের জায়গা নির্দেশ করলেন তারকেশ্বর। উনি নিজে চলে গেলেন অন্যদিকে। তারপরে সমস্ত বিলাঞ্চল যেন ঘুমিয়ে পড়ল। ঝিঁ ঝিঁ'র ডাকের সঙ্গে এখনো দু'একটা অতিপ্রেমিক বাদুরের ডাক শোনা যাচ্ছে এই হেমন্তে। তারপরে শুধু প্রতীক্ষা। বিভাস বন্দুক নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

একে একে তারা ফুটল আকাশে। অন্ধকার গাঢ় হল। মাঝে মাঝে শিস্‌ শোনা গেল। আর কুকুরের চাপা গর্জন।

রাত প্রায় একটার সময় তারকেশ্বরের টর্চ জ্বলে উঠল। সবাইকে ফিরে আসবার নির্দেশ করছেন উনি। আজ আর আশা নেই।

তারপর দিন সারা বেলা ও রাত বৃথা চলে গেল। তারকেশ্বর একেবারে চুপচাপ। কেউ তার সঙ্গে কথা বলতে সাহস করছে না। এমন কি, তারকে-শ্বরের ব্যর্থ হতাশ ক্রুদ্ধ ভয়ংকর মুখ দেখে, কুকুরগুলিও যেন দূরে দূরে ফিরছে। কিন্তু ফিরে যাবার নির্দেশ দিচ্ছেন না। কী চান উনি?

চোখের সামনে দিয়ে দুটি নধর শুয়োর গেছে। ছেড়ে দেবার ইঙ্গিত করেছেন তারকেশ্বর। একজন আদিবাসী বিভাসকে বলল, কর্তা দাঁতাল চান।

তৃতীয় দিন প্রায় ভোররাত্রে জঙ্গলের পূর্ব দিকে চললেন তারকেশ্বর। যখন থামলেন, তখন আকাশ ফর্সা হয়ে গেছে। যে দিকটায় এলেন সেদিকে জংলী ঝোপের ভিড়। আদিবাসীদের নির্দেশ দিলেন। আর ওরা আজ প্রথম থেকেই দাপিয়ে চিৎকার করে কুকুরগুলিকে নিয়ে ছুটতে লাগল। এখানে কোনো বড় গাছ নেই। বিভাসের কাছ থেকে হাত পঞ্চাশ দূরে দূরে তারকেশ্বর স্থির নিশ্চল।

বিভাসের কেমন যেন অস্বস্তি হতে লাগল। কোমর ডোবা ঝোপের মধ্যে যেন কেমন বেআব্রু আর অসহায় মনে হতে লাগল। গাছের গুঁড়িতে একটা নিরাপত্তা পাওয়া যায়। প্রকাশ্য দিনের বেলায় কোনো ভয়ই নেই। তবু ভিতরে কেমন একটা অস্বস্তি হচ্ছে।

আদিবাসীরা চিৎকার করছে। কিন্তু তাদের দেখতে পাচ্ছে না বিভাস। তারপরে হঠাৎ দেখল, তারকেশ্বরও অদৃশ্য। কোথায় গেলেন? সূর্যটা লাল হয়ে আকাশে মাথা তুলল। যেন ঠাণ্ডা, আগুন নেই সূর্যের। হালকা আলো ছড়িয়ে পড়ল।

হঠাৎ কুকুরগুলি ডেকে উঠল এবং পরমুহূর্তেই একেবারে স্তব্ধ। আর ঠিক তখুনি বন্দুকের 'সাটার' টানার শব্দ কানে এল বিভাসের। সেও সঙ্গে সঙ্গে সাটার টেনে ট্রিগারে আঙুল দিল। আবার কুকুরেরা ডেকে উঠল। আর

ডাকটা পশ্চিম থেকে উত্তরে যেতে লাগল। আদিবাসীদের চিৎকার সমানে চলেছে।

—হে-ই দাঁতা—ল!

একজন চিৎকার করে উঠল তীব্র গলায়। আর সেই সঙ্গেই মানুষ ও কুকুরের চিৎকার। খ্যাপানো হচ্ছে, আর বিভ্রান্ত করা হচ্ছে জানোয়ারটাকে। কিন্তু কোন দিকে? তারকেশ্বর কোথায় গেলেন! সেই মুহূর্তেই সেই ভয়ংকর জান্তব বীভৎস শব্দটা শোনা গেল। দাঁতালের অসহায় ক্রুদ্ধ চিৎকার। বোঝা গেল, তারকেশ্বর জানোয়ারটাকে তার ঘর থেকে খুঁচিয়ে বার করিয়েছেন তার সাঙ্গপাঙ্গদের দিয়ে।

কিন্তু কোনদিকে? শব্দটা উত্তর থেকে পূবে ছুটে চলেছে। বিভাস সেই শব্দ ধরেই একটু একটু ঘুরছে। কেন ওদিকে তাড়া দেওয়া হচ্ছে? তারকেশ্বর কোথায়? শব্দটা সহসা পূব থেকে দক্ষিণে ঘুরল।

হুঁশিয়ার!

একটা চিৎকার শোনা গেল। পরমুহূর্তেই বিভাস দেখল, জঙ্গল কাঁপিয়ে একটা অদৃশ্য তীর যেন তার দিকে আসছে। দাঁতাল আসছে। তার দিকেই আসছে! না, ওটা একটা কুকুর। সে দক্ষিণ দিকে ফিরল। আর বিভাস দেখল, বিশাল দাঁতালটা তাকে দেখছে কাৎ হয়ে। ঝোপের ভিড়ে বিশাল দাঁতাল, প্রায় একটা মহিষের মতো। তার সূচ্যাগ্র তীক্ষ্ণ দাঁত সামনের দিকে। দেখতে না দেখতেই বন্যবরাহ বিভাসকে লক্ষ্য করে ছুটল।

—মারো হে!

বিভাস ফিরে তাকাল। দেখল তারকেশ্বর বিশ হাত দূরে পশ্চিমে দাঁড়িয়ে আছেন। মুখে একটা ক্রুদ্ধ হিংস্রতা, বোধহয় দাঁতালের থেকেও ভয়ংকর। বন্দুক বিভাসের দিকে তাক করা। চিৎকার করে বললেন, বন্দুক তোল্, মার, দেখি তোর ক্ষমতা। তুই না পারলে তারপরে আমি।

কিন্তু 'তুই' বলছেন কেন তারকেশ্বর? এমন ভয়ংকর দেখাচ্ছে কেন ওঁর মুখ। বন্দুক তুলল বিভাস। কিন্তু তার দিকে কেন তারকেশ্বরের বন্দুকের নল! বিভ্রান্তি লাগছে। দাঁতাল তখন বন্দুকের সীমার থেকেও অনেক এগিয়ে এসেছে। তারকেশ্বর হেসে উঠলেন। দাঁতালের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে বিভাস তারকেশ্বরকে দেখল। বন্দুক ঠিক তেমনি উঠানো। কেন? একটা বিমূঢ়তার মধ্যে বিভাস গুলি করল দাঁতালকে লক্ষ্য করে। লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া মাত্র বিভাস সরে যেতে গেল। সেই মুহূর্তেই তার মনে হল, একটা তীক্ষ্ণ ছুরি তার পায়ের গোড়ালির কাছ থেকে প্রায় কোমর পর্যন্ত বিদ্যুৎ বেগে হেনে গেল। বিভাস বুঝল, দাঁতাল তাকে মারছে। সে পড়ে গেল, আর সঙ্গে সঙ্গে সেই ছুরির ফলা তার হাতের ডানার ওপর দিয়ে ছিঁড়ে বেরিয়ে গেল। আর একটা গুলির শব্দ হল বিলাঞ্চল কাঁপিয়ে। তারপরে আর জ্ঞান রইল না বিভাসের।

॥ পনেরো ॥

জ্ঞান যখন হল তখন গভীর রাত্রি। বিভাস জানে না, ইতিমধ্যে চারদিন পার হয়ে গেছে। সে পুরোপুরি অজ্ঞান ছিল না। মাঝে মাঝে কথা বলেছে। বোধ-হয় ভুল বকে উঠেছে। —'আপনি আমাকে মারতে চান? আমাকে মারতে চান?'...

চোখ মেলে তাকাল বিভাস। অন্ধকার। তার পায়ের দিকে দূরে একটা জানালা যেন অস্পষ্ট চোখে পড়ে। কোন জায়গা এটা? শরীরে একটা অদ্ভুত অস্বস্তি। অথচ ভারী লাগছে নিজেকে। একটা ছায়া যেন এগিয়ে আসছে তার দিকে। সেই মুহূর্তেই দাঁতালের কথা মনে পড়ল তার। আর ডান দিকের কোমরের কাছে একটা শক্ লাগল যেন। সে চিৎকার করবে মনে করল। পারল না। একটা গোঙানি বেরুল। ছায়াটা আরো এগিয়ে এল। বিভাস চোখ বুজল। আর তার কপালে একটি হাত পড়ল। ঠাণ্ডা হাত। কে? বিদ্যুৎ? না পদ্ম? ছোটবউদি নাকি? বিভাস ডান হাত তুলতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণায় গুঙিয়ে উঠল সে। আবার তার চেতনা লয় হয়ে গেল।

প্রায় দু' মাস পরে বিভাস সদরের হাসপাতালে বিছানার ওপরে বসেছিল। পৌষ মাসের বিকালবেলা। শেষ পৌষ। শীত বেশ। হাসপাতালের ডাক্তার বসে আছেন সামনেই। যোগেশ ঘোষাল বড় মেয়ে বেলাকে নিয়ে এসেছেন। জনক যোগেশবাবুর পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। তার পিছনে ঈশান।

ডাক্তারটি যুবক। নাম সুধীর ঘোষ। মুখ চেনা ছিল বিভাসের। এখন আলাপে আরো ঘনিষ্ঠতা হয়েছে। যোগেশবাবু, তাঁর দুই মেয়ে বেলা আর হেনা, জনক, ঈশান এরা প্রায় প্রতিদিনের ভিজিটার। হেনা আসে দুপুরে, খাবার সময়। অনেকক্ষণ ধরে বিভাসের সম্পর্কে আলোচনা করে ডাক্তারের সঙ্গে। আর আলোচনা করতে করতে, সুধীরের চোখে চোখ না রাখতে পেরে মুখ নামিয়ে নেয় হেনা। মুখে একটু রং ছড়িয়ে যায়। ভাল লাগে বিভাসের। একটা দীর্ঘশ্বাস উপছে ওঠে বুক থেকে।

তাপস আসে লুকিয়ে। পদ্ম আর বিদ্যুতের কথা বলে যায়। বলে, জানেন কম্পাউণ্ডারবাবু, পদ্মটা খালি কাঁদে। আসতে চায়। বাবা ওর বিয়ের সম্বন্ধ খুঁজছে খুব। পদ্ম, একদিন জানেন, বাবার সঙ্গে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঝগড়া করেছে। বাবা ওকে গুলি করে মারবে বলে ছুটে বন্দুক নিয়ে এসেছিল। কিন্তু বাবা গুলি করতে পারেনি। মাঝখান থেকে নিজেই মাথার যন্ত্রণায় প্রায় অজ্ঞান হয়ে গেছল।—মা খালি কাঁদে। বলে, 'বুনো দাঁতালের হাতে পড়ে আপনি বেঁচে গেছেন। নইলে বাবা আপনাকে মেরেই ফেলত।'

তা জানে বিভাস। শিকারে গিয়ে একটা গুলি তার বুকের পাঁজর ভেদ করে গেলে, শিকারে লক্ষভ্রষ্টতার অজুহাতে নির্দোষী প্রমাণ হয়ে যেতেন তারকেশ্বর। দাঁতাল যদি লক্ষভ্রষ্ট হত, তারকেশ্বরের বন্দুক তা হত না। কিন্তু বিভাস বেঁচে যাবে, একথা বোধহয় তারকেশ্বরও ভাবেননি। ডাক্তার সুধীরও তাই বলেছে। রক্ত না দিয়েও যে এ রুগীকে বাঁচান গেছে, এটা প্রায় তার নিজের কাছেই অবিশ্বাস্য। শরীরে রক্তদান করার প্রথার আগে যেমন নিতান্ত ভাগ্য বলে এ সব কেস্ বাঁচত, বিভাস সেই রকমই বেঁচে উঠেছে। এ হাসপাতালে রক্ত দেবার কোনো ব্যবস্থা নেই।

তবে, বিভাস পঙ্গু হয়নি বটে, তার ডান পা'টি একটু ছোট হয়ে গেছে। সেটাও ডাক্তারের পরিশ্রমে। অন্যথায় কেটে বাদ দেওয়া ছাড়া কোনো উপায় ছিল না। বিভাস দেখেছে, পায়ের গোড়ালির কাছ থেকে গভীর ঘায়ের দাগ একটা মোটা সাপের মতো পাক দিয়ে উঠেছে প্রায় কুচকি পর্যন্ত। হাতের ক্ষতটা ততোধিক মারাত্মক নয়। কিছু চামড়া এবং মাংস তার বাঁ দিকের পাছা থেকে নিতে হয়েছে ক্ষত সেলাই করার সময়ে। জনক নাকি দিতে চেয়েছিল। সুধীর নেয়নি। এবং সেটা ভালই করেছে।

কিন্তু বিভাসকে চিরদিনই কোনো কিছুতে ভর দিয়ে চলতে হবে। সুধীর বলেছে, ডান দিকের জন্যে একটা ক্রাচ্ তৈরি করিয়ে দেবে। বিভাস জানে, শুনতে 'একটুখানি' আসলে তার ডান পা অনেকখানি ছোট হয়ে গেছে। যখন সে দাঁড়াবে, তখন ডান পা ঝুলবে। যেদিন সে প্রথম জানতে পেরেছিল সেদিন সে চোখের জল রোধ করতে পারেনি। আর প্রমীলা সেটা দেখে ফেলেছিল।

প্রমীলা একমাত্র নার্স এই হাসপাতালের। সে আসে সদরের পূর্বাঞ্চলের রিফিউজী ক্যাম্প থেকে। কালো কুলো ঠাণ্ডা মেয়েটি। ওর ডিউটির অতিরিক্ত সময়, সারারাত্রি জেগেও বিভাসের সেবা করেছে। তার জন্যে হাসপাতাল ওকে কোনো পয়সা দিতে পারেনি। ঘোষাল মশায় দিতে চেয়েছিলেন, নেয়নি। বলেছে, ওনার লেইগা আমি পয়সা নিমু না। আমি জানি ওনারে মাইরা ফেলানোর চেষ্টা হইছিল।

প্রমীলা তার ছেড়ে আসা জেলার বাচন ভঙ্গি বদলাতে পারেনি। কথাগুলি শুনতে ভালই লাগে। কিন্তু, বিভাসকে যে মেরে ফেলার চেষ্টা হয়েছিল, ওটা তার নিজের আবিষ্কার। বিভাসের প্রলাপ থেকে নাকি সে এটা আবিষ্কার করেছে। সুধীর ওকে ধমকে দিয়েছে, যেন সে তার ওসব আবিষ্কার বাইরে গেয়ে বেড়াতে না যায়। কারণ এ হাসপাতালের সরকারি কর্ণধার বলতে অনাদি মুখার্জি, বিধানসভার সদস্য। তারকেশ্বর রায়ের সমর্থক। শুধু সমর্থক নন, গ্রামের অভ্যন্তরে তার রাজনৈতিক প্রতিপত্তি ও ক্ষমতার রক্ষক প্রচারক কর্মী হলেন তারকেশ্বর। অনাদি মুখার্জিও একদিন দেখতে এসেছিলেন বিভাসকে।

প্রমীলা বলেছিল বিভাসকে, কাঁদেন ক্যান্। আপনে পুরুষ, আপনার ভয়

কি ? আপনারে খুন করতে তো পারে নাই।

প্রমীলা তার মাথায় হাত দিয়েছিল। লজ্জা করছিল বিভাসের। বড় পাকা পাকা মনে হয়েছিল প্রমীলাকে। কিন্তু মেয়েটি ওই রকমের। বিভাসকে তো তবু একটু চোপা কম করে। সকলেই ওর কাছে পাকা পাকা কথার বকুনি শোনে, কিন্তু, সকলেই ওর বশংবদ। কারণ, ওর সেবা অকৃত্রিম, নিরলস। যেন ও বাড়ির মেয়ে।

কিন্তু তাপস সকলের কথা বলে। বিদ্যুতের কথা তার আটকে যায়। তখন বিভাসকেই জিজ্ঞেস করতে হয়, আপনার স্ত্রী কী বললেন ?

তাপস যেন অভিমানে চুপ করে থাকে। বলে, 'ও তো আজকাল কথাই বলে না। আগে আমাকে খুব বকত। আমি তো দাঁত দিয়ে নখ কাটি। পায়ের নখও কাটি। আর তেল মাখি না। আর রাসুর সঙ্গে মাঝে মধ্যে তাড়ি খেয়ে ফেলি, পয়সা নিয়ে ওকে দিই। তাতে আজকাল খুব রাগ করে। বাপের বাড়ি চলে যাবে বলে। আমার নখ কেটে দেয় না। পয়সা চুরি করতে বারণ করে না আর। এখন খালি চুপ করে থাকে। আপনার কথা জিজ্ঞেস করে। আমি যেই বলতে আরম্ভ করি, অমনি থমকে ওঠে। বলে, 'থাক, কেমন আছেন শুধু সে কথা জিজ্ঞেস করেছি। কে তাকে দেখতে আসছে আর ডাক্তার কী বলছে, উনি কী খাচ্ছেন অত সাতকাণ্ড রামায়ণ শুনতে চাইনি তোমার কাছে।'

বলতে বলতে তাপসের মুখখানি করুণ হয়ে ওঠে। বলে, বউ আজকাল কেমন হয়ে গেছে। আমারও রাগ হয়ে যায় এক একদিন। আমি খাই না, চান করি না। তখন আবার এসে খুব আদর করে। আর খুব কাঁদে।

তাপস হাঁ করে হাসতে থাকে। বিভাস অবাক হয়ে শোনে তাপসের মুখের দিকে তাকিয়ে। বিদ্যুৎ এই লোকটির নখ কেটে দেয়, আদর করে। বিদ্যুতের আদর সে কি বস্তু! কিন্তু তাপসকে হিংসা করবে, ভাবতেও লজ্জায় মরে যায়। সে শুধু কপালে হাত দেয়। একদিন বিদ্যুৎ তাকে স্নেহ করেছিল।

বিভাস যেন দেখতে পায়, পদ্ম ছটফট করছে। কাঁদছে। মাঝে মাঝে বাগানের ঘরটায় ছুটে ছুটে যাচ্ছে। আর বিদ্যুৎ স্থির! নির্বাক। এর মধ্যে বিভাসের লজ্জা কতখানি আছে, সে জানে না। কিন্তু কৃতজ্ঞতায় ও ব্যথায় ভার হয়ে ওঠে তার বুক। মনে মনে বলে, 'আমি বলতে পারব না, এ জীবনে কিছুই পাইনি। না চেয়ে যা পেয়েছি, তা অনেক। তার তুলনা নেই। প্রতিদানের যোগ্যতা আমার নেই জেনেও, কেউ আমাকে ঋণী সাব্যস্ত করেনি।'

সব থেকে আশ্চর্য, তারকেশ্বর আসেন। প্রায় স্নেহ করেই কথা বলেন। বলেন, 'বাড়ি ফিরেও তোমাকে অনেকদিন শুয়ে থাকতে হবে।'

বলতে চান, সম্পূর্ণ আরোগ্যের পর বিভাস আবার ওঁর ওখানেই ফিরে যাবে। বিভাস চুপ করে চেয়ে থাকে। তারকেশ্বরের চোখের দিকেই সোজা তাকিয়ে থাকে। কথা তার ঠোঁটের প্রান্তে এসে পড়ে। জোর করে থামিয়ে

রাখে। কিন্তু তারকেশ্বরের চোখের গভীরে ধিকি ধিকি আগুন জ্বলে। বোধহয়, এ সেই প্রথমেই আক্রমণ করতে অভ্যস্ত কেউটের চাউনি।

একদিন তারকেশ্বর জিজ্ঞেস করে ফেলেছিলেন, 'তাকিয়ে আছ যে?'

বিভাস বলেছিল, 'আপনাকে দেখছি।'

তারকেশ্বর একটু থমকে গেছলেন। হেসে বলেছিলেন, কেন, ভয় পাচ্ছ?

বিভাস বলেছিল, আগে পেতাম, এখন আর পাই না।

মনে করা গেছল, তারপর থেকে আর তারকেশ্বর আসবেন না। কিন্তু এসেছিলেন। কেন না, কেমন করে যেন রটেছে তারকেশ্বর তার কম্পাউণ্ডারকে দাঁতালের মুখে ইচ্ছে করেই ফেলে দিয়েছিলেন। কথাটা কীভাবে রাষ্ট্র হয়েছে, বিভাস জানে না। কথাটাকে মিথ্যে প্রমাণিত করতে চেয়েছিলেন তারকেশ্বর।

যতো সুস্থ হয়ে উঠছে, বিভাসেরও ততো সংশয় উপস্থিত হয়। সত্যি কি তারকেশ্বর তাকে মারতে চেয়েছিলেন? সেই দৃশ্যের কথা মনে হলে আর কোনো সংশয় টিকতে চায় না। এ বিষয়ে যোগেশ ঘোষালের সঙ্গে কিছু কথা-বার্তা আলোচনা হয়। ঘোষাল তো নিঃসংশয় যে তারকেশ্বর তাই চেয়েছিলেন।

নিজের মনের দিকে তাকিয়ে বিভাস অবাক হয়। তারও বুকের ভিতরে একটা ভয়ংকর হিংস্রতা, যেন প্রতিশোধের চাপা আগুন জ্বলছে।

আজ যোগেশ ঘোষাল ডাক্তার সুধীরকে জিজ্ঞেস করলেন, কই হে ডাক্তার, রুগীকে রিলিজ কবে করবে, কিছু বলছ না তো?

সুধীর বলল, আপনাদের পঞ্চায়েতের নির্বাচনের মুখ চেয়ে, খুব তাড়া-তাড়ি হলেও মাসখানেক।

—সর্বনাশ! তাহলে তো নির্বাচনে নামাই চলে না। আসল লোকই যে পড়ে।

বিভাস অস্বস্তি বোধ করে। সুধীর বলল, কি করব বলুন, আসল লোককে মেরে তো আর আপনারা কাজ চালাতে পারবেন না। তাও আপনারা ওঁকে গ্রামে গ্রামে নিয়ে যাবেন খুব সাবধানে।

জনক বলে উঠল, যে আজ্ঞে আপনাকে বলতে হবে না ডাক্তারবাবু। গাড়ির মধ্যে গদী করে নিয়ে যাব।

সুধীর হেসে বলল, তা ঠিক! তবে গোরুর গাড়ি তো। আপনাদের পথ-ঘাটেরও যা অবস্থা!

বিভাস বলল, কিন্তু ঘোষাল মশাই, আমাদের একেবারে লোকবল নেই, আমরা কি পারব?

ঘোষাল বললেন, কে বললে তোমাকে লোকবল নেই। স্বয়ং দিবানাথ কাজে লেগে গেছে। তার সহগামীর সংখ্যাও কম নয়। আর তুমি তো জান, ও ছেলে রাজনীতি করবার পাত্র নয়। তারকেশ্বরদের কায়েমী স্বার্থের চক্রটা ভাঙতে হবে। কোনো সৎব্যক্তির পক্ষে এ সব সহ্য করা আর সম্ভব নয়।

ঈশান বলে উঠল, আর আমরাই বা আছি কি করতে দাদাবাবু। এখন গাঁয়ে গেলেই বুঝতে পারবেন, হাওয়া একটু ভিন্ চালে বইছে।

নির্বাচনের প্রতিযোগিতায় বিভাসের পূর্ণ সমর্থন আছে। সেই সঙ্গেই আছে প্রচুর সংশয়। অনাদি মুখার্জি তারকেশ্বর রায়দের দুর্গ প্রায় দুর্ভেদ্য। তাঁরা এখন এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মনের সংস্কারের মধ্যে পেঁছে গেছেন। পরাজয়ের গ্লানি সহ্য করা অসম্ভব হয়ে উঠবে বিভাসের পক্ষে। অন্তত, এখনও তাই মনে হচ্ছে। অবশ্য যোগেশ ঘোষালেরা এবার নির্বাচনে নামতেনই সে কথা আগেই আলোচনা হয়ে গেছল। বিভাস সমর্থনও জানিয়েছিল। কিন্তু সে নিজে ভোটযুদ্ধে নামবে, এতটা ভাবেনি। এখন দেখা যাচ্ছে, অঞ্চল প্রধান পদের নির্বাচনের জন্যেই তাকে মনোনিত করেছেন ঘোষালেরা। সংশয়টা সেই জন্যেই আরো বেশি। তাকে কেন লোকে ভোট দেবে। ভোট চাইবার যোগ্যতাই বা তার কতটুকু।

কিন্তু এ বিষয়ে তাকে যোগেশবাবুদের ওপর ছেড়ে দিতে হয়েছে।

যোগেশ ঘোষাল বললেন, দেখ, মানুষের মনটা খুব অদ্ভুত। অনাদি মুখুজ্জেকে লোকে চাক বা না-চাক, ভোট দেবার সময় মনে করে ওদেরই দিতে হবে। গ্রামের এক শ্রেণীর লোকদের স্বার্থ তারা সব সময়ে দেখে। আর সেইসব লোকেরাই গ্রামের অন্য লোকদের চালায়। এই ধর আমি। আঁচনায় আমার মতো লোকদের হাতে রাখা সব সময় দরকার ছিল। আমাদের কাছে সবাই আসত, জিজ্ঞাসাবাদ করত। আমরা যা বলব, তাই তারা মানবে। অস্বীকার করব না, অনেক অন্যায় চোখের ওপর দেখেও চুপ করে থেকেছি। পাল্টা ব্যবস্থা করবার কথা ভাবতে পারিনি। কিন্তু নেদোর খালের ব্যাপারটা আর সহ্য করতে পারলাম না। এ কি রকম কথা! সরকারি বিষয়টাকেও যদি ওরা নিজেদের জমিদারী চিন্তা করে, তা হলেই ত মুশকিল। আমার মনে অবশ্য একটা কুসংস্কার ছিল যে, যে সব সরকারি অর্থ ওরা আত্মসাৎ করে এতে কোনো অপরাধ হয় না। এতদিনে এই তো প্রথম দেশের টাকা দেশের লোকে ভোগ করছে। পরে মনে হল, এ লোকগুলো সব উঞ্ছ চোর, চরিত্রহীন লোভী! আমি আর চুপ করে থাকতে পারছিনে।

যোগেশ ঘোষাল মুখ খুললে রেহাই নেই। কথাগুলি উনি সরল বিশ্বাসে বলেন। যখন আরম্ভ করেন, তখন সহজে থামতে চান না। এ সব কথা বহু বছর ধরে ওঁর ভিতরে ঘুলিয়েছে। বলতে পারেননি। কিন্তু বলতে যখন আরম্ভ করলেন, তখন উনি বলা আর পাল্টা ব্যবস্থা করা, দুটি সমানে চালিয়ে যাচ্ছেন।

বেলা অস্বস্তি বোধ করছে। বাবাকে না থামালে উনি কতক্ষণ চালিয়ে যাবেন, বলা যায় না। বিভাস জানে, দিবানাথ কখন আসবে, বেলা তাই বোধহয় ভাবছিল। মানুষ যে কী বিস্ময়কর, জটিল, বলবার নয়। সে জানে, দিবানাথের সামনে বেলা অন্যরকম হয়ে যায়। যেমন হেনা সুধীরকে দেখলে

হয়ে যায়।

বেলা আর হেনা, দুই মেয়ে ছাড়া ঘোষালমশায়ের আর সন্তান নেই। মেয়েরাই তাঁর ছেলে। তাঁর সঙ্গী এবং অধিকাংশ সময় আলোচনার অংশীদার।

বেলা বলল, এ সব আলোচনা আর কেন তুলছ এখন? তুমি যে আজ বিভাসবাবুকে অন্য কী একটা কথা বলবে বলেছিলে?

যোগেশবাবু বললেন, হ্যাঁ, সে কথাই তো বলতে যাচ্ছি।

বেলা সুধীরের মুখের দিকে তাকিয়ে হেসে ফেলল। সুধীরও হাসল। বেলা বলল, তবে এত কথা বলছ কেন? ঐ কথা তো তুমি সবাইকেই বলেছ।

ঘোষাল বললেন, বারে বারে বলতে হবে মা। সত্যি কথা অনেক সময় রাজনীতি হয়ে যায় তো। তখন তোমাদের এই বিভাসবাবুরা আর দিবানাথেরা বলবেন, ওতে মশাই আমরা নেই। কেন না ওরা যে প্রতিজ্ঞা করেছে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়ব, কিন্তু রাজনীতি করব না। কিন্তু অন্যায়ের বিরুদ্ধে লড়তে গেলেও কাজের একটা ধারা আছে। কৌশলও চাই। এমন কৌশল যাতে ঐ লোভী চোরগুলোর চালাকি না খাটে। আমি কী বলছি, তুমি বুঝেছ বিভাস?

বিভাস তাড়াতাড়ি ঘাড় নাড়ল, সে বুঝেছে। আসলে সে বুঝেছে, সে যে সামান্য মাত্র হতাশা দেখিয়েছে, তাতে ঘোষালমশাই রুষ্ট হয়েছেন।

বিভাস ঘাড় নাড়বার আগেই উনি বললেন, আমি বলছি, গ্রামের সেই সব মাথাদের প্রায় কাউকেই তুমি দলে পাবে না। কারণ অধিকাংশই বেশি জমির মালিক। বেনামী জমির কারবার তাদের সকলেরই আছে, সুতরাং তারকেশ্বর-দের পক্ষে না থেকে তাদের উপায় নেই। কিন্তু তাদের স্বার্থ যে গ্রামের লোকদের স্বার্থ নয়, সেই কথাটা আমাদের বলতে হবে। তাই বলছি, লোকবল আমাদের যথেষ্ট। কারণ গ্রামের লোকেরা সবাই চোরের সাক্ষী গাঁটকাটা নয়। অন্যায়কে তারাও অন্যায় বলেই জানে। তাদেরও একটু সাহস যোগানো দরকার। আর সেটাই করব আমরা কয়েকজন। বুঝেছ?

বুঝেছে। বিভাস একথাগুলি নিজেই অনেকবার আলোচনা করেছে। যোগেশ ঘোষাল বললেন, আমি তোমার নামে একটা হ্যাণ্ডবিল ছাপতে দেব।

আমার নামে?

—হ্যাঁ, তোমার নামে। হ্যাণ্ডবিলে আমরা প্রথম ছাপব, নতুন নির্বাচনের পর কী কী আমরা ঘটতে দেব না। প্রথম, কম টাকা দিয়ে কৃষকদের কাছ থেকে বেশি টাকার মুচলেকা হবে না। সরকারি খয়রাতি—বীজ, সার, এ সবের তছরূপ আমরা হতে দেব না। যা পাওয়া যাবে তার মোট হিসাব সকল গ্রাম-মুখ্যদের সামনে রাখা হবে। দরকার হলে গ্রাম-পঞ্চায়েতগুলিও উপস্থিত থাকতে পারে। আগের মতো একজন কর্তাব্যক্তি সর্বেসর্বা হবে না। সকলে মিলে মিশে বণ্টন করতে হবে। এই লিখিত নিয়ম আমরা মেনে চলব। সরকারি কর্মচারিদের অতিথি হিসাবে বিবেচনা করব। তিনি সাহায্য করতে বাধ্য থাকবেন, কিন্তু তিনি কোনরকম অন্যায় সাহায্য কিংবা সুবিধা কিংবা

পয়সা চাইলে দেব না। রিলিফে কাটানো পাট পচাবার পুকুরকে আমরা একজনের জবর দখলে রাখতে দেব না। মৃতব্যক্তির নামে ঋণের টাকা লুটতে দেব না। আমরা, সদর থেকে আঁচনার হাট পর্যন্ত মোটরবাসের রাস্তা কোনদিন হবে না এ কথা বিশ্বাস করি না এবং রাস্তা তৈরির বাধা আমরা মানব না। নেদোর খাল না কাটানোর মিথ্যা ধাপ্পা আমরা বিশ্বাস করি না। ইত্যাদি ইত্যাদি। ইতি—আপনাদের আঁচনার কম্পাউণ্ডারবাবু।

বিভাস অবাক হয়ে বলল, আঁচনার কম্পাউণ্ডারবাবু?

যোগেশ ঘোষাল বললেন, হ্যাঁ, তাই দিতে হবে।

সকলে চুপচাপ। কিন্তু ঈশানের গোঁফদাড়ির ফাঁকে ফাঁকে খেলছে সপ্রশংস হাসি। জনকের মাথা নড়ছে। এবং জনকই প্রথম বলল, হ্যাঁ, বাবু তো ঠিকই বলেছেন। আমরা তো কম্পাউণ্ডারবাবু বলেই জানি। নাম কে জানে?

ঠিক এ সময়েই প্রমীলা এল। সকলের দিকে একবার তাকাল। তার চাউনির রকম সকম দেখে, সুধীর আগেই জিজ্ঞাসা করল, কি হয়েছে প্রমীলা?

প্রমীলা বলল বেলাকে, দেখছেন বেলাদি, কাণ্ডটা একবার দেখেন। এই সব কইরা ডাক্তারবাবুর চাকরিটা যাইব দেইখেন, এই কইয়া দিলাম।

সুধীর ধমকে উঠল, আঃ প্রমীলা, এ সব তোমাকে কে বলতে বলছে। যাও, নিজের কাজে যাও।

প্রমীলা যেতে উদ্যত হয়েও আবার বলল, আপনেরা মনে করছেন, অনাদি মুখুজ্জা এই সব খবর পাইব না? পাইলে তো সে কইবই, ক্যান্ হাসপাতালের মধ্যে বইসা এই সব আলোচনা হয়।

সুধীর বলে উঠল, তুমি যাবে কিনা আমি জানতে চাই।

প্রমীলা হন্ হন্ করে চলে গেল সেখান থেকে। কিন্তু কথাগুলি এত যুক্তিযুক্ত, সহসা কেউ প্রতিবাদ করে উঠতে পারল না। আর প্রমীলাকে সকলের জানা ছিল। তার মনোভাব এবং চরিত্র এখন প্রায় সকলের নখদর্পনে। যাদের সামনে চোপা করে গেল, সকলের সঙ্গেই তার প্রীতির সম্পর্ক। যোগেশ ঘোষালকে সে মেসোমশাই বলে ডাকে। সে দিক থেকে ওকে ভুল বোঝবার কারণ নেই। বরং ও যা বুঝেছে, ঠিকই বুঝেছে।

ঘোষালমশাই সবার আগে ঘাড় নেড়ে বলে উঠলেন, ঠিক, ঠিক! প্রমীলা মা ঠিক কথা বলেছে। আমরাই স্থান কাল পাত্র ভুলে গেছি। এই জন্যেই বলছি ডাক্তার, তোমার রোগীকে একটু তাড়াতাড়ি রিলিজ কর।

কিন্তু সুধীরের মুখে তখনো বিরক্তি আর ক্ষোভের ছাপ। বলল, হয়তো সত্যি। কিন্তু কথা বলার এ কি ধরণ! এটা আমি কিছুতেই শোধরাতে পারছিনে।

বেলা বলল, মিথ্যে রাগ করছেন। আমরা যে রকম অচৈতন্য, তাতে ও ভাবেই একটু বলার দরকার ছিল! প্রায় রোজই তো এ সব হয়। আর ওতো একদিন বলল।

ঘোষালমশাই ছেলে মানুষের মতো একবার গলা তুলে এদিক ওদিক দেখে, চাপা গলায় বললেন, তবু কথাটা যখন তুলেছি, চুপি চুপি বলে যাই, হ্যাণ্ড-বিলটা আর দেরি করব না। ও পক্ষ তোড়জোড় সুরু করেছে, বুঝলে?

প্রমীলা অবশ্য এ ওয়ার্ডের মধ্যেই অন্যান্য রুগীদের পরিচর্যায় ছিল। কিন্তু সে আর এদিকে কান দিল না। বাকী সকলেই ঘোষালের ভঙ্গিতে হেসে উঠল।

বিভাস বলল, যা ভাল হয় করবেন। একবার দিবানাথবাবুর সঙ্গে আলোচনা করে নেবেন।

জনক বলে উঠল, আমি একটা কথা বলছিলাম। বলছিলাম, কম্পাণ্ডার-বাবুর দলিল টলিল সব ডাক্তারবাবুর বাড়িতে রয়েছে। সেগুলোন আনার পর এসব করলে হত। নইলে আবার—

ঘোষাল বললেন, আরে দলিল নিয়ে কি ধুয়ে খাবে তারকেশ্বর? ওটা ফিরিয়ে না দেয়, নকল নিয়ে আসব রেজিস্ট্রি অফিস থেকে। বিভাসের নামে বাড়ি জমি তো আর সে দখল করতে পারবে না।

বিভাস বুঝল, জনকের ভয় কোথায়। জনককে তাড়াবার জন্যেই তারকেশ্বর রাতারাতি বিভাসের নামে সব কিনিয়ে নিয়েছিলেন। জনক তার দিকেই তাকিয়েছিল। বিভাস বলল, সে ভয় তুমি করো না জনক। ঘোষাল-মশাই যা করবেন, তাই ঠিক।

একে একে সবাই বিদায় নিল। বিভাস দেখল ঈশান তাকিয়ে আছে। বিভাস বলল, আবার এস ঈশেনদা।

ঈশান এইটুকুর জন্যেই অপেক্ষা করছিল। বলল, নিশ্চয়। তুমি তাড়াতাড়ি ভাল হয়ে ওঠ দিকিনি। সকলের সঙ্গে ডাক্তারও বাইরে গেল। আর প্রমীলা একেবারে ঝাঁপিয়ে এল। বলল, আইচ্ছা কন তো বিভাসদা, আমি কিছু ভুল বা মন্দ কইছি?

বিভাস বলল, মোটেই না।

—তবে ডাক্তারবাবু আমারে ধমকাইলেন ক্যান্‌!

বলতে বলতেই আবার সুধীরের পায়ের শব্দ শোনা গেল বারান্দায়। প্রমীলা ছিট্‌কে সরে গেল। সুধীর খুব গম্ভীর হয়ে ঢুকল। বিভাসের দিকে তাকিয়ে লুকিয়ে একটু হাসল। তারপরে রুগীদের সান্ধ্যকালীন পরীক্ষায় রত হল সে। এরপরে সুধীর বেরিয়ে যাবে। এখানে ওখানে ঘুরে ঘোষালমশাইয়ের বাড়িতেই যাবে। কারণ ওই পায়ের শব্দের জন্যে হেনা কান পেতে আছে।

বিভাস আস্তে আস্তে শুয়ে পড়ল।

বিভাস মুক্তি পেল। মাঘ মাস শেষ। ক্রাচ বগলে বাইরে এল বিভাস। আপাতত যোগেশ ঘোষালের বাড়িতেই আশ্রয় নিল সে। কথা আছে, নির্বাচনের পরে, গ্রামে গিয়ে জনকের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকবে।

মুক্তির পরেই কাজ আরম্ভ হল। প্রথম যেদিন আঁচনার হাটে সে দাঁড়াল, সেদিন সত্যি বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটল। হাট বন্ধ হবার উপক্রম। হাজার হাজার মানুষ তাকে ঘিরে দাঁড়াল। বিভাস যে এমন একটি দ্রষ্টব্য হয়ে উঠেছে, সে জানত না। রাসু ছুটতে ছুটতে, ভিড় ঠেলে একবার কাছে এসে দাঁড়াল। বিভাস জিজ্ঞেস করল, কেমন আছেন।

রাসু কোনো জবাব দিতে পারল না। দেখেই আবার পালিয়ে গেল।

বিভাসকে পাশে রেখে দিবানাথ বক্তৃতা দিল। জীবনে এই বোধহয় জগদীশ চক্রবর্তী স্বয়ং বাইরে এসেছেন এবং নির্বাচনের বক্তৃতা শুনছেন।

॥ ষোলো ॥

ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি নির্বাচন শেষ হল। জয় হল বিভাসদেরই। অঞ্চল প্রধান হল কম্পাউণ্ডারবাবু বিভাসরঞ্জন মুখোপাধ্যায়। সব থেকে আশ্চর্য, তেরোটি গ্রামের মধ্যে, একজন গ্রাম মুখ্য পর্যন্ত হতে পারেনি তারকেশ্বর রায়ের লোকেরা। কিন্তু আসল সংকট এবারই সুরু। প্রতি পদে পদে বাধা অপবাদ কাটিয়ে তাকে অগ্রসর হতে হবে। গুপ্ত এবং প্রকাশ্য ষড়যন্ত্রের এবং আক্রমণের জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। তাই প্রথমেই বিভাস নিজের ভরণ-পোষণের জন্যে উঠে পড়ে লাগল। যে সামান্য জমি আছে, তাতে জনক তার বউ ছেলেমেয়ে আর মা, এই কয়টি প্রাণীরই চলে না। পরের মজুরী জনককে খাটতেই হয়। এবং বিভাসের সৌভাগ্য নির্বাচনের এক সপ্তাহের মধ্যেই, দিবানাথের চেষ্টায়, একটি প্রাথমিক স্কুলে তার মাষ্টারি জুটে গেল।

যোগেশ ঘোষালের বাড়িটি সদরের ছোট্ট শহরের একমাত্র রাজপথের ওপরেই। একতলা বড় বাড়ি। পিছন দিকে একটি বাগান আছে। বিভাস বাগানের দিকে একটি ছোট ঘর নিজেই বেছে নিয়েছিল।

স্কুল থেকে এসে সন্ধ্যা পর্যন্ত বাগানের কাছে ঘরটিতে এসে চুপ করে বসে থাকে বিভাস। এখানে প্রচুর পাখীর ভিড়। সন্ধ্যাবেলায় ঘরে ফিরে, সবাই সকলের প্রত্যাবর্তনের খোঁজ নেয়। হয়তো সারাদিনে কে কত খাবার সংগ্রহ করেছিল, কার সঙ্গে কার কত ঝগড়া হয়েছিল, সেই আলোচনাই করে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে।

পৃথিবীর আবর্তন ঋতুতে ঋতুতে নানান রূপে খেলে যায়। ঘরটিতে বসেই বিভাস দ্যাখে। কিন্তু সন্ধ্যার পরেই, অঞ্চল প্রধানের অফিসে যায় সে। সেখানে অনেকে অপেক্ষা করে। রাত্রি ন'টা দশটা পর্যন্ত সেখানেই কেটে যায়। মাঝে মাঝে গ্রামেও যেতে হয়। তার চুপ করে বসে থাকবার উপায় নেই। একটা অপ্রতিরোধ্য গতি থেকে আর একটা অপ্রতিরোধ্য গতির মধ্যে সে এসে পড়েছে। সামনেই সাধারণ নির্বাচন। পঞ্চায়েৎ নির্বাচনের উষ্ণতা এখনো এখানকার বাতাসে। সাধারণ নির্বাচনের হাওয়া নতুন উত্তাপ নিয়ে এসেছে।

এই নতুন উত্তাপকেও তারকেশ্বর অনাদিবাবুরাই বাড়িয়ে তুললেন। এবার অনাদি মুখুজ্জে দাঁড়াচ্ছেন না। পঞ্চায়েতে পরাজিত তারকেশ্বরকেই সাধারণ নির্বাচনে মনোনিত করেছেন তাঁরা।

ঘোষালমশাইয়ের অভিমত, সাধারণ নির্বাচনে তারকেশ্বরকে পরাজিত করতে পারলে, নেদোর খালের বাঁধ ভাঙার কাজ সহজ হয়ে উঠবে। পঞ্চায়েত ইতিমধ্যেই তার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। কিন্তু নেদোর গ্রাম থেকে হঠাৎ পাকিস্তানের অনুচর আবিষ্কৃত হল। আবিষ্কর্তা স্বয়ং শরাফৎ। যে লোকটা প্রতি মাসে অন্তত দুবার অনায়াসে কালিন্দী পেরিয়ে পাকিস্তানে যায়। দুই দেশের মাঝখানে এখন তার লক্ষ লক্ষ টাকার ব্যবসা। তারকেশ্বর অনাদিরাও সেই ব্যবসায় আছেন বলে শোনা যায়।

নেদো মুসলমান প্রধান গ্রাম। কালিন্দী দিয়ে যমুনায় ঢুকে নেদোর খালের মুখ খোলা পেলে নাকি অনায়াসে পাকিস্তানের অনুচরেরা প্রবেশ করতে পারে। স্বভাবতই, পঞ্চায়েতের সিদ্ধান্ত মন্ত্রী পরিষদে গিয়ে পৌঁছেছে।

কিন্তু বিভাস ওই বাগানটিতেই যেন ভালো থাকে। সব বিচার বিশ্লেষণ করতে পারে। সে বোঝে, পঞ্চায়েত নির্বাচন দিয়ে, জাতি-চরিত্র বোঝা যায় না। তার ধারণা, সাধারণ নির্বাচনেও তারকেশ্বর হয়তো হারবেন। কারণ, একটা উল্টো স্রোত এ অঞ্চলে এখন নেমেছে। সাহস পেয়ে, বহুদিনের পুরনো পথের বিরুদ্ধে যাবার একটা প্রবল ঝোঁক এসেছে। কিন্তু মানুষের মনের, বিশ্বাসের, অবস্থার মূলে কোনো পরিবর্তন তাতে সহসা সাধিত হতে পারে না। আর সময়ের দীর্ঘতা মানুষকে শেষ পর্যন্ত হতাশা এবং ব্যর্থতায় টেনে নিয়ে যেতে পারে।

তাপস আসে, কিন্তু খুব কম। তাকে এখন আরও লুকিয়ে আসতে হয়। তার আসার সংবাদ জানতে পেরে, তারকেশ্বর তাকে মেরেছিলেন। তাপসের মুখেই শুনেছে, বিদ্যুৎকে আজকাল অত্যন্ত কটু ভাষায় তারকেশ্বর আক্রমণ করেন। পদ্ম অসুস্থ। শুধু শুয়ে থাকে। শুয়ে শুয়ে নাকি শুকিয়ে যাচ্ছে। ভুবনেশ্বরী পদ্মকে ছেড়ে ঘরের বার হন না।

তারকেশ্বর লোহার জালের ফাঁদে আটকানো কেউটের মতো সব সময় ফুঁসছেন। রাসু নাকি প্রায় রোজই মার খায়। রুগীরা ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকে।

বিদ্যুৎ একবার ছোট একটি চিরকুটে লিখে পাঠাল ঃ

'সব সইতে পারছি। কিন্তু ঠাকুরঝিকে আর চেয়ে দেখতে পারছি নে। চোখের সামনে তাকে মরতে দেখব, এটা ভাবতে পারিনে। ঠাকুরঝির এ ভালবাসার গুণ গাইতে পারব না। নিন্দে করতে গেলে আমার জিভ পুড়ে যাবে। কী দিয়ে বেঁধেছিলেন, আর কী নিয়ে গেছেন? কোনো উপায় কি নেই?—বিদ্যুৎ।'

কোনো উপায় নেই। বিভাসের আজ আর কোনো উপায় নেই। দেশ এবং সমাজের সঙ্গে এমন একটা সূত্রে সে বন্দী, এই অঞ্চলের এমন একটা চরিত্র সে,

শুধুমাত্র তারকেশ্বরের মেয়ে বলেই আরও সম্ভব নয়।

তাছাড়া, সাধারণ নির্বাচনের কাজ সুরু হয়েছে। বিভাসই মনোনিত হয়েছে। এই মুহূর্তে তারকেশ্বরদের হাতে মিথ্যা দুর্নামের কোনো নোংরা অস্ত্রই তুলে দেওয়া যায় না।

বিভাস নির্বাচিত হল। আসলে, বহুদিনের পুরনো শক্তির বিরুদ্ধে দিবানাথ এবং যোগেশ ঘোষালদের নতুন উদ্যমেরই জয় এটা।

তবু যখন সে সত্যি জয়লাভ করল, তখন মনে হল, এই সমগ্র অঞ্চলে যেন ভয়ংকর বোমা পড়ার পরের অবস্থা। মনে হল বহুদিনের একটা বিশাল পুরনো অন্ধকারময় প্রাসাদ ভেঙে পড়ল।

বিধানসভায় অধিবেশন উপলক্ষে কলকাতায় থাকাকালীন একদিন দক্ষিণাঞ্চলে তাদের দেশের বাড়িতে গিয়েছিল বিভাস। কিন্তু বাড়িটাই নেই। সেখানে একটা অন্য ধরণের মস্ত বড় বাড়ি হয়েছে। বাড়ির মালিক একজন পূর্ববঙ্গীয় ভদ্রলোক। প্রতিবেশীরা কেউই বিভাসকে চিনতে পারল না। তার দাদাদের খবরও বলতে পারল না কেউ। একজন কেবল ছোড়দার কথা বলল, কলকাতায় এক ইলেকট্রিক বাল্‌বের কারখানায় সে কাজ করে। আর ছোড়দার খবরই সে চাইছিল। কারণ ছোটবউদিকে দেখবার বড় ইচ্ছে।

খুঁজে খুঁজে কলকাতার এক বস্তিতে তাদের বের করেছিল। দুপুরে ছোড়দা ছিল না। ছোটবউদিও তাকে চিনতে পারেনি। ছোটবউদির ইতিমধ্যে সন্তান হতে আরম্ভ করে তিনেতে এসে পেঁছেছে। ক্রাচ্ বগলে লোকটাকে দেখে ছোট-বউদি ঘর থেকে বেরুতেই চাইছিল না। বিভাস বলেছিল ছোটবউদি, আমি বিভাস।

অনেক সংশয় পার হয়ে ছোটবউদি যখন কাছে এল, বিভাস দেখল, ছোট-বউদির স্বাস্থ্য খুব খারাপ। জামা নেই, সায়া পর্যন্ত নেই। সেই দীপ্তি, বুদ্ধি কিছুই নেই। আর বিভাসের সঙ্গে কথা বলছিল যেন, কোনো মৃত আত্মার সঙ্গে কথা বলছে।

বিভাস শ্বাসরুদ্ধ করে দাঁড়িয়ে রইল তবুও। বলল, চিনতে পারছ না, না?

ছোটবউদি ঘাড় নেড়ে জানাল, পারছে। তারপরে কয়েক মুহূর্ত তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, আপনার পায়ে কী হয়েছে?

'আপনার? বিভাসের মনে হল, তার চোখ ফেটে জল আসবে। এ জগতে পরিবর্তনের কী কোনো সীমা পরিসীমা নেই?

বিভাস বলল, এ্যাকসিডেণ্ট হয়েছিল।

ছোটবউদি বলল, অ। তা বসবে এস।

পরমুহূর্তেই আবার নতুন সম্বোধনে হেসেই বোধহয় চোখের জল রোধ করল বিভাস। মনে হল, একদা এই মহিলা মানুষ ছিল। বলল, আর একদিন আসব। বিভাস চলে এসেছিল।

গ্রীষ্মাবকাশে বিভাস এসে উঠল জনকের বাড়িতে। যখনই ইচ্ছে হয়, জনকের বাড়িতে এসে সে থাকে। এখানেই তার ভাল লাগে।

জনকের বাড়ি আসার দিন তিনেক পরে দুপুরে বিভাস ঈশানের সঙ্গে বসে কথা বলছিল। মাঝে মাঝে গান আর কথা। ভিক্ষেয় বেরিয়েছিল সে। খাওয়াটা এখানেই হয়েছে। তাই আর যাবার তাড়া নেই।

এমন সময়ে একটি গোরুর গাড়ি এসে দাঁড়াল। বিভাস জানালা দিয়ে দেখল, মুনীষটা যেন অনেকদিনের চেনা চেনা। কিন্তু গাড়ির মধ্যে মেয়েছেলে রয়েছে।

জনকের বউ গিয়ে দাঁড়াল সামনে। বলদ জোয়াল মুক্ত হতেই বিভাস দেখল, ভুবনেশ্বরী নামছেন। বিভাস ছুটে বাইরে যেতে গিয়ে ঘরের মধ্যেই হুমড়ি খেয়ে পড়ল। মনে ছিল না যে, সে আর ক্রাচ ভর না করে চলতে পারে না। ঈশান তাড়াতাড়ি তাকে তুলে ধরল। এগিয়ে দিল ক্রাচ দুটো। বিভাস বাইরে এসে দেখল, বিদ্যুৎও নামছে। অবিশ্বাস্য হলেও সে দেখল, একটি শীর্ণ দেহ গাড়িতে শোয়ানো রয়েছে। আর চোখের পলকেই বিভাস বুঝতে পারল শোয়ান দেহটি পদ্মর।

বিভাস কাঁপছে। স্খলিতগলায় বলল, কী হয়েছে?

ভুবনেশ্বরী কিন্তু আশ্চর্য শান্ত গলায় বললেন, গাড়িতে পদ্ম রয়েছে। ওর বাবা ছাড়লেন, তাই নিয়ে এসেছি। ওর আর কোনো ঠাঁই নাই। তোমার কাছেই মরুক।

বিভাস কথা বলতে পারল না। বিদ্যুতের দিকে তাকাল। বিদ্যুৎও অনেক শীর্ণ। কিন্তু মুখে একটি আশ্চর্য দিগ্বিজয়ের হাসি। বলল, রেখে যেতে এলাম ঠাকুরঝিকে।

ইতিমধ্যে জনক ছুটে এল।

ভুবনেশ্বরী বললেন জনককে, ওকে নামিয়ে ঘরে তুলে নাও।

জনক একবার বিভাসের দিকে তাকাল। বিভাস ভুবনেশ্বরীর দিকে তাকিয়ে এই প্রথম ডাকল, মা!

ভুবনেশ্বরীর চোখে জল। কিন্তু অবিকৃত গলায় বললেন, তুলে নিতে বল বাবা। বাঁচবে কি না জানিনে। আমার মেয়ে আমি বলছি, আমি ওকে আমার স্বামীর কাছ থেকে চেয়ে নিয়ে এসেছি। যদি মরে, আমি জানি, সেই ওর শেষ সুখ।

বিদ্যুতের গলা প্রায় বন্ধ। সে বলল, মরবে কেন মা।

জনক আর ঈশান ততক্ষণে পদ্মকে ধরে নামিয়েছে। পদ্মর রং সাদা! চোখগুলি মস্ত বড় হয়ে উঠেছে। পদ্ম যেন অবাক হয়ে দেখল বিভাসকে।

ভুবনেশ্বরী এবং বিদ্যুৎ ধরল পদ্মকে। ঘরে নিয়ে তুলল।

ভুবনেশ্বরী বললেন বিভাসকে, কিন্তু বসব না বাবা। আমরা এ গাড়িতেই ফিরব। বলে পদ্মর কাছে নুয়ে বললেন, যাই?

পদ্মর চোখে জল জমে উঠল। বিদ্যুৎ নত হয়ে চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, সংবাদ নেব। আজ যাই।

বিভাস যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। সে বলল, এখুনি চলে যাচ্ছেন?

—হ্যাঁ বাবা, এখুনি যাব। কারণ—

ভুবনেশ্বরীর গলাও এবার ধরে এল। বললেন, আমার চোখের সামনে, তোমাদের ডাক্তারবাবুর মত অমন একটা পুরুষকে এ ভাবে ভেঙে পড়তে দেখে প্রাণে বড় ভয় লাগছে। তিনি আমার কথা রেখেছেন, পদ্মকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। আমি এবার তাঁর কাছে যাব।

বিভাস বলল, তা হলে শুনুন, আমি পদ্মকে নিয়ে এখুনি ঘোষাল-মশাইয়ের ওখানে যাব। ওর যে পরিচর্যার, চিকিৎসার দরকার।

ভুবনেশ্বরী বললেন, যা তোমার ইচ্ছে।

ভুবনেশ্বরী ঘরের বাইরে চলে গেলেন। বিদ্যুৎ যেতে গিয়ে চোখ তুলে তাকাল।

বিভাসও তাকিয়েছিল।

বিদ্যুৎ বলল, যাচ্ছি।

দুজনের মাঝখানটা যেন বহু অব্যক্ত কথার মৌনতা শ্বাসরুদ্ধ স্তব্ধতায় থমকে রইল। বিভাস ঘাড় কাৎ করে বলল, আসুন।

গাড়িটা চলে গেল দুজনকে নিয়ে। বিভাস পদ্মর সামনে এসে বসল। তার রুগ্ন হাত তুলে নিল হাতে।

পদ্ম কষ্ট করে, যেন চুপিচুপি জিজ্ঞেস করল, রাগ করনি তো?

বিভাস নুয়ে পড়ে পদ্মর কপালে ঠোঁট স্পর্শ করল।

জনকের বউ দরজার পাশে দাঁড়িয়েছিল। বোধহয় লজ্জা পেয়েই সরে আসতে গেল। বিভাস ডেকে বলল, বউ, একটা পাখা দাও তো।

বাইরে বসে ঈশান আপন মনে গুন্‌গুন্‌ করছে—

ও ভোলা, কোথা যাস ঘুরে ঘুরে
বসত তোর অচিনপুরে।
আপনারে চিনতে শিখে,
চিন গিয়া তুই জগতটারে।

তপ্ত বাতাস বইছে। অসহ্য দাহে পৃথিবীটা যেন ঝিমুচ্ছে। তার বুকের ভিতরের সব নিঃশ্বাস শেষ হয়ে শূন্য হয়ে গিয়েছে যেন। ছায়া, একটু ছায়ার জন্যে সে সন্ধ্যার মুখ চেয়ে দু'চোখ মেলে রয়েছে।